লুৎফুল কায়সার

আফ্রিতা

আঁধারের সন্ধানে





আলোর পাশেই যেমন রয়েছে আঁধার, ঠিক তেমনি অনেকের মতে আমাদের পার্থিব জগতের পাশেই অবস্থান করছে 'অতিপ্রাকৃত জগৎ'।

কারা থাকে ওখানে? মাঝে মাঝে কেন তারা হুট করেই চলে আসে আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে?

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপার সর্বদাই রহস্যময়। কেউ বিশ্বাস করে, তো কেউ করে না। তবে দিনের শেষে বেশিরভাগ মানুষই এই বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে।

আফ্রিতা তাদের মতো নয়। আফ্রিতা রহস্যের মাঝে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়, আলো থেকে দূরে গিয়ে খুঁজতে থাকে অন্ধকারকে।

আফ্রিতা আঁধারের সন্ধান করে।

ISBN 978-81-950956-2-9

আফ্রিতা

আঁধারের সন্ধানে

লুৎফুল কায়সার

অরণ্যমন প্রকাশনী

Afrita
A Horror Novel By Lutful Kaiser

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

প্রকাশক
চিরঞ্জীৎ দাস
অরণ্যমন প্রকাশনী
সূর্য সেন স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ
স্টল ২০, ব্লক ২, কলকাতা ৭০০ ০১২
যোগাযোগ ৭২৭৮৯৯২৫৪০

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় 'হারুন রশিদ' স্যারকে।
আপনিই প্রথম বলেছিলেন,
"একদিন তোমার বই দেশের বাইরে থেকেও প্রকাশিত হবে।"

ভূমিকা

আমার প্রথম মৌলিক বই হতে যাচ্ছে এটা।

বইটি লিখতে গিয়ে বেশ ভালো সময় কেটেছে। পাঠকদের কেমন লাগবে সেই চিন্তা সাধারণত আমি করি না।

কারণ কারও ভালো লাগবে কী না লাগবে, এইসব ভেবে লেখালেখি করলে আমার ভালোলাগাটা অন্যের মতামতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়।

বইটি লিখতে আমার ভালো লেগেছে, লিখেছি। এই তো!

যারা অনেক ভালো কিছু পড়তে চান, তারা দয়া করে বইটি এড়িয়ে চলুন, শুধু শুধু কিনে টাকা নষ্ট করার দরকার নেই।

আফসার ব্রাদার্স এবং আবীরভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বইটি প্রকাশ করার জন্য।

এটা ছিল বাংলাদেশি এডিশনের ভূমিকা। বই প্রকাশের এক মাস যেতে না যেতেই অরণ্যমনের চিরঞ্জীৎ দা'র নক পেলাম। আমি ভয়ে ভয়ে দাদাকে বললাম, "বই কিন্তু ভালো না, চলবেও না। গালিও খেতে হতে পারে।" দাদার আপত্তি নেই।

তো আর কী? পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাছে 'আফ্রিতা' পৌঁছে যাচ্ছে ভাবতে ভালোই লাগছে। বইটি বিশেষ কিছু না, এমন কাজ বাংলা অতিপ্রাকৃত সাহিত্যে আগেও প্রচুর হয়েছে। কত গালি যে খেতে হবে কে জানে!

লুৎফুল কায়সার
রাজশাহি, বাংলাদেশ
০৫.০৪.২১

সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন

অন্ধকার একটা জায়গা। সম্ভবত কোনো গুহার ভেতরে।

দেয়ালে ডানপাশে একটা মশাল, সেই আলোতে মাঝখানের বেদিটা দেখা যাচ্ছে। বেদির সামনে বসে আছে চার-পাঁচ বছরের একটা ছেলে। পরনে কিছু নেই তার। পেছনের দিকটা অন্ধকার।

"আমার প্রিয় সৃষ্টি," পেছন থেকে গমগমে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি এই মহাবিশ্বকে সেই মহান খল-সত্তার অন্ধকার থেকে রক্ষা করা জন্য!"

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কণ্ঠটা কোনো পুরুষের নাকি নারীর! খুবই অদ্ভুত সেটা।

"সেই খল-সত্তা অপরিসীম শক্তিধর, তাঁর সামনে এই সৃষ্টিজগতের কিছুই টিকতে পারবে না। শুধু তোমাকেই আমি ক্ষমতা দিয়েছি তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটানোর। একমাত্র তুমিই জানবে তাঁকে থামানোর বিদ্যা।"

"প্রভু!" হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা। তার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

"নিজের বিদ্যাকে ছড়িয়ে দেবে শুধুই কিছু উপযুক্ত মানুষদের মাঝে, যাতে তারা পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে অতিপ্রাকৃত সেইসব শক্তিদের হাত থেকে। আর যেদিন সেই মহান সত্তা আবির্ভূত হবে সেদিন তোমাকেও প্রকট হতে হবে নিজের আসল রূপে!"

"আপনি যেমন বলবেন প্রভু।"

"তুমি কি জানো সেই খল মহান সত্তা কে?" কেমন যেন একটা হাসির আভাস সেই কণ্ঠটাতে।

"না প্রভু, সেই জ্ঞান আপনি আমাকে দেননি!"

"আজ দিচ্ছি, সেই মহান খল-সত্তা... আমি," বদলে গেল কণ্ঠটা, কেমন যেন দানবীয় শোনাচ্ছে সেটা, যেন আদিম কালের দুটো বিরাট পাথরখণ্ড একে অপরের সঙ্গে ক্রমাগত ঘষা খেয়ে চলেছে, "হাহাহাহাহা," হাসতে লাগল সেই কণ্ঠ।

ধীরে ধীরে ছেলেটার কাছে আসতে লাগল সেই হাসির শব্দ।

অন্ধকার ছেড়ে আলোতে বেরিয়ে এলেন তিনি, ছেলেটি যা দেখল তা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়! কিন্তু তারপরেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে।

ধড়ফড় করে বিছানাতে উঠে বসল আফ্রিতা। বালিশের নীচ থেকে ফোনটা কোনোমতে বের করল সে। রাত তিনটা বাজে।

ওয়াইফাই চালু আছে। বাড়িতে থাকলে ফোনের ওয়াইফাই কখনোই বন্ধ করে না সে। ফেসবুকে একটা মেসেজ এসেছে।

মাঝে মাঝেই স্বপ্নটা দেখে সে। প্রতিবার একই রকম থাকে স্বপ্নটা। সেই অন্ধকার গুহা, সেই বাচ্চা ছেলেটা, সেই অমানুষিক কণ্ঠ আর শেষে... কিন্তু অন্ধকারের ওপাশে কে থাকে? তা আর দেখা হয় না।

টলতে টলতে কোনোমতে ডাইনিং টেবিলে এল সে। টেবিলের ওপরের পানির জগটা একটু উঁচু করে সরাসরি সেটা থেকে ঢকঢক করে খানিকটা পানি খেয়ে ফেলল। ওর খুব বাজে অভ্যাস এটা, মাঝে মাঝেই এজন্য মা ওকে বকেন।

ঘরে ফিরে এল সে।

মেসেজটা পাঠিয়েছে ইরফান। কয়েকমাস ধরে ওকে চেনে আফ্রিতা। ছেলেটা ক্লাস এইটে পড়ে।

দুমাস আগে আফ্রিতার পেজে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিল ছেলেটা, সেখান থেকে পরিচয়। তারপর ওর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও রিকোয়েস্ট পাঠায় সে। কী ভেবে ছেলেটাকে অ্যাড করেছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না আফ্রিতার।

ছেলেটা ওর মহাভক্ত। সবসময়ই ওর কাজের প্রশংসা করে।

নিজের কাজের খুব কম প্রশংসা পেয়েছে আফ্রিতা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো মানুষ ব্যাপারটাকে রীতিমত ব্যঙ্গ করে, অনেকে প্রকাশ্যেও হাসাহাসি করে। তাই এই ছেলেটার প্রশংসা শুনে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে ওর।

মাঝে মাঝেই ওকে নানান ব্যাপারে প্রশ্ন করে ছেলেটা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেসেজ সিন করে না সে। আজও তেমনই কিছু একটা হবে ভেবে মোবাইলটা হাতে নিল সে।

"আপু একটা অদ্ভুত ব্যাপার-আমাদের এলাকাতে একটা বাড়িতে খুব ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে!" লিখেছে ইরফান।

অন্য সময় হলে মেসেজটার উত্তর দিত না আফ্রিতা। কিন্তু ওই স্বপ্নটা...ওটা দেখার পর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায় ওর। খুব ইচ্ছা করে কারও সঙ্গে কথা বলতে।

আজ ইরফানের সঙ্গেই কথা বলা যাক। ছেলেটা অনলাইন আছে।

"কী ঘটনা?" ছোট্ট করে উত্তর দিল আফ্রিতা।

দুই সেকেন্ডের মধ্যেই সিন হল ম্যাসেজটা।

"আপু, একটা বাড়ি, দুইজন মানুষ..." এই পর্যন্ত লিখে পরের ম্যাসেজটা টাইপ করতে লাগল ইরফান।

মনে মনে হাসল আফ্রিতা। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এইসব ব্যাপারে জড়ানোর পর থেকেই স্বপ্নটা দেখা শুরু করেছে সে।

অপদেবতা

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিছু বাড়ি খুব নিরাপদ, আবার কিছু খুব ভয়াবহ। যদি কোনো বাড়িতে থাকতে যান তবে আগে যাচাই করে নেবেন বাড়িটা থাকার উপযুক্ত নাকি।"

"ঠিকই বলেছেন, যেমন নোনাধরা দেয়াল, পানি নিষ্কাশনের খারাপ অবস্থা, আরও অনেক কিছুই থাকতে পারে।"

"না! অমন কিছুই না। তার চাইতেও ভয়াবহ... বলতে চাইছি ওই বাড়িতে কোনো অপদেবতা আছে নাকি সেটা আপনার জানা উচিত।"

মার্টিন অ্যার্মস্ট্রং এর 'দ্য পাইপ স্মোকার' গল্পটি থেকে।

।। ১ ।।

বাজার নিয়ে ফিরছেন সাহানা হোসেন।

একদম মোড়ের মুখে রিকশাটা খারাপ হয়ে গেছে। মেজাজ খারাপ করে দুই হাতে বাজারের দুটো ঝোলা নিয়ে হেঁটেই বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন তিনি।

খুবই কম ঘামেন, কিন্তু তারপরেও এপ্রিল মাসের তীব্র তাপদাহের কারণে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে উনার কপালে।

রাগ ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়, একবার যদি এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে বাড়তেই থাকে।

ঠিক সেভাবেই সাহানার রাগও বেড়ে চলেছে।

অবশেষে থামলেন তিনি। তিনতলা একটা বাড়ি সামনে। বেশ বড়ো করে দরজার পাশের একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'অর্কিড ভিলা'।

একতলাটা গ্যারেজের মতো, দুই আর তিনতলাতে দুটি করে মোট চারটি ফ্ল্যাট।

দোতলার বামদিকের ফ্ল্যাটটাতে গত চারদিন হল ভাড়া এসেছেন উনারা। মালিকের নাকি ইচ্ছা ছিল ভবনটাকে সাত-আটতলা করার। কিন্তু তিনতলা হওয়ার পরেই নাকি আর্থিক একটা সমস্যা হয়ে গেছিল তাঁর আর সেজন্য এভাবেই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

একদমই নতুন একটা বাড়ি। চারটি ফ্ল্যাটের তিনটিই ভাড়া হয়ে গেছে। অন্য কোনো এলাকা হলে চারটিই ভাড়া হয়ে যেত। তবে এই এলাকাটা বেশ নির্জন।

ঢাকার বুকে এমন এলাকা রয়েছে তা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। বাড়িঘরগুলোর মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে, পুরো এলাকাতে একটা মাত্র ছোট্ট দোকান। নেই কোনো বড়ো বাজার কিংবা শপিংমল।

এই কারণে এলাকার বাড়িগুলোর ভাড়াও তুলনামূলকভাবে কম।

দরজা খুলে দিল দারোয়ান হাবিব মিয়া। নামেই শুধু গ্যারেজ জায়গাটা। একটা গাড়িও নেই। এখানে যে কটি পরিবার ভাড়া এসেছে কারওরই গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই।

সাহানার কেন যেন মনে হয় বাড়িটা নিয়ে অনেক বড়ো পরিকল্পনা ছিল মালিকের। কিন্তু কোনো কারণে তিনি বাড়িটাকে এভাবেই শেষ করতে বাধ্য হয়েছেন।

হাবিব মিয়ার পাশের চেয়ারটার দিকে তাকাতেই আর একদফা মেজাজ খারাপ হল তাঁর। ওখানে বসে রয়েছেন উনার স্বামী আফতাব হোসেন। ভদ্রলোকের মুখটা শুকিয়ে গেছে।

"এখানে? তুমি এখানে কেন? বাড়িতে থাকতে বললাম না?" প্রায় চিৎকার করে উঠলেন সাহানা।

"ম্যাডাম, স্যাররে বইকেন না। উনি চইলাই যাইতে চাইসিলেন দশমিনিট আগে, আমি কইলাম ম্যাডাম না আসা পর্যন্ত বইসে থাকেন। ভয় পাইসিলেন অনেক!" মাঝখান দিয়ে বলে উঠল হাবিব মিয়া।

"ভয় লাগছিল গো," কোনোমতে বললেন আফতাব।

"কী কারণে ভয়?" বাজারের ঝোলাদুটো মেঝেতে রেখে বললেন সাহানা।

"ওই যে, ওইসব বাচ্চা..."

"চলো, বাড়ি চলো।" স্বামীকে প্রায় টেনে নিয়ে চললেন সাহানা।

***

সিঁড়িতে ফাহাদ আর মুনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উনাদের। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া ওরা। মাত্র কয়েক বছর আগেই বিয়ে হয়েছে ওদের।

ফাহাদ ছেলেটা দেখতে সুদর্শন আর লম্বা, ওর স্ত্রী মুনও দেখতে বেশ ভালোই। সাহানার খুব ভালো লাগে কোঁকড়া চুলের মিষ্টি মেয়েটাকে। প্রথম দিনেই এসে উনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছিল ওরা।

"আন্টি, আঙ্কেল কি বাজারে গেছিলেন?" হাসল ফাহাদ।

"আমি বাজারে গেছিলাম আর কী," পালটা হাসি দিলেন সাহানা।

"আমরাও বাজারে যাচ্ছি," বলল মুন।

"আঙ্কেলকে অসুস্থ মনে হচ্ছে কিছুটা," আফতাবের দিকে নজর পড়ল ফাহাদের।

"ও একটু অসুস্থই, সবসময়ই থাকে," হাসলেন সাহানা।

"আন্টি আমরা যাই, বিকালে দেখা হবে," মুনের কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে ফাহাদ, মি. হোসেনের অসুস্থতার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করাতে কিছুটা বিব্রত ও।

মাথা নাড়লেন সাহানা।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ফাহাদ আর মুন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সাহানার। কতো সুখী দম্পতি ওরা, হয়তো কিছুদিন পরেই কোল আলো করে আসবে সন্তান। কিন্তু উনার আর আফতাবের...

***

"শোন ফাহাদ, সাহানা আন্টির স্বামী অসুস্থ, এটা তোমাকে কিন্তু দুদিন আগেই বলেছি আমি। তারপরেও এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কেন?" গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মুন।

"আরে! ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছেন!"

"ওসব বাদ দাও, আন্টিকে আর কোনোদিন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবে না তুমি!"

"আচ্ছা!"

***

রান্নাঘরে মশলাপাতি আর ফ্রিজে সবজিগুলো সাজিয়ে রাখতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল সাহানার। গরম যেন বেলার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে।

এক গ্লাস পানি খেতে ডাইনিং রুমে এলেন তিনি।

ডাইনিং টেবিলের কোনাতে একটা চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছেন আফতাব।

"ঘরে যাওনি কেন?" আফতাবের চোখের চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন সাহানা।

"ওই বাচ্চাটা যদি..." আফতাবের কণ্ঠে তীব্র আতঙ্ক।

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সাহানা। তারপর একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন স্বামীর সামনে।

"কেন এমন করছ আফতাব? বাড়িটা তোমার পছন্দ না? সোজাসুজি সেটা বলো! এখানে মাত্র দুই বছরের জন্য থাকছি আমরা, এর মধ্যে আমাদের নিজেদের একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে ফেলব আশা করছি," গলার স্বর অনেকটাই কোমল হয়ে এসেছে সাহানার।

"না না! এই বাড়িটা খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু ওই বাচ্চাটা!"

এই এক নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে। একা থাকলেই নাকি বাড়ির এখানে-সেখানে একটা বাচ্চাকে দেখেন আফতাব। ছোট্ট একটা বাচ্চা নাকি এদিক-সেদিক দৌড়ে বেড়ায়।

"আমরা ছাড়া এই ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না," হাসলেন সাহানা, "ওসব তোমার মনের ভুল। আসলে আমাদের কোনো বাচ্চা নেই তো!"

"না সাহানা, আমি জীবনে কত্ত বাচ্চা দেখেছি, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই বাচ্চাটা, শয়তান! ওর চোখদুটো পুরোপুরি কালো! আমি এই বাড়িতে থাকব না আর।"

"আফতাব আমার কথা শোন। ভালো করে শুনবে তো?"

"হ্যাঁ বলো। তোমার সব কথা শুনি তো আমি।"

"তোমার চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর নেওয়ার পর অনেক কষ্ট করে আমি সবকিছু চালিয়েছি, নিজের ছোটোখাটো স্কুলের চাকরিটা আর তোমার অফিস থেকে যে টাকাগুলো পেয়েছিলাম তা দিয়ে এই বাজারে তোমার চিকিৎসা আর সংসার চালানো কতটা কঠিন সেটা তো বোঝো?"

"হ্যাঁ!"

"এতগুলো বছর অনেক কষ্ট করে অবশেষে আমরা একটা পর্যায়ে এসেছি। এই বাড়ির চেয়ে কম ভাড়াতে বাড়ি সম্ভবত ঢাকা শহরে আমরা আর পাব না!"

"তা ঠিক।"

"ব্যাংকের টাকা থেকে যে সুদ পাচ্ছি তা দিয়েই ভাড়াটা হয়ে যাচ্ছে। সংসার আর তোমার চিকিৎসা আমার জমানো টাকা দিয়েই করছি। ব্যাংকে বেশ ভালো

রকমের টাকা জমেছে আমাদের। আর দুটো বছর অপেক্ষা করলেই আমাদের নিজেদের একটা ঠিকানা। এর মধ্যে এই বাড়িটা ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব না।"

"আমি বুঝি তো।"

"নতুন একটা বাড়ি, এইসব ভুতুড়ে কাহিনি পুরোনো বাড়িতে হয়, শোনো, আমাদের কোনো বাচ্চা নেই, তাই তোমার অবচেতন মন হয়তো একটা বাচ্চাকে কল্পনা করে নিয়েছে। ওই কারণে এসব দেখছ।"

"না সাহানা। এই বাচ্চাটা..."

"আচ্ছা ঠিক আছে। যাও, ঘরে যাও, তোমার ওযুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

চুপচাপ উঠে শোবার ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন আফতাব হোসেন। স্ত্রীর খুবই অনুগত তিনি।

***

বিরক্ত হয়ে বাথরুমের কলটা বন্ধ করলেন সাহানা।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে কেবল বাসনগুলোতে হাত লাগিয়েছেন এমন সময়ে বাথরুমে পানি পড়ার এই শব্দ।

ঠিক তখনই কে যেন দরজা নক্ করে উঠল। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

ঐশী দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার গায়ের রং শ্যামলা, একমাথা ঘন কালো চুল, চোখে চশমা, মাথার সিঁথিতে একচিলতে সিঁদুর। তিনতলার ফ্ল্যাটটার ভাড়াটিয়া ওরা।

"আন্টি, স্যরি, এই বেলাতে ডিসটার্ব করলাম," হাসল ঐশী।

"আরে সমস্যা নেই, বলো," হাসলেন সাহানা।

"মা একটু দুধ-চা খেতে চাইলেন। তো ফ্রিজ খুলে দেখি দুধ নেই। অক্ষর তো অফিসে, এখন বাইরে বেরিয়ে দুধ আনব। কিন্তু মা যে একা, আপনি যদি..."

"আরে সমস্যা নেই দাঁড়াও।"

ফ্রিজ খুলে ৫০০ এমএল-এর একটা দুধের প্যাকেট নিয়ে এলেন সাহানা।

"নাও, আজই বাজার গেছিলাম," হাসলেন তিনি।

"আরে আন্টি! এত দুধ দিয়ে কী করব? একটু হলেই চলত।"

"যাও তো, একটু দুধ কি দেওয়া যায়?"

"অক্ষর এলে, আমি এক প্যাকেট ওকে দিয়ে যেতে বলব।"

"না না ওসবের দরকার নেই! যাও শাশুড়িকে চা করে খাওয়াও।"

ওপরে উঠে গেল ঐশী।

সাত-আটমাস হল বিয়ে হয়েছে ওর। ঐশীর স্বামী অক্ষর একটা ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে। চাকরিটা নতুন, তবে ভালো। অক্ষরের মা-ও আপাতত ওদের সঙ্গেই আছেন।

এইসব অল্প ভাড়ার বাড়িগুলোতে সাধারণত নববিবাহিত দম্পতিরাই ওঠে। কিন্তু অল্প ভাড়া হিসেবে এই বাড়িটা বেশ ভালোই, এটাই ব্যতিক্রম।

কল থেকে আবার পানি পড়ছে। আবার সেটা বন্ধ করলেন সাহানা।

এই প্রথম একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলেন সাহানা। দুইবারই কল বন্ধ

করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে কলের প্যাঁচ যথেষ্ট ঢিলা করে দেওয়া হয়েছে। মানে কেউ কল চালু করলে যেমন হয়। যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কল থেকে পানি পড়লে এই প্যাঁচটা শক্তই থাকে।

শোবার ঘরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে আফতাব।

তাহলে কে বারবার কলের প্যাঁচ ঢিলা করছে? আর এই অবস্থাতে যদি আফতাবও উঠে এসে কলের প্যাঁচ ঢিলা করে দিয়ে যায় তবে সেটাও তো সাহানার চোখের পড়ার কথা!

মনে মনে হাসলেন সাহানা।

স্বামীর মুখে এই কদিন ধরে একগাদা আধিভৌতিক কথাবার্তা শুনে হয়তো তাঁর মাথাতেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে ওইসব ব্যাপারের। তাই হয়তো এমন মনে হচ্ছে। সমস্যার কারণেও তো কলের প্যাঁচ ঢিলা হতে পারে।

রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

***

ঘুম ভেঙে গেল সাহানার।

ঘড়িতে বিকাল সাড়ে চারটার মতো বাজে। এই সময়েই প্রতিদিন উনার ছোট্ট ভাত-ঘুমটার সমাপ্তি ঘটে। এবাড়িতে আসার পর ছাদে যাওয়া হচ্ছে। মুন আর ঐশী এই সময়ে রোজ ছাদে যায়।

হুট করে অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এল সাহানার।

শোবার ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বারান্দা। বারান্দাতে কেউ যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

চিরকালই খুব সাহসী মানুষ তিনি, তাই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বারান্দাতে গেলেন। নাহ, কেউ নেই!

ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুলটা ঠিক করতে লাগলেন সাহানা। এককালে যে খুবই সুন্দরী ছিলেন সেটা তাঁকে দেখেই বোঝা যায়। গায়ের রং ফর্সা আর শ্যামলার মাঝামাঝি, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত, মুখের গঠনে কিছু মঙ্গোলয়েড ভাব আছে তাঁর। ছোটোবেলাতে স্কুলের বন্ধুরা মাঝে মাঝেই 'জাপানি-চিনা' বলে ক্ষ্যাপাত তাঁকে।

ভার্সিটির প্রথম দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। চেহারার এই মঙ্গোলয়েড ধাঁচটারই প্রেমে পড়ে গেছিলেন আফতাব। তারপর একসঙ্গে কত পথ পাড়ি।

উনাদের বিয়েটা লাভ ম্যারেজ ছিল।

দেয়ালে এখনও বিয়ের একটা ছবি ঝুলছে। মৃদু হাসি নিয়ে সেটার দিকে তাকালেন সাহানা। আফতাবকে তখন যেমন লাগল, এখনও অনেকটা তেমনই লাগে। উনার তেমন পরিবর্তন হয়নি। সেই ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা গায়ের রঙ আর চোখে একটা ভীতু-ভীতু ভাব।

সেদিক দিয়ে সাহানা অনেক বদলে গেছেন, বুড়িয়ে গেছেন।

দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিয়েটা হয়েছিল। বিয়ের আগেই একটা ব্যাংকে ঢুকে পড়েছিল আফতাব। বিয়ের ছমাস পর তিনি নিজেও একটা স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি নিলেন।

বেশ ভালোই চলছিল উনাদের সংসার। প্রাচুর্য না থাকলেও ভালোবাসার

কমতি ছিল না।

কিন্তু সমস্যাটা শুরু হল যখন দুই বছর পরেও উনাদের ঘর আলো করে কোনো ছোট্ট প্রাণের জন্ম হল না। নানানভাবে আফতাবের আত্মীয়রা কথা শোনাতে লাগল তাঁকে। একদমই ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময়গুলোতে আফতাব চিরকালই তাঁর পাশে ছিলেন। উনার স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে আফতাব আসলেই তাঁকে অনেক ভালোবাসেন।

একটা সময়ে উনারা ঠিক করলেন যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন, সমস্যাটা কোথায় সেটা জানবেন। যারই সমস্যা হোক ব্যাপার না, দরকার হলে উন্নত চিকিৎসা নেবেন।

কিন্তু তারপরেই ঘটে গেল সেই দুর্ঘটনা। এখনও চোখ বুজলেই সেই দিনের কথা মনে পড়ে সাহানার।

টিফিন আওয়ারে বসে ছাত্রদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন তিনি। তখনই একটা ফোন এল আফতাবের অফিস থেকে।

আইসিইউ-এর একটা বেডে শোয়ানো আফতাবের প্রায় নিথর শরীরটার কথা মনে পড়লে এখনও বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে উনার।

রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল আফতাব আর তাঁর কলিগ মোতাহারসাহেব। ঠিক সেই সময়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো একটা ট্রাক ঢুকে পড়ে সেই চায়ের দোকানে! প্রচণ্ড আহত অবস্থায় আফতাবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রায় দুমাস কোমাতে ছিলেন আফতাব।

এই সময়টাতে আক্ষরিক অর্থেই নরক ভেঙে পড়েছিল সাহানার ওপরে। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। ওই সময়টাই তাঁকে শিখিয়েছিল শক্ত হতে।

উনার এবং আফতাবের পরিবারের প্রায় সবাই-ই ধরে নিয়েছিল যে আফতাব মারা যাবে। কিন্তু উনি কখনোই তা মানেননি।

নিজেদের সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে হাসপাতালের বিল মেটাতে লাগলেন। দিনের পর দিন খরচ বেড়েই চলল। এই সময়ে কোথাও থেকেই কোনো আর্থিক সহায়তা পাননি তিনি। না আফতাবের পরিবার থেকে, না উনার পরিবার থেকে।

দুমাস পর আফতাবের জ্ঞান ফিরল।

কিন্তু তিনি আর সেই আগের আফতাব নেই। কেমন যেন বদলে গেছেন, কথাবার্তা অসংলগ্ন, কোনো জিনিস ঠিকঠাক মনে রাখতে পারেন না, মাঝে মাঝে অনেককে চিনতেও পারেন না।

ডাক্তার বলেছিলেন, ওই দুর্ঘটনাতে আফতাবের মস্তিষ্ক অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, উনি সম্ভবত আর কোনোদিনই আগের মতো হতে পারবেন না।

চাকরিটা থেকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হল আফতাবকে।

অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে সেই যে জীবন সংগ্রাম শুরু করলেন সাহানা, আজ প্রায় পনেরো বছর পর উনি এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে। কী পরিমাণ মানসিক চাপ উনাকে সহ্য করতে হয়েছে তা অন্য কেউ বুঝবে না।

রিং বেজে উঠল সাহানার ফোনে। মুন ফোন করেছে।

"হ্যালো," ফোনটা ধরলেন সাহানা।

"আন্টি, আপনি কই? আমি ছাদে! তাড়াতাড়ি আসেন, একা একা ভালো

লাগছে না!"

"হ্যাঁ এইতো আসছি।"

আফতাব তখনও ঘুমাচ্ছেন।

"অ্যাই শুনছ," তাঁকে ঠ্যালা দিলেন সাহানা।

"উঁম" চোখ না খুলে বললেন আফতাব।

"ছাদে যাচ্ছি, দরজাটা খোলা রেখে গেলাম। ভয় লাগলে চলে এসো, নইলে কল দিয়ো!"

***

"আন্টি বুঝলেন, এই সময়টা ছাদে না আসলে চলেই না," চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল মুন। মেয়েটার এই ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে সাহানার। প্রতিদিন ছাদে আসার আগে একটা ফ্লাস্কে করে চা আর কয়েকটা কাপ নিয়ে আসে ও।

সাহানা ইতোমধ্যে এক কাপ শেষ করে আর এক কাপ নিয়েছেন। বেশ ভালো চা করে মুন।

"ফাহাদ কী করে? ঘুমাচ্ছে?" হাসলেন সাহানা।

"আরে না। পাবজি খেলছে। আন্টি আপনার স্কুলের ছুটি আর কদিন?"

"কাল আর পরশু, বাড়ি বদলানোর জন্য এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছিলাম। আচ্ছা, ঐশী কই?"

"আসবে বলল একটু পর, ছাদে ওঠার আগে নক্ করেছিলাম ওকে ফেসবুকে। বলল ওর শাশুড়ি নাকি এখনও ঘুমাননি। ঘুমালেই আসবে।"

"মেয়েটা ভীষণ শাশুড়ি অন্তপ্রাণ।"

"আসলে ওর শাশুড়ি, মহিলা একটু খিটখিটে, তবে মানুষ খারাপ না। একদিন গেছিলাম ওদের ফ্ল্যাটে, কত কী প্রশ্ন করল আমাকে।"

"কী ধরনের প্রশ্ন?"

"এই ধরুন, ফাহাদের মা-বাবা আমাদের সঙ্গে নেই কেন? আমি কি ওকে বাধ্য করেছি উনাদের ছেড়ে আসতে নাকি! এইসব! চিন্তা করুন।"

"ওগুলো সব বয়স্ক মানুষই করে। গেটের সামনে বাবুলকে দেখছি।"

"হ্যাঁ, হাবিব মিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সট্যান্ট। হাবিব মিয়া না থাকলে ও থাকে!"

"ও বাড়ির সেকেন্ড গার্ড না?"

"হতে পারে, ওকে আর হাবিব মিয়াকে কখনও একসঙ্গে পাহারা দিতে দেখিনি আমি। একবার হাবিব মিয়া বলেছিল যে ছেলেটা নাকি উনারই গ্রামের। ভালো, তবে কথাবার্তা একটু কম বলে। আমার মনে হয় না বাড়িওয়ালা ওকে রেখেছেন। হাবিব মিয়াই সম্ভবত ওকে এনেছেন।"

বাবুল ছেলেটার বয়স এগারো-বারো হবে। মাঝেই মাঝেই ওকে গেটে দেখেন সাহানা। তবে এত কিছু জানতেন না।

"ছেলেটা ভালোই, তবে বাবুল মিয়াকে হেল্প করছে। এইটুকু বয়সে গার্ডের দায়িত্ব!" বললেন সাহানা।

"গত বৃহস্পতিবারে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে এসেছিলাম বুঝলেন আন্টি, এই ধরুন চারটা, তো এসে দেখি বাবুল দাঁড়িয়ে গেটে। সামনে যে মেসটা আছে না,

ওর পেছনে একটা ভাজা-পোড়ার দোকান আছে, ওখানকার রসুনের চপটা খেতে বেশ, খেয়েছেন কখনও?"

"না।"

"তো একটু ক্লান্ত ছিলাম, বাবুলকে বললাম 'আমাকে কটা রসুনের চপ এনে দাও, বকশিস দেবো'... ওমা ছেলেটা বলে কী, রসুনের গন্ধে নাকি ওর বমি আসে, ওকে কেটে ফেললেও রসুনের কিছু আনতে পারবে না! ভাবখানা দেখুন? অ্যাসিস্ট্যান্ট গার্ড বলে কথা!"

"এই শোনো মুন, একটা কথা মনে পড়ল তোমার কথা শুনে।"

"কী কথা আন্টি? বলা যাবে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু..."

"সমস্যা নেই আন্টি, তেমন কিছু হলে বলার দরকার নেই।"

"আরে গত পরশু আমার বাড়ির পেঁয়াজ আর রসুন শেষ হয়ে গেছিল। তোমার আঙ্কেলের শরীরটাও বেশ খারাপ ছিল সেদিন। তো গেটে এসে হাবিব মিয়াকে বললাম মোড় থেকে এক কেজি পেঁয়াজ আর রসুন এনে দিতে। তো সে বলে, সে নাকি কারও কিছু এনে দেয় না! আমি বললাম যে একটু সমস্যাতে আছি। কিন্তু সে গেলই না! বাধ্য হয়ে আমাকেই আনতে হয়েছে!"

"আমাকে বলতেন! আমার কাছেই তো ছিল।"

"না, আসলে এগুলো চাইতে আমার... বোঝোই তো।"

"হাহাহা আন্টি, আমি তো আপনার মেয়ের মতো।"

"তার পরও, যাই হোক, ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল বুঝলে। হাবিব মিয়াকে আমার খুব হেল্পফুল পার্সন মনে হয়েছিল প্রথম দেখে। কিন্তু সেদিন আমার খুব খারাপ লেগেছিল!"

"বাদ দিন আন্টি, যেমন মেইন গার্ড তেমনি অ্যাসিস্ট্যান্ট গার্ড!"

"নাহ্, ছেলেটার তো তাও রসুন খারাপ লাগে। কিন্তু এই লোক কিছু নাকি এনেই দেয় না কাউকে। এ আবার কেমন কথা!"

"আপনার চা দেখি প্রায় শেষ। আর এক কাপ..."

তখনই হন্তদন্ত হয়ে ছাদে উঠে এল ঐশী।

"মুন আপু, আন্টি, তাড়াতাড়ি নীচে আসুন।" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও।

"কী হয়েছে ঐশী?" এগিয়ে গেল মুন।

"আফতাব আঙ্কেল... ছাদে ওঠার জন্য দরজা খুলে দেখি উনি আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে পড়ে আছেন।"

***

ঐশিদের ড্রইং রুমের বামপাশে একটা ছোট্ট চৌকির মতো রয়েছে, সেটার ওপরেই শুয়ে রয়েছেন আফতাব। পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে রয়েছে অক্ষর। ডানপাশের সোফাতে বসে আছেন অক্ষরের মা, মানে ঐশীর শাশুড়ি।

সাহানা, মুন আর ঐশী ঘরের একদম মাঝে দাঁড়িয়ে।

"সম্ভবত উনি খুব ভয় পেয়েছেন কিছু দেখে, মুখে পানির ছিটা দিয়েছি, জ্ঞানও ফিরেছে, আপনারা একটু থামুন। এখন কোনো প্রশ্ন করাটা ঠিক না, চোখ খুলুক

আগে," বলে উঠল অক্ষর।

আড়চোখে ছেলেটাকে দেখলেন সাহানা, বেশ লম্বা-চওড়া আছে, সম্ভবত আফতাবকে সে-ই তুলে ঘরে নিয়ে এসেছে।

"তুমি কখন এলে অক্ষর?" বলল ঐশী।

"এইতো দশ মিনিট হবে, এসেই দেখি হাবিব মিয়া গেটে নেই, সেই পিচ্চিটাও নেই, এরা যে কী করে ডিউটি করে! এর পর বাড়ির দরজার কাছে এসে দেখি আঙ্কেল পড়ে আছেন। আঙ্কেলের সঙ্গে আজ সকালেই পরিচয় হয়েছে, হাবিব মিয়ার পাশের চেয়ারটায় বসেছিলেন সকালের দিকে। হালকা-পাতলা মানুষ, উনাকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এলাম। পানির ছিটা দিতেই জ্ঞান ফিরল, তবে কেন যেন চোখ খুলছেন না। তোমাকে না পেয়ে আর দরজা খোলা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে ছাদে গেছ। কল দিতে যাব আর এর মধ্যেই তোমরা চলে এলে।"

"হাবিব মিয়া গেটে নেই ওর অ্যাসিস্ট্যান্টও নেই। সন্ধ্যা হতে চলল। বাড়িতে কোনো চোর-ডাকাত ঢুকলে কী হত?" মুনের কণ্ঠে বিরক্তি।

"সেটাই ভাবছি, আমাদের ফ্ল্যাটের দরজাটাও খোলা ছিল।" বললেন সাহানা। গত কয়েক বছরে অসংখ্যবার আফতাবকে এভাবে অজ্ঞান হতে দেখেছেন তিনি। তাই এই পরিবেশেও নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না তাঁর।

"সাহানা," কোনোমতে বলে উঠলেন আফতাব, চোখ খুলেছে তার।

"হ্যাঁ, আফতাব বলো," উনার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সাহানা।

"ওই বাচ্চাটা, সেই ছোট্ট বাচ্চাটা, চোখদুটো কালো। বাথরুমে, আমাকে দেখে হাসছিল।"

"হুম।"

"আমি ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই।"

"বুঝেছি।"

"বাচ্চা? কোন বাচ্চার কথা বলছেন উনি?" অক্ষরের কণ্ঠে বিস্ময়। শুনেই বোঝা যায় যে সাহানা আর আফতাব যে নিঃসন্তান দম্পতি, তা সে ভালো করেই জানে।

"একটা বাচ্চাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখছে ও। যেমন বলল তেমন। ওর একটু সমস্যা, বোঝোই তো বাবা।"

"এই সমস্যা কি উনার আগেও হয়েছে?"

"সমস্যা তো উনার অনেকই, তবে বাচ্চা দেখার ব্যাপারটা এই বাড়িতে আসার পর থেকে।"

"জানেন আন্টি, আমার মা একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।" থেমে গেল অক্ষর, ওর হাত ধরেছে ঐশী। সম্ভবত সে চায় না অক্ষর বলুক ওর মা কী বলেছে।

"আমি যাই, ওর দুটো ওষুধ নিয়ে আসি, খেলেই মানসিক অস্থিরতা কমে যাবে, এখানেই শুয়ে থাকুক। স্যরি, তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনি।"

"আরে কিছুই না। আপনারা তো আমাদের মা-বাবার মতো!"

ঠিক তখনই মুনের ফোনটা বেজে উঠল। ওটা ধরে দুয়েকবার "হ্যাঁ-হুঁ" করল সে, তারপর বলল, "আন্টি চলেন আমিও নীচে যাব, ফাহাদ ডাকছে।"

***

মুনদের ফ্ল্যাটের দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ফাহাদ।

"আসসালামুআলাইকুম আন্টি ভালো আছেন? মুন আমার ক্যামেরাটা পাচ্ছি না। একটু যদি দেখতে," হাসল ও।

"ওয়ালাইকুম বাবা, একটু জলদিতে আছি।" তড়িঘড়ি করে বললেন সাহানা।

"ফাহাদ, আঙ্কেলের শরীরটা খারাপ, একটু পর আসছি আমি," বলল মুন।

"ওহ আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে থাক! আমিও আসব কি?"

"প্রবলেম নেই, ওর তো জ্ঞান ফিরেছে, মুন তুমি যাও। আমি ওষুধ নিয়ে ওপরে যাচ্ছি," বললেন সাহানা।

"আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি আন্টি," এই বলে ফাহাদের সঙ্গে ঢুকে পড়ল মুন।

নিজের ফ্ল্যাটের দরজাটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন সাহানা। ভেতর থেকে বন্ধ ওটা! আফতাবও তো ওপরে! তাহলে কে বন্ধ করল?

এক দৌড়ে নীচে নেমে এলেন তিনি। গেটে হাবিব মিয়া বা বাবুল কেউ নেই!

গ্যারেজের কোনাতে একটা ছোট্ট ঘর রয়েছে। সেখানে থাকে হাবিব মিয়া আর বাবুল। ঘরের দরজাটা খোলাই দেখা যাচ্ছে।

একবার উঁকি দিলেন দিলেন তিনি। নাহ্, কেউ নেই!

চুপচাপ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এখন তিনি কী করবেন? ওপরে গিয়ে ফাহাদ বা অক্ষরকে ডাকবেন? কে ঢুকেছে উনার বাড়িতে তা দেখতে বলবেন? আফতাবের কারণে তো ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ঝক্কি উঠিয়েছে অক্ষর আর ফাহাদ তো ব্যস্ত।

নিজের কাজে মানুষকে ডাকতে কখনোই খুব একটা ভালো লাগে না উনার। এসব ভাবতে ভাবতেই দোতলাতে উঠে এলেন তিনি।

চিরকালই প্রচণ্ড সাহসী মানুষ সাহানা। নক্ করতে শুরু করলেন তিনি।

দুইবার নক্ করার পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল আফতাব।

"তুমি! তুমি নীচে কখন এলে? কেন এলে?" চিৎকার করে উঠলেন সাহানা।

"কী বলো। আমি তো নীচেই ছিলাম। ছাদে যেতে ভালো লাগে না। তুমি চলে যাওয়ার পর উঠে বাথরুম সারলাম। তারপর দরজাটা বন্ধ করে আবার শুয়েছিলাম।"

"তুমি না ভয় পেয়ে..."

"নাহ আর ভয় পাইনি তো। ওই, ওটা আর আসেনি!"

"দাঁড়াও, চুপচাপ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো!" এই বলে তিনতলার দিকে ছুটে গেলেন সাহানা।

***

"আঙ্কেল কি বাসায় যাননি?" সাহানাকে হন্ত-দন্ত হয়ে উঠে আসতে দেখে প্রশ্ন করল ঐশী।

"আরে! আঙ্কেল কই?" ঘরের ভেতর থেকে অক্ষরের গলা শোনা গেল। তারপর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও।

"ঐশী, আঙ্কেল কই?" অক্ষরের কাঁধে একটা তোয়ালে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে

বাথরুমে গেছিল সে।

"তুমি যখন বাথরুমে গেলে, তার দু মিনিট পর উঠে বসলেন উনি আর বললেন যে উনাকে নীচে যেতে হবে। আমি বাধা দিতে চাইলাম। কিন্তু প্রায় জোর করে নীচে নেমে গেলেন উনি।"

"তুমি চ্যাঁচালে না কেন? যেতে চেয়েছে আর যেতে দিলে?"

"আরে সমস্যা নেই।" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সাহানা।

"আন্টি, দেখে মনে হচ্ছে আপনি অনেক টেনশনে আছেন?" অক্ষরের কণ্ঠে সন্দেহ।

"না না, তেমন কিছু নয়, তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম। যাই এখন।" নামতে লাগলেন তিনি।

ঠিক তখনই ঘরের ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, "এই বাড়িটা ভালো না।" বেশ গম্ভীর আর বয়স্ক কণ্ঠটা।

ঘুরে তাকালেন সাহানা।

"আমার মা, উনিও এই বাড়িতে আসার পর এটা বলছেন। এটাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম," হাসল অক্ষর।

মুন বের হয়ে দেখল সাহানাদের ফ্ল্যাটের দরজাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আফতাব।

"আঙ্কেল, আপনি নীচে কখন আসলেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে।

"আমি তো এখানেই। এই কথা কেন যেন আমাকে সাহানাও বলছিল।"

"হ্যাঁ, আমিও তো আপনাকে উপরেই..."

"মুন থামো," নীচে নেমে এসেছেন সাহানা।

মুন সাহানার দিকে ঘুরে তাকাল।

"ওর আসলে কিছু মনে থাকে না, ওষুধ খাওয়াতে হবে, তোমার সঙ্গে আর একটা বিষয় নিয়ে একটু কথা আছে, সন্ধ্যার পর ব্যস্ত?", সাহানা জিজ্ঞেস করলেন মুনকে। কথা পালটাতে চাইছেন উনি।

"না আন্টি। আছি, সমস্যা নেই।"

"আচ্ছা, কল দেব তাহলে!" আফতাবকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন সাহানা।

***

বারান্দাতে এসে আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে উদাস নজরে তাকালেন সাহানা। বেশ নির্জন এই এলাকাটা। এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির মানুষেরা মেশেও কম।

ব্যাপারটা কী হল একটু আগে? আফতাব যদি নীচেই থেকে থাকেন তবে তিলতলাতে অজ্ঞান হয়ে গেছিল সেটা কে? তবে কি আফতাবের কথাই সত্য? এই বাড়িতে অতিপ্রাকৃত কিছু আছে?

অক্ষরের মা-ও বলছিলেন বাড়িটা ভালো না।

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারে সাহানার বিশ্বাস কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু একটু আগে কী ঘটল ওটা?

দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ আফতাব, কিন্তু এমন আচরণ আগে কখনোই করেননি উনি!

আসলেই কি তবে এই বাড়িটাতে কোনো সমস্যা আছে?

কিন্তু তা কী করে হয়? একদম নতুন একটা বাড়ি! ওসব সমস্যা তো পুরোনো বাড়িতে হয়ে থাকে।

নীচে চোখ পড়তেই বাবুলকে দেখতে পেলেন তিনি।

"অ্যাই বাবুল, হাবিব মিয়া কোথায়?" দোতলা থেকে চিৎকার করলেন সাহানা।

"কাকায় একটু মোড়ে গেছে," ওপরে তাকিয়ে উত্তর দিল বাবুল।

"তুই একটু আগে কোথায় ছিলি?"

"ঘরেই তো ছিলাম।"

আর কিছু বললেন না সাহানা। তিনি নিজেই দেখেছেন ওই ঘরে কেউ ছিল না।

***

"খোকা, বউমা, তোমাদের আবার বলছি এই বাড়িটা ভালো না! এখানে খারাপ ছায়া আছে।" খাবার টেবিলে এসে নিজের থালাগুলো রাখতে রাখতে বললেন দেবলীনা রায়। নিজের ঘরে একা একা খান তিনি।

"মা, এই যুগে এসব ভূতের গল্প কে বিশ্বাস করে?" হাসল অক্ষর, খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তার।

"তোর বাপও আমার এইসব কথা বিশ্বাস করত না," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দেবলীনা। তারপর নিজের ঘরে চলে গেলেন।

"বুঝলে অক্ষর, দ্বিতীয়বার যখন সাহানা আন্টি উঠে এলেন না? উনার মুখ দেখেই কেন যেন মনে হচ্ছিল কিছু একটা কারণে খুব ভয় পেয়েছেন উনি," অক্ষরের গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল ঐশী।

"আমিও খেয়াল করেছি... কী যেন লুকালেন উনি।"

"আর উনি এটাও বলেছেন যে আঙ্কেলের আগে এমন সমস্যা হয়নি! এই বাড়িতে আসার পর থেকে হচ্ছে।"

"কী রকম সমস্যা?"

"এই যে বাচ্চা দেখতে পাওয়া।"

"হুম, আচ্ছা কাল তো সুধাকর দার আসার কথা।"

"হ্যাঁ।"

"হুম, অফিস থেকে আসার পথে আনা ইলিশ মাছগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। তুমি তো ছিলে না। কাল সরিষা বাটা দিয়ে রান্না করো। ঘরে চিংড়ি আছে?"

"হ্যাঁ আছে তো।"

"সঙ্গে চিংড়ির মালাইকারী করো, দাদার ওটাও বেশ পছন্দ।"

"বসকে ঘুষ দিচ্ছ নাকি?" চোখ নাচাল ঐশী।

"আরে ঐশী! দাদা আমার বস হতে পারেন, কিন্তু একদম ছোটো ভাইয়ের মতো দেখেন আমাকে। তোমার হাতের লুচি খেয়ে আধা-ভক্ত হয়েছেন। তারপর থেকেই বলছেন, আমাদের বাড়িতে একদিন দাওয়াত খাবেন।"

"হ্যাঁ, আমরাই দেরি করে ফেললাম, বাড়ি বদলানোর ঝামেলা।"

"সেটাই, কাল তো ছুটির দিন। কাল একদম সেই লেভেলের একটা রান্না করে দাদাকে পুরো ভক্ত বানিয়ে দাও! এই সুযোগে যদি প্রমোশন-ট্রমোশন..."

"আহাহাহা, আল্টিমেটলি সেই একই ব্যাপার, ঘুষ।"

"এই শোন, একটা কথা মনে পড়ল। সুধাকর দার না, কিঞ্চিৎ তন্ত্র-মন্ত্র চর্চার বাতিক আছে? ছেলেবেলায় কোন তান্ত্রিকের কাছে নাকি হালকা শিক্ষাও নিয়েছিলেন!"

"উনি এসে কি এই বাড়ির ভূত ছাড়াবেন?"

"সেটা না! তবে উনাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কী বলো?"

"মা কিন্তু বারবার বলছেন।"

"হুম দরজাটা একটু লাগাও তো, ঘুরে আসি।" দরজার দিকে এগিয়ে গেল অক্ষর।

"এত রাতে কোথায় যাও?"

"দোতলার ফাহাদভাইয়ের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসি মোড় থেকে। যে মরা পাড়ায় উঠেছি, রাত দশটা বাজতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। একটা যা দোকান সেটাও আড্ডা দেওয়ার মতো না। তাই মোড়ে যাব ঠিক করেছিলাম।"

"অক্ষর! শোনো।"

"হ্যাঁ,"

"সিগারেট খেতে যাচ্ছ উনার সঙ্গে, তাই না?"

"আরে না না, সিগারেট খাওয়া ভুলেই গেছি, তোমার কারণে তো গত কয়েক মাস ধরে সিগারেট খাই না।"

***

"আন্টি, আপনার বসার ঘরটা আমার খুবই ভালো লাগে, কী সুন্দর সাজানো-গোছানো," সোফাতে বসতে বসতে বলল মুন।

"চেষ্টা করি আর কী!" ম্লান হাসি দিলেন সাহানা।

"আঙ্কেল কই?"

"খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফাহাদ কী করে?"

"মোড়ে আড্ডা দিতে গেল তিনতলার অক্ষরের সঙ্গে। সিগারেট খাবে সম্ভবত দুজনে মিলে। আমি বাড়িতে সিগারেট অ্যালাও করি না আন্টি। খেলে বাইরে গিয়ে খাক।"

"হাহা, আচ্ছা শোন। তোমাকে কিছু কথা বলার ছিল।এখন তুমি বিশ্বাস করবে নাকি। অবশ্য আমাকে কেউ বললে আমিও বিশ্বাস করতাম না।"

"কী এমন কথা আন্টি, যে বিশ্বাস করা না-করার ব্যাপার আসছে?"

"হ্যাঁ শোনো।"

ঠিক তখনই কে যেন নক করল দরজাতে।

"দাঁড়াও, আমি দেখছি," উঠলেন সাহানা।

দরজাতে ফাহাদ।

"আন্টি, স্যরি, মুনকে একটু ডাকুন তো," হাসল ফাহাদ।

"উনাকে আর ডাকতে হবে না, তোমার গলা শুনে নিজেই এসে গেছি, এত তাড়াতাড়ি আড্ডা শেষ?" সাহানার পেছনে ততক্ষণে মুন এসে দাঁড়িয়েছে।

"আরে না, মোড় থেকে ধনেপাতা আনতে, এই নাও," বলে ছোট্ট ব্যাগটা মুনের

হাতে ধরিয়ে দিল ফাহাদ।

"বাবা! এত ভালো হয়ে গেছ তুমি!"

"যদি ভুলে যাই? তাই আগেই দিয়ে গেলাম। থাকো, অক্ষর অপেক্ষা করছে!" সিঁড়ি নিয়ে নেমে গেল ফাহাদ।

দরজাটা লাগিয়ে দিলেন সাহানা।

"বুঝলেন আন্টি, মোড়ে রাতের বেলাতে নাকি টাটকা সবজির একটা ছোট্ট বাজার বসে, তাই ওকে বলেছিলাম আসার সময়ে একটু ধনেপাতা আনতে, জনাব আগেই দিয়ে গেলেন," সোফার ওপর বেশ আয়েশ করে বসল মুন।

"তোমার স্বামী দেখছি বেশ আজ্ঞাকারী!"

"আরে ধুর আন্টি, ওর তো তেমন কিছু মনেই থাকে না! কিছু আনতে বললে ভুলে যায়।"

***

"কী করিস রে মা?" সস্নেহে পুত্রবধুর মাথায় হাত রাখলেন দেবলীনা।

"ইউটিউবে ভিডিও দেখছি, চিংড়ির মালাইকারি রাঁধব কাল। এখনও ভালো পারি না," চোখ তুলে বলল ঐশী।

"তা এসব দেখার কী দরকার? এসবে আর সব ঠিকঠাক শেখায়? আমাকে জিজ্ঞাসা করতি, আমিই শিখিয়ে দিতাম।"

"একবার ভাবলাম জিজ্ঞাসা করব। তারপর ভাবলাম ইন্টারনেটেই তো আছো, আপনি হয়তো ঘুমিয়ে গেছেন, তাই আর গেলাম না," হাসল ঐশী।

"আরে না, এই অপয়া বাড়িতে কি আর ঘুম আসে এত তাড়াতাড়ি? খোকা কোথায়?"

"দোতলার ফাহাদভাইয়ের সঙ্গে মোড়ে গেছে, ওই যে সেদিন মুন আপু এসেছিলেন না? উনার স্বামী।"

"এত রাতে বের হল? এমনিতেই এলাকাটা ফাঁকা, তার ওপর এই অপয়া বাড়ি!"

"এই এলাকাটা শুধু ফাঁকা মা। ডানদিকের গলিটা পেরিয়ে রাস্তাতে উঠলে সব জমজমাট, আর ফাঁকা রাস্তাটুকুও সমস্যা না, ফাহাদভাই আছেন তো। আর মা, এই এলাকাতে লোকজন এতটাই কম যে এখানে চোর-ডাকাত আছে বলে মনে হয় না। তাদের পোষায় না সম্ভবত!"

"চোর-ডাকাতের কথা কী আর বলি রে মা? অপদেবতা।"

"আচ্ছা মা, আপনার কেন মনে হয় যে এই বাড়িটা ভালো না?"

"দেখ মা,জীবনের একটা দীর্ঘ সময় আমার গ্রামে আর মফস্‌সলে কেটেছে। এমন কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যাতে করে আমি কোনো জিনিস দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পারি। এই বাড়িটা স্বাভাবিক না। সবসময় যেন বাড়িটা কাঁপে। অজানা এক আতঙ্কে, আজ বিকালেই তো দোতলার ওই ভদ্রলোক কী পরিমাণ ভয় পেয়েছিলেন দেখলি না?"

"জানেন মা, মাঝে মাঝে আমারও গা ছম ছম করে। কিন্তু আপনার ছেলেকে ভয়ে বলতে পারি না। ও তো আবার এসব একেবারেই মানে না।"

"ওর বাপের মতো হয়েছে, বেঁচে থাকতে তিনিও এসব মানতেন না, এখন মরে গিয়ে মেনেছেন কিনা কে জানে।"

"আমি মাঝে মাঝে বুঝি না মা, নতুন বাড়ি এমন গা ছমছমে কেন? প্রথমে ভেবেছিলাম এলাকাটা ফাঁকা, তাই এমন হয়। কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভবত এমন না। এই বাড়ির সামনে দাঁড়ালেই কেমন যেন শরীর ভারী হয়ে আসে।"

"এই বাড়িটা ভালো না রে মা।"

***

"বুঝলেন ফাহাদ ভাই, বউয়ের জন্য বাড়িতে সিগারেটও খাওয়া যায় না," দ্বিতীয় গোল্ডলিফটা ধরিয়ে বলল অক্ষর।

"আমারও একই অবস্থা রে ভাই," ফাহাদের হাতে গোল্ডলিফের সঙ্গে একটা কোকের বোতল। এটাই ওর অভ্যাস, কোল্ডড্রিংক ছাড়া ওর নাকি সিগারেট জমে না।

"একদিক দিয়ে ভালোই হচ্ছে ধরুন, টাকাগুলো বাঁচছে। কলেজ আর ভার্সিটি লাইফে তো এই এক জিনিসের পিছে মাসে ক হাজার টাকা যে উড়িয়েছি।"

"আমারও একই অবস্থা রে ভাই!"

"ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। টাকার তো অভাব নাই ভাই আপনার!"

"দাও আরও খোঁটা দাও। মানুষ ভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক টাকা। ভাইরে ভাই, প্রতিদিন নটা থেকে পাঁচটা অফিস করে বাড়ি এসে আর কিছু করারই এনার্জি থাকে না। আর বেতন? খোঁজ নিও কী অবস্থা এই সেক্টরের। আজ ছুটি নিয়েছিলাম বলে বের হলাম তোমার সঙ্গে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করছ, টাকা তো তোমার মিয়া।"

"না ভাই, তেমন না। কমাস হল ঢুকলাম। চাকরিটা ভালো, টিকতে পারলে ভালোই হবে। এসব বেসরকারি চাকরি, বোঝেনই তো।"

"বউ কী করছে তোমার?"

"ও একটু বিসিএস নিয়ে ভাবছে। আপাতত মাকে সঙ্গ দিচ্ছে আর পড়ছে। ওর চাকরির তেমন তাড়াহুড়া নেই। ভাবিও তো চাকরি করেন? তাই না?"

"ওর তো রাজকীয় অবস্থা। বেশ ভালো একটা কোম্পানিতে আছে, আমার অনেক আগেই চাকরিটা হয়েছিল ওর। আমার চাইতে বেতনও অনেক বেশি। ওরই খাচ্ছি বলতে পারো।"

"হাহাহা, ঐশীর বিসিএস হয়ে গেলে আমারও একই অবস্থা হবে!"

"সেটাই, এই যে ভাই বিল কত আমাদের?" দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল ফাহাদ।

"পচাত্তর টাকা," উত্তর দিল দোকানদার।

"ভাই আমিই দিই আজ বিল?" এগিয়ে এল অক্ষর।

"আরে মিয়া ধুর, তোমার চাইতে কম কামাই বলে কি সিনিয়রিটি ভুলে যাব নাকি? বিল আমিই দেব, চাইলে একদিন বাড়িতে দাওয়াত-টাওয়াত দিও। বহুকাল হিন্দু বাড়ির লুচি খাই না!"

"আরে সে আর বলতে ভাই, হাহা!"

"চলো ফেরা যাক।"

বড়ো রাস্তাটা পেরিয়ে ছোটো গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। গলি পেরিয়ে ডানের রাস্তাটাতে গেলেই ওদের এলাকা শুরু।

"বুঝলেন ভাই, প্রতিদিন অফিস থেকে এসে আমাদের এলাকাতে ঢুকি, অদ্ভুত লাগে। ঢাকার বুকে এত নির্জন একটা এলাকা," আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে অক্ষর।

"হ্যাঁ, এজন্যই মনে হয় এখানে ভাড়া এত কম!"

"আসলেই, নতুন বাড়ি হিসাবে ভাড়াটা খুবই কম। সুলতান ভাইয়ের দোকান দেখা যাচ্ছে। সেন্টার ফ্রেশ কিনতে হবে, আপনার লাগবে ভাই?"

"কেন? রাতে বউ বকে?" চোখ টিপল ফাহাদ।

"সেটাই ভাই!"

"আমার বউ বকে না, শুধু বাড়ির মধ্যে সিগারেট না খেলেই ওর চলে।"

"আমার বউটা এইসব ব্যাপারে... যা কড়া!"

"শুধু মুখে গন্ধ না থাকলেই হবে? খেয়েছ গোল্ডলিফ, তাও তিনটা। গায়েও তো গন্ধ থাকতে পারে কিছুটা।"

"বলে দেব ফাহাদ ভাই খাচ্ছিলেন। উনার পাশে বসেছিলাম!"

"হারামি ছেলে তো তুমি! তা বিশ্বাস করবে তোমার বউ?"

"করবে না সম্ভবত, কিন্তু তারপরেও। আর তেমন কিছু বলবে না, অনেকদিন পর খেলাম তো।"

"অফিস থেকে আসার সময় খেয়ে আসবে!"

"আজকাল একা খেতে ভালো লাগে না ভাই, কারো সঙ্গে আড্ডা না দিলে জমে না!"

"সেটাই, ওই দেখো সুলতান ভাইয়ের দোকান দেখা যাচ্ছে।"

"হুম, সেন্টার ফ্রেশ। এখানে সিগারেট খাওয়া রিস্ক, চিন্তা করেন ভাবী আর ঐশী দেখতে পেলে আমাদের কী অবস্থা যে করত!"

"ছাড়ো তো, এখানে এমনিতেও খেতাম না আমি। এই মরা পাড়ার মরা দোকানে সিগারেট খেয়ে মজা নেই। গাড়ির শব্দ, মানুষের কণ্ঠ আর একটা কোল্ডড্রিংক। এসব না হলে সিগারেট জমে না আমার।"

"আমারও সেম অবস্থা ভাই।"

দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। পুরো এলাকাতে কনফেকশনারি বা মুদি দোকান বলতে এই একটাই। দোকানির নাম সুলতান।

দোকানটা ফাঁকাই বলা যায়। এত রাতে এই এলাকার লোকেরা বের হয় না বললেই চলে। অল্পবয়স্ক তিনটি ছেলে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

কয়েকটা সেন্টার ফ্রেশ নিল অক্ষর। তারপর একটার খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরে দিল। আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। ওদের ভবনটাকে দেখা যাচ্ছে, দুই-তিন মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ আর।

"এই এলাকার ছেলেরা এত রাতে সিগারেট খেতেও বের হয়?" হাসল অক্ষর।

"সম্ভবত এলাকার ছেলে না ওরা, আমাদের বাড়ি থেকে একটু সামনে গিয়ে যে মেসটা আছে সেখানে থাকে সম্ভবত। ওখানকার বেশিরভাগ ছেলেই ইন্টারপড়ুয়া।

এদের দেখেও তাই মনে হল। ওই মেসের ছেলেদেরই বেশি দেখি সুলতান ভাইয়ের দোকানে। আর এলাকার কোনো ছেলে কি বাড়ির এত কাছের কোনো দোকানে সিগারেট খাবে?"

"সেটাই ভাই!"

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সেন্টার ফ্রেশটা "থু" করে মুখ থেকে ফেলে দিল অক্ষর।

"ভাইজানেরা কই গেছিলেন এত রাতে?" জিজ্ঞাসা করল হাবিবমিয়া।

"এই একটু মোড়ের দিকে, ওই ছেলেটা কই?" ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল ফাহাদ।

"বাবুল? অয় ঘুমাইতেসে, ওই যে ঘরে।"

"ফাহাদ ভাই, আপনি ওপরে যান, আমি আর একটা সেন্টার ফ্রেশ খেয়ে তারপর যাব," বলল অক্ষর।

"হুঁ আচ্ছা আমি যাই, এহে অক্ষর! একটা জিনিস ভুলে গেছি গো," প্রায় আঁতকে উঠল ফাহাদ।

"কী জিনিস ভাই?"

"তোমার ভাবি ধনেপাতা আনতে বলেছিল, ভুলে গেছি!"

"চলেন তবে গিয়ে নিয়ে আসি।"

"নাহ, কালই আনব।"

***

"এসব কী বলছেন আন্টি! এ দেখি ভূতুড়ে ঘটনা, সত্যিই এমনটা হয়েছে!" মুনের কণ্ঠে বিস্ময়।

"সেটাই তো ভাবছি, ব্যাপারটা কি আমার মনের ভুল? কিন্তু আফতাবকে অজ্ঞান অবস্থায় তো তুমিও দেখেছো ঐশীদের বাড়িতে। আর নীচে এসে দেখি ও এখানে।"

"তারপর আবার ওপরে গিয়ে শুনলেন যে উনি নেমে গেছেন!"

"হ্যাঁ, যদি ধরে নেই যে আফতাব নিজেই নেমে এসে নিজেই দরজা লাগিয়ে আমাকে ওসব বলেছে। সেটা হওয়া অসম্ভব। কারণ আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজাসুজি এসে দরজা নক্ করেছি আর আফতাফ খুলেছে।"

"আসলেই কি বাড়িটা ভূতুড়ে আন্টি?"

"আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না মুন!"

"ফাহাদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু ও মনে হয় না এসব বিশ্বাস করবে!"

"হ্যাঁ বলবে সব আমার মনে ভুল। ওর জায়গাতে আমি থাকলেও বলতাম, আমি নিজেই দরজা খুলে ঢুকেছি আর আফতাব ঐশীদের ওখান থেকে এসেই ঢুকেছে। কিন্তু আমার অবচেতন মনের একটা অংশ আমাকে বুঝিয়েছে যে আফতাবের রূপ ধরে অন্য কেউ বা অন্য কিছু তিনতলায় অজ্ঞান হওয়ার নাটক করেছিল।"

"চিন্তার বিষয় আন্টি, আপনি ভয় পেয়েন না!"

"আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু আমার খুব অদ্ভুত লাগছে জানো মুন।"

দরজায় নক্ করার শব্দ হল।

"মনে হয় ফাহাদ এসেছে, আমিই দরজা খুলছি," উঠে পড়ল মুন।

***

"কী, আন্টির সঙ্গে গল্প শেষ?" জিজ্ঞাসা করল ফাহাদ।

"হুম," থমথমে মুখে উত্তর দিল মুন, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, "আন্টি আমি যাচ্ছি। রাতে কোনো সমস্যা হলে কল দিয়েন।"

দরজার দিকে এগিয়ে এলেন সাহানা।

"তোমার হাতে ওই পলেথিনে কী? ধনেপাতা? আন্টি দিলেন বুঝি? থ্যাংক গড!" ফাহাদের কণ্ঠে স্বস্তি।

"আন্টি কেন দেবেন? একটু আগে না তুমিই আমাকে দিয়ে গেলে?" অবাক হয়ে গেল মুন।

"আরে! আমি কখন দিয়ে গেলাম? আমি তো ওটা কিনতে ভুলে গেছি দেখে ভয়ে পড়ে গেছিলাম! আমি তো বের হয়ে আর আসিনি, এখনই অক্ষরের সঙ্গে এলাম।"

ধনেপাতার পলিথিনটা হাত থেকে পড়ে গেল মুনের।

"আরে কী হল তোমার?" প্রায় চিৎকার করে উঠল ফাহাদ।

"দেখো ফাহাদ, ফাজলামি কোরো না! তুমি সত্যিই আসোনি?" নিজেকে সামলে নিয়েছে মুন।

"আরে কী চলছে এখানে?" অক্ষর ততক্ষণে সেন্টার ফ্রেশ খাওয়া শেষ করে দোতলাতে উঠে এসেছে।

"এই অক্ষর, দেখো তো, মুন বলছে আমি নাকি এসে ধনেপাতা দিয়ে গেছি! আমি আবার কখন এলাম?" অক্ষরের দিকে চাইল ফাহাদ।

"না না, ভাবি ভাই আমার সঙ্গেই গেছেন, আমার সঙ্গেই এসেছেন! উনি ধনেপাতা কিনতে ভুলে গেছেন। ফাহাদ ভাই, আমার একটু বাথরুম..." এই বলে তাড়াতাড়ি তিনতলাতে উঠে গেল অক্ষর।

থমথমে মুখে সাহানার দিকে চাইল মুন।

"এখানে কী হয়েছে? কেউ বলবে আমাকে?" বেশ কঠিন কণ্ঠে বলল ফাহাদ।

"মুন, ওকে ঘরে নিয়ে যাও, আর রাতের বেলা কেউ নক্ করলে দরজা খুলবে না, ইভেন আমিও যদি নক্ করি আমার মোবাইলে ফোন দেবে, ঠিক আছে?" বললেন সাহানা।

মাথা নাড়ল মুন।

***

খুব জোরে দরজা নক্ করল অক্ষর। বাথরুমের বেগটা আজ একটু বেশিই পেয়েছে ওর।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল ঐশী। কোনো কথা না বলেই বাথরুমের দিকে ছুট দিল অক্ষর।

পৃথিবীর অন্যতম দার্শনিক চিন্তাভাবনার জায়গা হচ্ছে বাথরুম।

বসে থাকতে থাকতে মনটা উদাস হয়ে উঠল অক্ষরের।

এই বাড়িতে আসার পর থেকেই ওর নিজেরও অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে, কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ ওকে সবসময় দেখছে। শোবার ঘর, ড্রইং, বাথরুম, সিঁড়িঘর, ছাদ সবখানেই একা থাকলে এই অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরছে।

দোতলার আফতাব আঙ্কেলও নাকি ভয় পাচ্ছেন। ওর মা-ও বলছেন বাড়িটা খারাপ। তবে কি আসলেই কোনো সমস্যা রয়েছে? কিন্তু নতুন বাড়ি তো! এমনও তো হতে পারে যে সমস্যাটা জমির!

আর একটা ব্যাপার ওকে বেশ ভাবাচ্ছে।

গেটে হাবিব মিয়া থাকলে বাবুল থাকে না, বাবুল থাকলে হাবিব মিয়া থাকে না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, হাবিব মিয়া আর বাবুল এই দুজনকে কখনও একসঙ্গে সে দেখেনি!

***

বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছেন সাহানা। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে উনার। আশেপাশের বাড়িগুলোকে কেমন যেন রহস্যময় লাগছে। রাস্তাতে মানুষজন একেবারেই নেই।

এতসব অদ্ভুত ব্যাপার কেন ঘটছে এই বাড়িতে? আসলেই কি কোনো সমস্যা আছে?

গেটে কেউ নেই। কোথায় যায় মাঝে মাঝে হাবিব মিয়া আর বাবুল? নাকি দুজনেই একসঙ্গে ঘরে বসে আছে?

***

শোবার ঘরে চুপচাপ ঐশী ল্যাপটপে কী যেন করছে।

"ম্যাডাম কি গান শোনেন?" বিছানার ওপর উঠল অক্ষর।

"অক্ষর! তুমি কখন এলে?" চমকে উঠল ঐশী!

"দশ-পনেরো মিনিট হল, এসেই না টয়লেটে গেলাম, তুমিই তো দরজা খুলে দিলে।"

"কই? আমি তো এখানেই, দরজা নকের শব্দও তো শুনতে পাইনি!"

"কী বলো ঐশী! ঠাট্টা করো না তো!"

"মা খুলে দিয়েছেন? কিন্তু উনি তো ঘুমিয়ে!"

"তুমিই তো খুলে দিলে!"

"আমি তো এখানেই বসে আছি, কী করে খুলে দেব?"

"ঢং করছ নাকি?"

চুপচাপ কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকাল ঐশী।

"মুন আপু এত রাতে এত বড়ো ম্যাসেজ পাঠিয়েছে?" আপনমনেই বলে উঠল সে।

"আজাইরা ইয়ার্কি না করে ম্যাসেজটা পড়ো! হয়তো জরুরি কিছু লিখেছেন উনি!"

চোখ গরম করে কিছুক্ষণ অক্ষরের দিকে তাকিয়ে আবার কম্পিউটারের স্ক্রিনে মন দিল ঐশী।

চার-পাঁচ মিনিট পরেই ওর মুখের রাগি ভাবটা উধাও হয়ে গেল, সেখানে ভর করল এক অজানা আতংক।

"অক্ষর, তোমার সঙ্গে আসার সময় ফাহাদ ভাইয়া ধনেপাতা কিনতে ভুলে গেছিলেন?" ঐশীর গলা কাঁপছে।

"হ্যাঁ, এই নিয়ে দোতলার সিঁড়িতে দেখলাম বেশ জেরা হচ্ছে, বাথরুম লেগেছিল, তাই দাঁড়াতে পারিনি।"

"অক্ষর," প্রায় লাফিয়ে উঠে এসে অক্ষরের গা ঘেঁষে বসল ঐশী, "আমার খুব ভয় লাগছে।"

"কী হয়েছে ঐশী?"

"শোনো..."

***

"আশ্চর্য! এমনটা সম্ভব? হতে পারে যে হ্যালুসিনেশন হয়েছিল?" থমথমে গলায় বলল ফাহাদ।

"আচ্ছা, তাহলে ধনেপাতার পলিথিনটা?" মোবাইলে টাইপ করতে করতে বলল মুন।

"হয়তো সাহানা আন্টিই দিয়েছেন।"

"কিন্তু উনিও তো তোমাকে দেখেছেন। আর তোমাকে বা তোমার মতো কাউকে প্রথম উনিই দেখেছেন! তারপর না আমি দেখলাম।"

"দেখো মানুষের মন খুব কমপ্লেক্স একটা জিনিস, সাহানা আন্টির হাজবেন্ড পাগল।"

"ফাহাদ, এই পাগল শব্দ ইউজ করো না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, উনি মানসিকভাবে অসুস্থ। এমন একজন মানুষকে দীর্ঘকাল সামলান আন্টি, উনার মানসিক অবস্থাও তো খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। তো এমনও হতে পারে যে ধনেপাতা উনিই তোমাকে দিয়েছেন, তারপর একটা অলৌকিক গল্প শুনিয়েছেন, তিনতলার কাহিনি আর কী। তোমার মনও কিছুটা প্রভাবিত হয়ে গেছে, তাই তুমিও দরজা খুলে আমাকে দেখেছ। এমন হয় কিন্তু।"

"তিনতলার ব্যাপারটা গল্প মনে হয় তোমার? ঐশীর পুরো পরিবার দেখেছে আফতাব আঙ্কেলকে, আমিও দেখেছি।"

"কিন্তু ঘরে ফিরে তো শুধু সাহানা আন্টিই দেখেছেন, তাই না?"

চুপ মেরে গেল মুন।

"এমন হয় বুঝলে মুন," বলে চলল ফাহাদ, "হয়তো আঙ্কেল আসলেই অক্ষরদের বাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন। সেটাকেই আন্টির অবচেতন মন একটা অলৌকিক কাহিনি বানিয়ে নিয়েছে।"

"যাই হোক, কেউ দরজা নক করলে তুমি খুলবে, আর আমি সব কিছু জানিয়ে ঐশীকে মেসেজ দিচ্ছি ফেসবুকে, সেও যেন দরজা না খোলে!"

"এসব আবার ওদের বলার কী দরকার? শুধু শুধু আতঙ্ক ছড়ানো!"

***

"এ আবার কেমন কথা ঐশী!" অক্ষরের কণ্ঠে বিস্ময়।

"হ্যাঁ, তুমি একটু আগে তাহলে কাকে দেখেছ?"

"বিকালে আমাদের বাড়িতে যাকে নিয়ে এসেছিলাম তিনি আফতাব আঙ্কেল না! অদ্ভুত!"

"আমার খুব ভয় লাগছে অক্ষর!"

"আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ঐশী! এই বাড়িটার কি তবে আসলেই সমস্যা?"

"চলো আমরা এই বাড়িটা ছেড়ে চলে যাই!"

"আহ ঐশী দাঁড়াও, অনেক কিছু ভাবার আছে। এই যুগে ভূতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাব? এখন কেউ এসব বিশ্বাস করে?"

"এতকিছুর পরেও এসব বলছ?"

"যাইহোক, এখন এতকিছু না ভাবি, আমি তো আছি নাকি? ঘুমিয়ে পড়ি চলো।"

"কিন্তু এই ভয়ংকর বাড়ি।"

"কাল সুধাকরদা আসুক, উনি তন্ত্র-মন্ত্র বেশ ভালো বোঝেন, ঘুমাও এখন।"

ভেতরে ভেতরে কিন্তু অক্ষরের বুকটা কাঁপছিল তখন। পুরুষ মানুষের এই এক সমস্যা, ভয় আর ভালোবাসা, প্রকাশ করতেই যত আত্মসম্মানে বাঁধে।

***

সকাল সাড়ে আটটার মতো বাজে।

আজ বেশ তাড়াতাড়িই অফিসে চলে এসেছে মুন। গতকাল সারাটা দিন যা যা ঘটেছে, এর পর ওইসব মাথা থেকে বের করার একটা উপায়, সেটা হল নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখা।

পনেরো মিনিটে হাতে জমে থাকা একটা কাজ বেশ অনেকটাই গুছিয়ে এনেছে সে।

"আসতে পারি?" রায়হান আলমের কণ্ঠ শুনে বিরক্ত হয়ে চেম্বারের দরজার দিকে তাকাল ও।

"আরে, আসুন রায়হান ভাই!" মুখে একটা মেকি হাসি ফুটিয়ে তুলল মুন।

এই রায়হান লোকটা অফিসের একটা অদ্ভুত চরিত্র। সারাটা দিন কাজের অছিলায় মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা মারার সুযোগে থাকে। বিবাহিত-অবিবাহিত সব মেয়ের প্রতিই এই লোকের সমান টান।

যেচে যেচে সব মেয়েদের পরামর্শ দিতে এই ব্যাটার জুড়ি নেই। এজন্যই অফিসের মেয়েরা কেউই একে পছন্দ করে না।

হ্যাঁ, কিছু ব্যাপারে লোকটার বেশ জ্ঞান। তবে গায়ে পড়ে কেউ জ্ঞান বিতরণ করতে গেলে ব্যাপারটা তো বিরক্তিকরই হয়ে যায়।

"আজকে এত সকাল সকাল অফিস আসলেন যে? অন্যদিন তো আসেন না," মুনের টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল রায়হান।

"কেন সকাল সকাল এসেছি সেটা তোকে বলতে হবে?" মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মুনের।

রায়হানের এটা আর একটা বাজে অভ্যাস। মানুষকে সে এমন সব প্রশ্ন করে যা তাকে ওই সময়ে করা উচিত নয়।

মাঝারি উচ্চতার লোকটা বেশ ফর্সা, আর সেই সঙ্গে মাথাতে একটা বেশ বড়ো টাক। মুনের চেম্বারের বড়ো জানালাটা দিয়ে সকালবেলা সূর্যালোক একটা সরাসরি এসে পড়তে সেই টাকে, চকচক করছে ওটা।

"হাতে কিছু কাজ জমে গেছে তো, তাই একটু সকাল সকাল। আপনার কী খবর?" কিবোর্ডে টাইপ করতে করতেই বলল মুন।

"এই তো, এলাম, হাতে কোনো কাজ নেই। দেখলাম আপনার চেম্বার খোলা, এলাম একটু খোঁজখবর নিতে।"

"বেশ করেছেন, তা কী আনতে বলব? চা না কফি?"

ইংগিত পরিষ্কার। চা বা কফি কিছু একটা খেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় হও।

"নাহ কিছু খাব না, একটু আগেই কফি খেলাম। আপনার সঙ্গেই গল্প করতে এলাম। আচ্ছা, আপনাকে অগোছালো লাগছে, মনে হচ্ছে রাতে ঘুম হয়নি।"

আসলেই রাতে তেমন ঘুম হয়নি মুনের। সকালবেলা তাই কোনরকম কাপড় পালটেই অফিসে চলে এসেছে সে।

"আসলে ভাই, একটু সমস্যা চলছে তো, তাই ঘুম আর হয়নি।"

"হাজব্যান্ডের সঙ্গে সমস্যা?"

"আরে না না, তেমন কিছু না।"

"তবে? কী সমস্যা?"

খুব বিরক্ত লাগছে মুনের। এখন কী হয়েছে সেটা তো একে খুলে বলা যাবে না। আবার ভং-টং কিছু বললে সেটাকেও ব্যাটা টেনে লম্বা করবে। তার চেয়ে সত্য ব্যাপারটাই একটু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়?

"আচ্ছা রায়হানভাই, আপনি তো অনেক ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখেন, তাই না?" মনিটর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সরাসরি রায়হানের দিকে তাকাল মুন।

"হ্যাঁ তা তো রাখিই," চব্বিশটা দাঁত বের করে হাসল রায়হান। ওর টাকে চমকে চমকে উঠছে সূর্যের আলো। নিজেকে সবজান্তা ভাবতে খুবই ভালোবাসে ব্যাটা।

"আচ্ছা, একটা মানুষ, একই সঙ্গে দুই জায়গাতে থাকতে পারে?"

"মানে?"

"মানে ধরুন, এই আপনি আমার সঙ্গে বসে আছেন। আবার আপনি আপনার বাড়িতে, সম্ভব?"

"হুম। বিজ্ঞানের মতে এটা অসম্ভব। কিন্তু ধর্মীয় বই-পুস্তকগুলো ঘেঁটে দেখুন, এমন অনেকবারই হয়েছে। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ান মিথে।"

"আহা ভাই ধর্মীয় রেফারেন্স দিয়েন না। মহাপুরুষদের পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব। আমি বলছি কোনো সাধারণ মানুষ। যে-কোনো প্রেরিত পুরুষ নয়। একটা নরমাল হিউম্যান বিইং হুট করেই একদিন তাকে একই সঙ্গে দুই জায়গাতে দেখা গেল! সম্ভব কি?"

"চার্লস ব্লাসেনভিলের গল্প শুনেছেন?"

"না, কে উনি?"

"একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে থাকতেন। উনার সঙ্গে এমন হয়েছিল।"

"কী হয়েছিল? বলা যাবে কি ভাই? যদি ব্যস্ত না থাকেন?"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট্ট একটা ঘটনা। শোনেন, ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাস চলছে। চার্লস পশ্চিম সাসেক্সে থাকতেন নিজের স্ত্রী এমিলিয়া আর সন্তান ডেভির সঙ্গে। ঘোড়ার ব্যাবসা করতেন ভদ্রলোক। তো একদিন সকালে কিছু ঘোড়া নিয়ে কিছুটা দূরের একটা গ্রামের রওনা হন তিনি। বিকেল চারটার দিকে মিসেস. ব্রাসেনভিল চুপচাপ বারান্দায় বসে উল বুলছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে কাদামাখা পোশাকে চার্লস ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হেঁটে আসছেন। তাড়াতাড়ি উঠে এমিলিয়া তাঁর দিকে এগোলেই সঙ্গে সঙ্গে চার্লসের পুরো শরীরটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন এমিলিয়া। অদ্ভুত না? তারপর?"

"কিছুক্ষণ পর চার্লসের আস্তাবলের ম্যানেজার জন আসে বাড়িতে। সে এমিলিয়াকে জিজ্ঞাসা করে, চার্লস বাড়ি আছে নাকি? থতোমতো খেয়ে এমিলিয়া জানায় যে চার্লস তো সকালেই কতগুলো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে। তখন জন জানায় যে সে চার্লসকে আস্তাবলের সামনের মাঠটাতে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে কেউ নেই! এমিলিয়া এসব শুনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এবং জনকে বলে দেয় যে সেও বিকাল চারটার দিকেই এমন কিছু একটা দেখেছে! ধীরে ধীরে পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটা। গ্রামের গির্জার পাদ্রী জানান যে এটা ভালো কোনো লক্ষণ নয়।

"এর পর সন্ধ্যাবেলাতেই গ্রামের পনেরো-বিশজন লোক ঘোড়ায় চড়ে চার্লসের সন্ধানে বের হয়। রাত আটটা নাগাদ ওরা চার্লসের মৃতদেহ নিয়ে ফেরে। পনেরো কিলোমিটার দূরে রাস্তার পাশে একটা খাদে ওরা চার্লসের মৃতদেহ খুঁজে পায়। ঘোড়াগুলো আশেপাশে কোথাও ছিল না। গ্রামের ডাক্তার নেলসন চার্লসের মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানান যে সম্ভবত দুপুরের দিকে মৃত্যু হয়েছে! তাহলে জন আর চার্লসের বউ এমিলিয়া কাকে দেখল?"

"গড! মানে চার্লসের প্রেতাত্মা?"

"হ্যাঁ, সেটাই ধরে নেওয়া হয়। চার্লসের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল তা আজও রহস্য। গ্রামবাসীরা অনেকেই জানিয়েছিল যে ওর শরীরে কিছু গভীর ক্ষতের চিহ্ন ছিল। কেউ বলে যে অসাধানতাবশত সে খাদে পড়ে গেছিল, আবার কেউ বলে যে সম্ভবত একদল লুটেরা চার্লসকে মেরে ঘোড়াগুলো লুট করে পালিয়েছিল। কিন্তু এসবের কিছুই প্রমাণিত সত্য নয়!"

"হুম, এটাই তবে একসঙ্গে একজন মানুষের দুই জায়গাতে থাকার কাহিনি?"

"হ্যাঁ, সম্ভবত চার্লসের প্রেতাত্মা নিজের বউ আর ম্যানেজারকে জানাতে এসেছিল যে সে আর বেঁচে নেই!"

"মানে ভূত না হলে একসঙ্গে দুই জায়গাতে থাকা সম্ভব না?"

"তাই মনে হয় আমার।"

"রায়হান স্যার, আছেন?" দরজা দিয়ে মাথা গলাল পিওন রবিউল।

"হ্যাঁ আছি," বিরক্ত কণ্ঠে ঘুরল রায়হান।

"আপনাকে এমডি স্যার ডাকছেন।"

"আচ্ছা আসছি, থাকুন তবে মুন," তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল রায়হান।

"আচ্ছা।"

থ মেরে কিছুক্ষণ বসে রইল মুন। ভূত-প্রেত এসব ব্যাপারগুলো বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই করে না ও। আসলে জীবনে এই ধরনের অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপারের মুখোমুখি পড়তে হয়নি ওকে। তাই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা আসেনি।

কিন্তু কাল যা ঘটল।

নাহ্, কাজে আর মন বসবে না আজ।

***

"চুপচাপ হাবিব মিয়ার পাশে বসে থাকবে ঠিক আছে? আমি না আসা পর্যন্ত," দরজা লাগাতে লাগাতে বললেন সাহানা।

মাথা নাড়লেন আফতাব।

তখনই অপর পাশের ফ্ল্যাট থেকে একটা ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে এল ফাহাদ।

"আরে আন্টি, কই যান আপনারা?" বলে উঠল ফাহাদ।

"স্কুলে, ডেস্কে কিছু খাতা জমে ছিল, ওগুলো আনতে যাচ্ছি। বসেই তো আছি, দেখে শেষ করি। আমার ছুটিও শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন আবার চাপ হয়ে যাবে।"

"আঙ্কেল ও যাচ্ছেন?"

"না না, ওকে হাবিব মিয়ার পাশে বসিয়ে রেখে যাব। বোঝোই তো, ও একটু ভয় করে।"

"অক্ষরদের ফ্ল্যাটে রেখে গেলেই পারতেন।"

"নাহ, শুধু শুধু ওদের ডিসটার্ব। মুন কোথায়?"

"ও আজ একটু সকাল সকাল অফিস গেছে, আমি এখন যাচ্ছি।"

নীচতলাতে নেমে এল ওরা। বেরিয়ে গেল ফাহাদ।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছে হাবিব মিয়া। পাশের চেয়ারটা যথারীতি ফাঁকা।

"হাবিব মিয়া, ওকে একটু রেখে গেলাম, ওর শরীরটা আজকাল ভালো যাচ্ছে না," একশো টাকা একটা নোট বের করে হাবিব মিয়ার হাতে গুঁজে দিলেন সাহানা।

"এসবের আর কী দরকার ছিল ম্যাডাম," নোটটা পকেটে ভরতে ভরতে বলল হাবিব মিয়া, "উনি সেদিন বলতেসিলেন উনি ভয় পান।"

"তা তো একটু পায়ই, তোমার সঙ্গের ওই ছেলেটা কই?"

"ঘরে আছে নাইলে ঘুরতে গেছে, কেডায় জানে?"

"তোমার বাড়ি কোথায় হাবিব মিয়া?"

"আদিবাড়ি কোথায় আছিল জানি না, তয় তিন পুরুষ ধরে ঢাকাতেই আছি।"

"তাই? ঢাকা কোথায়?"

"মহাখালির ওই দিকে, ওইখানে ভাই-বেরাদর থাকে, তাগো সঙ্গে আমার যোগাযোগ নাই।"

"বউ-বাচ্চা?"

"সেসবের ঝামেলা নাই, যে কামাই করি, নিজেরই পেট চলে না, আবার বউ।"

"হুম, তা এ-বাড়িতে কতদিন থেকে দারোয়ান আছ তুমি?"

"দেড় মাস আগে থেকে, যখন বাড়িটা হইল ঠিক তখন থেকেই।"

"আচ্ছা তোমার স্যার তো ভয়-টয় পাচ্ছে, তা এই বাড়ি নিয়ে কোনো কাহিনি আছে নাকি?"

"কাহিনি বলতে?"

"ওই যে থাকে না, কিছু বাড়ি নিয়ে..."

"না না ম্যাডাম, ওইসব কিছু নাই, এলাকার কারো মুখেই কিছু শুনি নাই। এই এলাকার মানুষ এমনেই একে অপরের সঙ্গে মিশে কম, কিন্তু তারপরেও ওইসব কাহিনি থাকলে এমনেই আইসা কইত। ওইগুলা চাপা থাকে না।"

"আচ্ছা বেশ।"

***

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরে ফেসবুকে খোঁজা-খুঁজির পর মুন, নম্বরটা পেল। গতমাসে এক ফেসবুক গ্রুপে নম্বরটা দেখেছিল সে। গ্রুপের নামটা ঠিক মনে পড়ছিল ওর, তাই এতটা সময় লাগল।

নম্বরটা দ্রুত নিজের মোবাইলে টাইপ করে ডায়াল করল ও। দুবার রিং হওয়ার পরেই ওপাশ থেকে কেউ ফোনটা ধরল।

"হ্যালো," হালকা কণ্ঠে ওপাশ থেকে কেউ বলে উঠল।

"হ্যালো, মওলানা আসগর বলছেন?" বলল মুন।

"না, উনি তো একটু দেশের বাড়ি গেছেন। আমি উনার ছাত্র।"

"ওহ, উনাকে একটু দরকার ছিল, ওখানকার কোনো নম্বর?"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"ঢাকাতেই!"

"ওহ তাহলে উনি ফিরলে এই নম্বরেই কল দিয়েন, দুই-তিন দিন পর ফিরবেন উনি।"

"আচ্ছা," ফোনটা রেখে দিল মুন।

নম্বরটা সেভ করে টেবিলে পড়ে থাকা একটা ফাইল তুলে নিল সে।

***

"রান্না কতদূর ঐশী?" রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল অক্ষর।

"এইতো প্রায় শেষ, পোলাওটা শুধু বাকি।"

"সুধাকরদার সঙ্গে কথা হল, পনেরো মিনিটের মধ্যে মোড়ে পৌঁছোবেন তিনি। আমি যাই বুঝলে, মোড় থেকে অলিগলি পেরিয়ে অর্কিড ভবন চেনা তো যেমন-তেমন কথা না।"

"দই আর কোল্ডড্রিংক এনো।"

"ভালো কথা মনে করালে। এসো দরজাটা লাগিয়ে দাও।"

ঐশি দরজা লাগাতেই অক্ষরের নজর পড়ল সামনের ফ্ল্যাটটার বন্ধ দরজাতে। ওটা এই মাসে আর ভাড়া হবে বলে মনে হয় না। দশ তারিখ এসে গেছে, এখন আর কে ভাড়া নেবে ওটা? বেশ মোটা একটা তালা ঝুলছে দরজাতে।

তালাটা বেশ পুরোনো। বরাবরই পুরোনো জিনিসপত্রের প্রতি ঝোঁক অক্ষরের। এগিয়ে গিয়ে তালাটা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল সে।

ঠিক তখনই ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ ওর কানে এল। শব্দটা কেমন যেন 'খসখস' ধরনের।

দরজাতে কান পাতলো অক্ষর।

মনে হচ্ছে কে যেন নিজের পা দুটো ঘষটে ঘষটে হেঁটে বেড়াচ্ছে ভেতরে। কিন্তু দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ! গোটা শরীরে আতঙ্কের একটা শিহরন খেলে গেল অক্ষরের।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল ও।

দরজার সামনে চুপচাপ বসে রয়েছেন আফতাব।

"আরে আঙ্কেল," বলে উঠল অক্ষর, "আপনি এখানে কেন? হাবিব মিয়া কই?"

"তোমার আন্টি, স্কুলে গেছে বেশ অনেকক্ষণ, আমি একা ভয় পাই তো তাই এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। হাবিব মিয়া ঘরে গেল।"

"এখানে কেন থাকবেন? আমাদের বাড়িতে রেখে গেলেই পারতেন উনি। চলুন আমাদের বাড়ি চলুন," আফতাবের হাত ধরে টান দিল অক্ষর।

" না না! আমার ভয় লাগে," কেমন যেন ভীত গলাতে বলে উঠলেন আফতাব।

"আমাদের ওখানে কীসের ভয়?"

"এই বাড়ির সবখানেই আমার ভয় লাগে আর সাহানা এসে যদি শোনে যে কারো বাড়ি গেছি তবে অনেক বকবে।"

"কী যে বলেন আঙ্কেল, আন্টিকে আমি বুঝাবো।"

"না আমি যাবো না!"

"আচ্ছা," উনার হাতটা ছেড়ে দিল অক্ষর, "হাবিব মিয়া কতোক্ষণ হলো গেছে?"

"এই ধরো দশ মিনিট," নিজের মোবাইলে সময় দেখে বললেন আফতাব।

"আশ্চর্য! একে নিরিবিলি এলাকা, তার ওপর একটা বয়স্ক মানুষকে গেটে বসিয়ে রেখে ঘরে কী করছে ব্যাটা? আর সেই ছেলেটাই বা কই?" বলতে বলতে হাবিব মিয়ার ঘরটার দিকে এগোল অক্ষর।

ঘরটার দরজা খোলা।

"অ্যাই হাবিব মিয়া, কই আপনি?" এই বলে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বোকা বনে গেল অক্ষর। কেউ নেই ভেতরে!

"ও আঙ্কেল, ভেতরে তো কেউ নাই!" অবাক হয়ে বলে উঠল সে।

"সে কী কথা," উঠে এলেন আফতাব। ফাঁকা ঘরটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

"ভেতরে তো কেউ নাই আঙ্কেল! সত্যিই উনি ঘরে গেছে?"

"হ্যাঁ, আমার চোখের সামনেই গেল।"

বেজে উঠল অক্ষরের ফোনটা। স্ক্রিনের দিকে তাকাল সে, সুধাকরদার নম্বর।

"আঙ্কেল, আপনি চুপচাপ এখানে বসেন, আমার একজন গেস্ট এসছে, তাঁকে নিয়ে আসি," বেরিয়ে পড়ল অক্ষর।

***

বসার ঘরটার দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের কতগুলো হাতে আঁকা ছবি আর কিছু মডার্ন আর্ট। মাঝখানে পাথরের তৈরি একটা টেবিল। ওটার সামনেই সোফা।

একদম বামপাশে দুটো আলমারি। দুটো ভর্তি শুধু বই।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিম, ও হেনরি, মোপাসা, ভার্জিল কী নেই সেখানে?

প্রায় দশমিনিট হল সোফাতে বসে আছেন সাহানা। স্কুল থেকে সোজাসুজি এখানে চলে এসেছেন তিনি।

একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল তেরো-চৌদ্দো বছর বয়স্ক একটি মেয়ে।

"খালু আসতেছে, উনার শরীর একটু খারাপ তো," টেবিলটাতে ট্রেটা রেখে বলল সে।

ট্রে-তে চা, বিস্কুট আর কয়েক প্রকার ফল।

চায়ের কাপটা তুলে নিলেন সাহানা। এখন ফল আর বিস্কুট খাবার মতো মানসিক অবস্থা নেই তাঁর। চা জিনিসটা বেশ অদ্ভুতই বটে, আমাদের দেশের সিংহভাগ মানুষ প্রচণ্ড বাজে মানসিক অবস্থাতেও এটা খেতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে চা মানসিক চাপ কাটাতে সাহায্য করে, যদিও এ ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এটা আনোয়ারসাহেবের বাড়ি। এই ভদ্রলোকই অর্কিড ভিলার মালিক।

***

কিছু মানুষের চেহারা দেখলে কখনোই বোঝা যায় না যে তারা রেগে আছে নাকি নেই।

সুধাকর মিত্রের চেহারাটাও ঠিক তেমনই। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের বেশ গোলগাল শরীরের সঙ্গে লম্বাকৃতির মাথা আর কুতকুতে চোখদুটো খুব বেমানান লাগে। আর মাঝারি উচ্চতা সেই বেমানান ভাবটাতে যোগ করেছে আরও এক নতুন মাত্রা।

প্রায় দু-কেজি ওজনের মিষ্টির প্যাকেট হাতে উনাকে সার্কাসের জোকারের মতো লাগছে।

চিরকালই সময় সচেতন মানুষ তিনি। তাই অন্য কারও কোনো ব্যাপারে দেরিতে তার বেজায় মেজাজ খারাপ হয়। যেমন- এখনও মোড়ের কোথাও অক্ষরের টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না।

অক্ষরের বলে দেওয়া সেই গলিটা খুঁজছেন তিনি। আশেপাশে বেশ কয়েকটা গলি দেখা যাচ্ছে। এতগুলো গলির মধ্যে কোনটা অক্ষরের বলে দেওয়া গলি কে জানে? অক্ষরকে ফোন দিতেও বিরক্ত লাগছে।

ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল ওনার। অক্ষর ফোন করেছে। হয়তো বলবে আরও পাঁচ মিনিট লাগবে।

"হ্যালো, অক্ষর, বলো কী অবস্থা," ফোন ধরলেন সুধাকর।

"সুধাকরদা, আপনি কি হলুদ শার্ট পরে আছেন?"

"হ্যাঁ!"

"এই থামুন এই এসেছি," ফোনটা রেখে দিল অক্ষর।

দশ-বারো সেকেন্ড পর সুধাকরের একদম পেছন থেকে উদয় হল অক্ষর।

"ও দাদা পিছে তাকান!"

"আরেহ্ অক্ষর! কোনটা তোমার সেই গলি?"

"ওই যে ওটা," পিছের দিকে তাকিয়ে দুটো বহুতল ভবনের মাঝখানের একটা সরু গলি দেখাল অক্ষর। এতই সরু সেই গলি যে সুধাকর জায়গাটাকে পাত্তাই দেয়নি! উনার মনেই হয়নি যে ওখানেই সেই গলি থাকতে পারে।

"হুম চলো, যাওয়া যাক।"

"আরে কী বলেন দাদা, কোল্ডড্রিংক আর দইটা কিনে নেই।"

"বাদ দাও, ওসবের দরকার নেই।"

"কী যে বলেন দাদা।"

"মিষ্টি তো রয়েছেই," নিজের হাতের প্যাকেটটার দিকে নির্দেশ করলেন সুধাকর, "তোমার গলিটা যে সরু, বোঝাই যাচ্ছে, আসতে এত সময় লাগল কেন।"

"আরে দাদা, ওই গলির জন্য দেরি হয়নি," গম্ভীর হয়ে এল অক্ষরের মুখ, "কাল থেকে একটু সমস্যা হয়েছে বাড়িতে।"

"বউয়ের সঙ্গে রাগারাগি? দেখো ভাই, রান্না করেছে তো?"

"না দাদা, ও ঠিক আছে। আসলে আপনাকে বলতে বাধা নেই।"

"ভণিতা না করে বলে ফেল।"

"বাড়িতে সম্ভবত আধিভৌতিক কোনো সমস্যা হচ্ছে।"

"বলো কী! চলো তো দেখি ব্যাপারটা।"

***

গোল্ডলিফের ধোঁয়াতে যেন প্রাণ ফিরে পেলো ফাহাদ। প্রতিদিনের টিফিন আওয়ারে সিগারেট না হলে ওর চলে না।

রাস্তার ওপাশে ওর অফিসের ভবনের সামনে বেশ বড়ো কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাহাদের মনে হচ্ছে যেন কোনো এক বিরাট দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়ে শয়তানির তালিম নিচ্ছে কতগুলো ছানা-পোনা।

"ম্যান আই হেট মাই জব," ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আপনমনেই বলে উঠল সে।

"আরে ফাহাদ সাহেব নাকি?" পেছন থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ফাহাদ।

আহাদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। অর্কিড ভিলার সামনের বাড়িটাতে থাকেন তিনি। প্রথম দিনেই উনার সঙ্গে পরিচয় হয় ফাহাদের। এলাকার বাকীসব লোকের মতো অমিশুক নয় লোকটা, বেশ আমুদে প্রকৃতির।

মধ্যবয়স্ক মানুষ। বেশ লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ।

"আরে আহাদ সাহেব! এখানে?" মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল ফাহাদের।

"এই এদিকে এক আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলাম, তা আপনার কী খবর?"

"ওই যে ওই বিল্ডিংয়ে আমার অফিস, চলবে নাকি একটা লিফ? আশা করি ব্যস্ত না আপনি।"

"চলবে চলবে, নাহ, একেবারেই ব্যস্ত না।"

সিগারেট ধরালেন আহাদ সাহেব। ফাহাদও আর একটা সিগারেট নিল।

"তো ফাহাদ সাহেব, নতুন বাড়ি কেমন লাগছে? নতুন এলাকা?" ধোঁয়া

ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চাইলেন আহাদ সাহেব।

"বাড়ি তো ভালোই। কিন্তু এলাকাটা, মানুষগুলো কেমন অমিশুক।"

"আসলে হয়েছে কী এলাকাতে হাতে গোনা কয়েকটা বাড়ি, একমাত্র দোকান বলতে সুলতানের দোকানটা, সেটাও বেশি পুরোনো না। সেখানেও খুব অল্প জিনিস পাওয়া যায়। নিত্যপ্রয়োজনে এলাকার বাইরেই সবাইকে বেশি যেতে হয়। এই কারণে তেমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠে না। দোকানের আড্ডা আর চায়ের টংয়ের আমোদ ছাড়া কি আর হৃদ্যতা জমে এই সময়ে? তবে আগে না, এমনটা ছিল না। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বেশ ভালোই চেনা-জানা ছিল এলাকাতে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, আমি তো এই এলাকার আদি বাসিন্দা, আমার আব্বা যুদ্ধের পরই এখানকার জমিটা কেনেন। এখানেই আমার জন্ম হয়। তখন সব একতলা বাড়ি, বিকালে খেলার জন্য সব বাড়ির ছেলেরা বের হতাম। তখন ভালোই চেনা পরিচয় ছিল। তারপর কেউ এলাকা ছেড়ে চলে গেল, বাকিরা সংসারী হয়ে গেল। ঢাকার বাকিসব এলাকার তুলনাতে এই এলাকাটা পিছেই পড়ে রইল। মাঠে খেলার সেই রেওয়াজও এখন আর নেই, ফলে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-ছোকরারা আর তেমন একে অপরকে চিনল না। ওই যা মুখে চেনা। তাও তো ওই ছাত্রাবাসটা হওয়ার পর দু-চারজন লোক সুলতানের দোকানে সিগারেট খাচ্ছে, আগে তাও খেত না। সিগারেট রাখতই না ব্যাটা!"

"আপনি তো নস্টালজিক হয়ে গেলেন! আমাদের বাড়িটাই সম্ভবত এলাকার সবচেয়ে নতুন বাড়ি।"

"হ্যাঁ, পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত ওটা পুকুর ছিল। তারপর ভরাট করা হল। একটা বেশ বড়ো মাঠ হয়েছিল জায়গাটা। ছোটোবেলাতে কত খেলেছি ওখানে। গত বছর পর্যন্ত অমনই পড়ে ছিল জায়গাটা। তারপর বাড়িটা হল। পেছনে কিছুটা মাঠের মতো খালি জায়গা তো এখনও রয়েছে।"

"এতোদিন পর্যন্ত শুধু শুধুই পড়েছিল মাঠটা? ঢাকা শহরে ব্যাপারটা একটু বেশি আনইউজুয়াল না?"

"সেটা তো বটেই। হুট করেই বাড়িটা হয়ে গেল।"

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ ফাহাদ। সিগারেটে একের পর এক টান দিয়ে চললেন আহাদ সাহেব।

"আচ্ছা আহাদ সাহেব, আমাদের বাড়ির যে জমিটা, এতে কখনও কোনো অদ্ভুত ঘটনা হয়েছিল?"

"অদ্ভুত ঘটনা বলতে?"

"মানে ভূতুড়ে ঘটনা?"

"এই প্রশ্ন কেন করছেন?" ভ্রূ কুঁচকে গেল আহাদ সাহেবের।

"আসলে," আস্তে আস্তে বলল ফাহাদ, "আমি এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব আগ্রহী। দেখুন দীর্ঘকাল একটা ফাঁকা জায়গা পড়ে ছিল তাতে কোনো কিছুই নির্মাণ হয়নি। এই শহরের হিসাবে এটা খুবই অদ্ভুত। পুকুর ভরাটও করা হয়েছিল। তার মানে নিশ্চয় ওখানে কিছু বানানোর ইচ্ছা ছিল মালিকের। কিন্তু তা না করে দীর্ঘকাল ওভাবেই ফেলে রাখা হয়েছে। তাই ভাবলাম জমিটার কোনো দোষ আছে নাকি।"

"না ফাহাদ সাহেব... তেমন কিছুই হয়নি। দিনে রাতে কত খেলেছি আমরা ওই মাঠে। এই যুগের ছেলেরা কম্পিউটার আর ভিডিও গেম ছাড়া ওঠে না দেখে গত কয়েক বছর ওখানে কেউ খেলত না। এমনকি ধরুন.. ভরাট হওয়ার আগে যে পুকুরটা ছিল তাতেও মানুষ দেদারসে গোসল করত বলেই আব্বার মুখে শুনেছি। সেইরকম কোন ব্যাপারই হয়নি।"

"হুম।"

"নিরাশ করলাম নাকি?"

"আরে, নিরাশ কেন হবো?"

"যারা ভূতুড়ে কাহিনি খুঁজে বেড়ায় তারা যখন শোনে যে ব্যাপারটা একদম স্বাভাবিক, কোন অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নেই, তখন তারা খুব হতাশ হয়.. মানে আমার যা মনে হয় আরকি," হাসলেন আহাদ, "আপনারা এখন থাকছেন, দেখেছেন নাকি কোন ভূত-টুত?"

"আরে না না।"

"তাহলে তো কথাই নেই। বিল কত হয়েছে শুনুন তো।"

"কেন, বিল দেবেন নাকি? দেখেন, আমার এলাকাতে এসেছেন, আমিই বিল দেবো। একদিন আপনার অফিসের এলাকাতে যাব সেদিন আপনি বিল দিয়েন," কপট রাগ দেখাল ফাহাদ।

"ওরে বাবা, আচ্ছা।"

দোকানে ঢুকে বিল দিয়ে বাইরে এল ফাহাদ। আহাদ সাহেব তখনও দাঁড়িয়ে। কিন্তু উনার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছে।

"কোনো সমস্যা আহাদ সাহেব?" জিজ্ঞাসা করল ফাহাদ।

"একটা ব্যাপার মনে পড়ল। যদিও সেটা আপনার ইন্টারেস্টের সঙ্গে যায় কিনা ঠিক বুঝছি না।"

"ওই জায়গা সংক্রান্ত?"

"হ্যাঁ।"

"বলে ফেলুন।"

"আসলে ব্যাপারটা ঠিক তেমন না।"

"বলুন তাইলে কেমন?"

"তখন ধরুন আমি হাইস্কুলে পড়ি। পাড়ার ছেলেরা মিলে মাঠে খেলছি। এমন সময়ে এক সাপুড়ে এল পাড়াতে। সাধারণত সাপুড়েরা যেমন হয় এই লোকটা তেমন ছিল না। আর ঠিক সে কারণেই ওর চেহারাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। লোকটা বেশ লম্বা, গায়ের রং কুচকুচে কালো, মাথায় চুলের জটা, পরনে একটা হলুদ রঙের অদ্ভুত পোশাক। একটা ভ্যান চালিয়ে এসেছিল লোকটা, ভ্যানে একটা বেশ বড়ো ঝুড়ি, ওতেই সম্ভবত সাপ ছিল। তো সাপুড়ে এলে যা হয়, পাড়ার সবাই মিলে লোকটাকে চেপে ধরলাম, সাপ খেলা দেখাতে হবে। লোকটা রাজিও হল।

"পাড়াতে সবচেয়ে বড়ো ফাঁকা জায়গা বলতে ওই মাঠটা। সেখানে ওকে নিয়ে চললাম আমরা। লোকটা ভ্যান চালিয়ে মাঠের একটা জায়গায় দাঁড়াল। আমরাও ওকে ঘিরে দাঁড়ালাম। কিন্তু যেই লোকটা ভ্যানের প্যাডেল থেকে মাটিতে পা ফেলল

ওর চেহারার ভঙ্গি পুরো বদলে গেল। মনে হচ্ছিল কোনো একটা কারণে সে ভয় পাচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল আর বলল আজ সে খেলা দেখাতে পারবে না। ওর শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ লাগছে। তারপর অসম্ভব জোরে সে ভ্যানটা চালিয়ে চলে গেল। পালিয়ে গেল, এমনটাও বলা যায়। আমরা কজন জোয়ান ছেলে ওকে আটকাতে চেয়েছিলাম কিন্তু পাড়ার মুরব্বিদের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। উনারা লোকটাকে আটকাতে দেননি। ঘটনা বলতে এই একটাই। তবে অদ্ভুত না সম্ভবত।"

"আপনি কিন্তু ঘটনাটাকে অদ্ভুতই মনে করেছেন, নইলে আপনি এটা জীবনেও আমাকে বলতেন না!" ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে বলল ফাহাদ।

"উমম, আসলে আমার কেন যেন মনে হয় ওই লোকটা সেদিন মিথ্যা বলেছিল! ওর শরীর খারাপ ছিল না, ও কোনো একটা ব্যাপারে ভয় পেয়েছিল। ওর চোখ দেখে সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলাম।"

***

"এ তো অদ্ভুত ব্যাপার।," অর্কিড ভিলার দেয়ালের ওপর আর একটু ঝুঁকে পড়লেন সুধাকর। যেন জায়গাটা তিনি শুঁকছেন।

"কী ব্যাপার দাদা?" আশেপাশে তাকাতে তাকাতে বলল অক্ষর। মাঝে মাঝে রাস্তাতে দু-একজন লোক দেখা যাচ্ছে। তারপরেও একটা লোক বাড়ির দেয়াল শুঁকছে এই দৃশ্যটা বেশ বিব্রতকর ওর কাছে। তাই কারও নজরে পড়তে চাইছে না।

"দাঁড়াও।"

আর একটু এদিক-সেদিক ঘুরলের সুধাকর। গেটটাও নেড়ে চেড়ে দেখলেন কিছুক্ষণ।

প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। একটা চেয়ারে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে বাবুল, আর একটাতে জড়সড়ো হয়ে বসে আছেন আফতাব। হাবিব মিয়ার কোন পাত্তা নেই।

"বুঝলে অক্ষর," বলতে লাগলেন সুধাকর, "কোনো একটা খারাপ ছায়া রয়েছে এই বাড়িতে। কিন্তু সেটা কী ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। তেমন কোনো চিহ্ন বা সংকেতই নেই!"

"কোনো বিশেষ ফ্ল্যাটে সমস্যা?" ফাঁকা ফ্ল্যাটটার ভেতরের শব্দটা এখনও খোঁচাচ্ছে অক্ষরকে।

"নাহ, ছায়াটা পুরো বাড়ি, এমনকি পুরো জমিতেই। কিন্তু কী সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

"কিছু করা যাবে দাদা?"

"তুমি যখন ডাক্তারদের কাছে যাও, তখন উনারা প্রথমে কোন কাজটা করেন?"

"আমার কী রোগ সেটা বোঝার চেষ্টা করেন, লক্ষণ আর বর্ণনা শুনে।"

"হ্যাঁ,প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। মোট কথা চিকিৎসার জন্য আগে রোগনির্ণয়টা প্রয়োজন। ঠিক তেমনি এইসব ব্যাপারে আগে বোঝা উচিত সমস্যাটা কী! কিন্তু সমস্যাটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। কী আর করব?"

"হুম, চলুন তবে ভেতরে চলুন।"

ভেতরে ঢুকল অক্ষর। তার পিছে পিছে সুধাকর।

"আরে আঙ্কেল, আন্টি এখনও আসেননি?" আফতাবের দিকে তাকাল অক্ষর।

"নাহ গো বাবা, এত দেরি কেন যে হচ্ছে!"

"চলুন আমাদের বাড়ি তবে।"

"না না, যাব না। তুমি চলে যাও।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল ওরা দুজন।

"ভদ্রলোক কে অক্ষর?" সুধাকরের কণ্ঠে কিছুটা বিস্ময়।

"দোতলার ভাড়াটিয়া, মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ। উনার স্ত্রী বাইরে গেছেন তো, তাই ওখানে..."

"আর ওই ছেলেটা?"

"আমাদের গার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট আরকি।"

***

"যেসব বললেন তা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন মিসেস. হোসেন? আমি ভাবলাম কী না কী সমস্যা আমার বাড়ির, তাই অসুস্থ শরীরেও আপনাকে সময় দিলাম। আর আপনি আমাকে ভূতের কাহিনি শোনাতে এসেছেন?" স্পষ্ট বিরক্তি আনোয়ার সাহেবের কণ্ঠে। বয়স ষাট-সত্তরের ঘরে হবে আনোয়ার সাহেবের, মাথার চুল আর ভ্রূ উভয়েই পেকে আছে। কিন্তু সে তুলনায় এখনও বেশ শক্তসামর্থ ভদ্রলোক।

"আমি নিজেও হয়তো বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু যা দেখলাম।" ফাঁকা চায়ের কাপটা টেবিলে রাখলেন সাহানা।

"এই যুগে মানুষ এসব বিশ্বাসও করে?"

"অনেকেই দেখেছে।"

"তাহলে কবিরাজ ডাকুন, হুজুর ডাকুন, আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"সেটা করলেও তো আপনার অনুমতি দরকার। আপনাকে না জানিয়ে ওসব করলে পরে সে কথা তো আপনার কানে আসবেই।"

"মানে আপনারা সত্যিই ভাবছেন ও-বাড়িতে ভূত আছে, এই যুগে? দেখুন আমার বাড়ি পছন্দ না হলে ছেড়ে দিতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই, এইমাসের কোনো ভাড়া নেব না আমি। টাকার কাঙাল নই। কিন্তু এইসব বদনাম ছড়াবেন না। এত কম ভাড়াতে ঢাকা শহরে আর কোথায় বাড়ি পান দেখা যাবে।"

"দেখুন, আমরা সবাই মধ্যবিত্ত। আপনি এত কম ভাড়াতে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছেন সেজন্য সবাই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তারপরেও আমাদের সত্যিই সমস্যা হচ্ছে। আমি শুধু কিছু জিনিস জানতে চাই আপনার কাছে।"

"বলুন," কিছুটা নরম হলেন আনোয়ার।

"মানে বাড়িটা নিয়ে, বাড়ির জমিটা নিয়ে..."

"হুম বুঝেছি। জমিটা আমার বাবা পেয়েছিলেন ১৯৬৫ সালের দিকে তাঁর এক দুসম্পর্কের চাচার কাছ থেকে। ভদ্রলোক নিঃসন্তান ছিলেন, বাবাকেও খুব স্নেহ করতেন তাই ওটা লিখে দিয়েছিলেন। তখন ওটা ছিল একটা পুকুর। পরে বাবা ঠিক করলেন যে একটা বাড়ি করবেন। পুকুর ভরাট করা হল। বাড়ির কাজ শুরু হবে হবে অবস্থা, এমন সময়ে হুট করেই বাবার ব্যাবসাতে একটু মন্দা এসে

গেল। তাই আর বাড়িটা হয়ে ওঠেনি। এর পর দীর্ঘকাল জমিটা ফাঁকা অবস্থাতেই পড়ে ছিল। বাবার একমাত্র সন্তান হিসাবে ওটা আমিই পেয়েছিলাম। ওই বাড়ি, এই বাড়ি ছাড়াও ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটা বাড়ি রয়েছে আমার। ওই জমিটা নিয়ে একবার এক নামী কোম্পানির ডেভেলপাররাও প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে, আমি রাজি হইনি। ওদের সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই আমার, আমার নিজের জমি নিজের ইচ্ছামতো সব করব। তো এর পরেই মাথায় এল... একটা বাড়ি করেই ফেলি, হাতেও বেশ টাকা ছিল। পাঁচ-সাততলা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনতলা পর্যন্ত হওয়ার পরেই আমি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল প্রসাবের নালীতে সমস্যা। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, অপারেশন এসব করতে করতেই সময়টা কেটে গেল। তাই আর বাড়িটা এগোলো না। শুনশান এলাকা। আমার দুই ছেলে বিদেশ থাকে, দেশে শুধু আমি, আমার স্ত্রী আর ছোটো মেয়েটা। ওরাও ভিড়-ভাট্টায় অভ্যস্ত। ওখানে গিয়ে ওরা থাকত বলে মনে হয় না। তাই ভাড়া দিলাম আর কী। আসলে আমি চাই না আমার বাড়িটা ফাঁকা থাকুক, তাই শুরুতে ভাড়াটা কমই রেখেছি, পাঁচ বছর পর হয়তো বাড়াব। কিন্তু তারপরও দেখুন একটা ফ্ল্যাট ফাঁকাই রয়েছে। আর এখন আপনারা যে ভূতের কাহিনি শুরু করেছেন।"

"আচ্ছা, ওই জমি রিলেটেড কোনো অদ্ভুত ঘটনা?"

"নাহ, তেমন কিছুই শুনিনি। মাঝে মাঝেই জায়গাটা দেখতে যেতাম। এলাকার লোকেরাও আমাকে চেনে। তেমন কিছু থাকলে আমি শুনতে পেতাম। পেতাম না? এই যে, আপনি ভূতের কাহিনি শোনাতে বাড়ি চলে এসেছেন। ঠিক তেমনই, ওরাও বলত যদি কিছু জানত আর কী।"

***

"দাদা আর একটু মালাইকারি দেব," ডিশটা সুধাকরের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল ঐশী।

"না না, লাগবে না," হাত নাড়লেন সুধাকর।

ভীষণ অস্বস্তি লাগছে অক্ষরের। বলতে গেলে তেমন কিছুই খাচ্ছেন না সুধাকর। শুধু খাবার নাড়াচাড়া করছেন বলা যায়।

"দাদা, খাচ্ছেন না যে," নিজের থালাটা একপাশে রেখে বলল অক্ষর।

"খাচ্ছি তো।"

"ধুর দাদা, এক থালাই তো খেলেন না।"

"বুঝলে অক্ষর, ক্লাস সেভেন থেকে তান্ত্রিক মহারাজদের সঙ্গে চলাফেরা আমার। শ্মশানে থেকেছি, নানান ক্রিয়াকর্ম করেছি... আমাকে এই লাইনে মোটামুটি সিদ্ধই বলতে পারো। কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যে জিনিসটার প্রভাব সেটা যে কী, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এমন আগে কখনও হয়নি। তোমার মুখে গতকালের ঘটনা শুনে যা বুঝলাম অতিপ্রাকৃত শক্তিটা কেবলই ভেলকি দেখিয়েছে তোমাদের। তবে কারও তেমন কোনো ক্ষতি করেনি। তা সে কাল থেকেই এসব শুরু করল কেন? প্রথম কদিন কিছুই করল না, আমি কিছুটা হতাশ। নিজের ওপরে হতাশ।"

"এইসব ভূত-প্রেতের কাহিনি অনেক পড়েছি, টিভিতে অনেক দেখেছি, কিন্তু

দাদা, নিজেরাই যে এমন কিছুর পাল্লায় পড়ব, জীবনেও ভাবিনি। এই যুগে ঢাকা শহরে এমন, কে বিশ্বাস করবে?" বলে উঠল ঐশী।

"বিশ্বাস অনেকেই করবে। ঢাকা শহরেই এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অদ্ভুত জিনিসপত্র দেখা যায়। শুধু ঢাকার কথাই বলছি কেন? উন্নত বিশ্বের নানান শহর নিয়েই তো কত কাহিনি রয়েছে। তুমি কি জানো অনেকেই দাবি করে যে তারা বাদশাহ শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের প্রেতাত্মাকে তাজমহলে দেখেছে?"

"তাই?"

"হ্যাঁ, প্রেত আর অপদেবতা ভিন্ন জিনিস কিন্তু। প্রেত সাধারণত অতৃপ্ত প্রেতাত্মাদের বোঝায়। কোনো মানুষ কোন অপূর্ণ ইচ্ছা রেখে মারা গেলে কিংবা মরার সময়ে মৃতদেহে কোনো দোষ পেলে সে প্রেতযোনিপ্রাপ্ত হয়। এরা আমাদের জগতেই লুকিয়ে থাকে। সাধারণত দিনের বেলায় বাইরে আসে না, সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। রাত হলেই তবে বাইরে আসে। এদের খুব সহজেই চিনতে পারে অভিজ্ঞরা। এদের তাড়ানোও খুব সহজ। এদের কিন্তু মানুষের কোনো ক্ষতি করারও ক্ষমতা থাকে না। তুমি যদি কখনও এদের সামনে পড়ো তবে এরা তোমাকে ভয় দেখাবে, শুধুই ভয় দেখাবে। ভয় পেয়েই যদি মরে যাও, তো মরে যাবে। এরা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। হ্যাঁ, একটা বিশেষ পদ্ধতিতে এরা ব্যাপারটা পারে।"

"কী পদ্ধতি?"

"এরা ভয় দেখিয়ে তোমার মনকে খুব বেশি দূর্বল করে ফেলবে, তোমার মন বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে 'হায় হায়, এই ভূতটা তো আমাকে মেরে ফেলবে!' তখন তোমার মনের সেই নেগেটিভ এনার্জি কাজে লাগিয়েই এরা তোমাকে স্পর্শ করে। মানে মনে মনে তুমি এদেরকে তোমার শরীর স্পর্শ করার অধিকার দিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু অপদেবতা ব্যাপারটা বেশ আলাদা। এদের একটা আলাদা জগৎ থাকে... সেখানেই এদের বাস। আমাদের জগতের সমান্তরাল জগৎ আর কী। তান্ত্রিক আর ফকিরেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওদের আমাদের জগতে টেনে আনেন। এদের ক্ষমতা প্রচুর, দিনের আলোতেও এরা ঘুরতে পারে, মানুষের সরাসরি ক্ষতি করতে পারে। মাঝে মাঝে কিছু প্রেতও অপদেবতাতে পরিণত হয়। যেমন ধরো- নিশি, ভুলো, চুড়েল। এরা সবাই শুরুতে মৃত মানুষের আত্মা থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে অপদেবতাতে পরিণত হয়। এরা আমাদের জগতেই থাকে। অপদেবতাদের একটা কাউন্টারপার্ট রয়েছে- উপদেবতা। এরাও আমাদের জগতে থাকে আর মানুষের উপকার করে। যেমন ধরো, ব্রহ্মদৈত্য। তো যা বলছিলাম, অপদেতাদের চেনা খুব কঠিন।"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের বাড়িতে যার প্রভাব রয়েছে সে একটা অপদেবতা," গ্লাসে কোল্ডড্রিংক ঢালল অক্ষর।

"সম্ভবত তাই। কিন্তু আমার পরিচিত কোনো অপদেবতার সঙ্গে মিল নেই। থাকলে এতক্ষণে বুঝতে পারতাম। এ পুরোপুরি অজানা কিছু। একে শায়েস্তা করার বিদ্যা আমার জানা নেই।"

"এই বাড়িটা ভালো না খোকা, তোকে আগেই বলেছিলাম," দেবলীনার কণ্ঠ শুনে সবাই ঘুরে তাকাল। কখন যে তিনি টেবিলের কাছে চলে এসেছেন তা কেউ

খেয়াল করেনি।

"ঠিক বলেছেন কাকিমা। এই বাড়িটাতে না থাকাই উত্তম," কোল্ডড্রিংককে একটা চুমুক মেরে বললেন সুধাকর।

"দেখতো বাবা, ওরা আমার কথা শোনে না, কেউ শোনে না," বলতে বলতে আবার নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন দেবলীনা।

"একমাসও হল না দাদা, এখন কোথায় যাব? আর টাকা-পয়সারও তো ব্যাপার আছে," বিরক্ত হল অক্ষর।

"আমার খুব ভয় করছে দাদা, আমিও এখানে থাকতে চাই না," প্রায় কেঁদে ফেলল ঐশী।

"আহ, থামো তো। ওই ভেলকিই তো দেখাচ্ছে, কারো কোনো ক্ষতি করছে? একটা মাস ওসব সহ্য করো। টাকা কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি? এখন, এই সময়ে কোথায় যাব তোমাদের নিয়ে? বাড়ি জোগাড় করা অত সহজ না।" খেঁকিয়ে উঠল অক্ষর।

"শোন অক্ষর," অর্ধেক খালি গ্লাসটা রেখে দিলেন সুধাকর, "হয়তো কোনো ক্ষতি সে করছে না, কিন্তু করবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা তো নেই। আর আমার স্বল্পজ্ঞানে আমি যতদূর বুঝেছি, একে এখান থেকে তাড়ানো প্রায় অসম্ভব। তা তুমি যাকেই ডেকে আনো না কেন। বহুকাল ধরে এখানেই আছে এই অপদেবতা। সেটুকু এই বাড়ির গন্ধ শুঁকেই বোঝা যায়। তাই এখান থেকে চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য ভালো।"

***

সন্ধ্যা হওয়ার পর বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। সাহানাদের ফ্ল্যাটের বসার ঘরে মুখ গম্ভীর করে করে বসে আছে অর্কিড ভিলার চারজন বাসিন্দা- সাহানা, মুন, অক্ষর আর ঐশী।

"ফাহাদ মনে হয় এসব বিশ্বাস করছে না, তাই না মুন?" চশমাটা ঠিক করতে করতে বললেন সাহানা।

"তাই মনে হচ্ছে, তেমন কিছু দেখেনি তো, অফিস থেকে এসেই গেম খেলতে বসল। এখানে আসতে বললাম, কোন আগ্রহ দেখাল না। বলল আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব তাই ও মেনে নেবে।"

"হুম বাড়িওয়ালার কথা তো বললামই, উনি বলছেন এই বাড়ি বা জমিতে কোনো সমস্যা নেই। অনেক উলটাপালটাও বলেছেন। আমরা চাইলে নাকি বাড়ি ছেড়ে দিতে পারি।"

"সম্ভবত আগে তেমন কিছু হয়নি, হলে তো যখন আমরা ভাড়া নিলাম তখনই মানুষ আমাদের মানা করত।"

"আজ আমার অফিসের এক দাদা এসেছিলেন বাড়িতে... উনি কিছু অদ্ভুত কথা বললেন," বলে উঠল অক্ষর।

"কী অদ্ভুত কথা?" ভ্রূ কুঁচকালো মুন।

"উনি বললেন বাড়িটাতে অপদেবতা আছে, তবে ঠিক কী ধরনের অপদেবতা তিনি সেটা বুঝতে পারছেন না। তাই কিছু করতে পারলেন না। ওহ, এই দাদা

আবার তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপারে বেশ দক্ষ। উনি আরও বললেন বাড়ি হওয়ার আগে থেকেই ওটা এখানে ছিল, ওটাকে এখান থেকে তাড়ানো কোনোভাবেই সম্ভব না। বাড়িটা ছেড়ে দিলেই নাকি আমাদের ভালো হবে।"

"আমার তো এই বাড়িতে একটা মুহূর্ত থাকতেও ভয় লাগছে," অক্ষরের হাত খামচে ধরল ঐশী।

"অত সহজে ছেড়ে দেব?" চোখ গরম করল মুন, "আর ছাড়া বললেই ছাড়া? এখন বাড়ি কই পাব? কে ভাড়া দেবে? আমি অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবছি, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।"

"কী ব্যবস্থা," মুনের দিকে তাকালেন সাহানা।

"একজন বুজুর্গ আলেমের খোঁজ পেয়েছি। যিনি এসব ব্যাপারে বেশ দক্ষ। তবে একটা সমস্যা হল বর্তমানে উনি ঢাকাতে নেই। তবে দু-একদিনের মধ্যেই আসবেন। আসলে উনাকে এখানে নিয়ে আসব। তারপর উনি কী বলেন সেটা দেখে, বাড়িওয়ালার আপত্তি নেই তো?"

"না, ইনডাইরেক্টলি আমিও ব্যাপারটা তুলেছিলাম উনার সামনে, মনে হয় না উনার আপত্তি আছে।"

"অক্ষর-ঐশী, তোমাদের কী মত?"

ঐশী কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে অক্ষর বলল, "নাহ্, আমাদের কোনো সমস্যা নেই।"

"তাহলে ঠিক আছে, উনি ঢাকা না আসা পর্যন্ত আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে। আজ সারাদিন তো কিছুই হল না, এই পর্যন্ত!"

"কে জানে হয়তো কাল ভূতটার ভয় দেখানোর ক্যারা উঠেছিল," হাসল অক্ষর।

"আহ, ঠাট্টা বাদ দাও, সবাই সাবধানে থাকবে," ঠান্ডা গলাতে বললেন সাহানা।

"ঐশী, চলো তোমাকে ঘরে রেখে আসি, মা একা আছেন। ফাহাদ ভাই ম্যাসেজ দিয়েছেন, উনি নীচতলাতে নেমে গেছেন। আমরা একটু বাইরে থেকে যাব।" উঠে দাঁড়াল অক্ষর।

"এই সময়েও তোমাদের আড্ডা দিতে হয়? আচ্ছা, আমি তাহলে আন্টির এখানেই থাকছি, ফাহাদ আসলে আমাকে ডেকে নিতে বলো। আর তোমরা দুজন একসঙ্গে না এলে কিন্তু আমি যাব না এটাও বলে দিও," চোখ গরম করল মুন।

"আরে না আপু, আমরা আজকে আর মোড়ে যাব না। সুলতান ভাইয়ের দোকানে যাব। বারান্দা থেকেই দেখতে পাবেন। ভাই বললেন, অফিস সংক্রান্ত একটা ঝামেলা শেয়ার করবেন। তাই আর কী," ঐশীকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল অক্ষর।

***

"এ কী কথা শোনালেন ফাহাদ ভাই!" চমকে উঠল অক্ষর, "এই আপনার অফিসের ঝামেলা? একজন প্রতিবেশি আপনাকে এমন একটা ব্যাপার বলল আর আপনি সেটা, সাহানা আন্টির বাড়িতে বলতে পারতেন, আমরা সবাই শুনতাম।"

"তা শুনে কী হত?" একটা সিগারেট ধরিয়ে অক্ষরের দিকে আর একটা

বাড়িয়ে দিল ফাহাদ।

"আজ না। সুলতান ভাইয়ের দোকান বাড়ি থেকে দেখা যায়।"

"এত ভয় তোমার জানে!"

"এই অবস্থাতে আর সংসারে অশান্তি চাই না। কিন্তু আপনি এমন একটা কথা বললেন!"

"দেখো, অফিসের ঝামেলা শেয়ার করব এমনটাই তো তুমি ওদের সামনে বলেছ, তাই না?"

"হ্যাঁ!"

"এইজন্যই মুন তোমাকে ঘাঁটায়নি। অফিসের ঝামেলা শুনলে আর কিছু বলে না, নইলে একশোটা প্রশ্ন করত। ভালো কথা। তোমাকে ঘটনাটা শুধু বলার জন্য বললাম। বহু বছর আগে কোন পাগলা বেদে কী বলেছিল। আর আমার মনে হয় না আহাদ সাহেবও ব্যাপারটাকে গুরত্ব দেন।"

"গুরত্ব না দিলে উনি আপনাকে বললেন কেন?"

"দেখো অক্ষর," কিছুটা থমকে গেল ফাহাদ, সে নিজেও এমনটাই ভেবেছিল, "আসলে ভয়ের ব্যাপারটা তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে। সব কিছু শুরুই হয়েছে আফতাব আঙ্কেল থেকে, উনি তো মানসিকভাবে অসুস্থ, একটা ফ্যান্টাসি উনার মন ক্রিয়েট করেছে যেটাতে কোনোভাবে বিশ্বাস করে ফেলেছে উনার স্ত্রী।"

"আর তার থেকে আমাদের অবচেতন মনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তাই বলছেন?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"দেখুন আজ আমার অফিসের এক দাদা এসেছিলেন বাড়িতে। ভদ্রলোক তন্ত্রমন্ত্র বোঝেন। উনি কিন্তু বললেন বাড়িতে সমস্যা আছে।"

"বাদ দাও অক্ষর। তোমার অফিসের দাদা তো? তাই আর কিছু বললাম না। কিন্তু এই টাইপের মানুষগুলো শুধু বাইরে থেকেই শিক্ষিত হয়, ভেতরে ভেতরে এরা অনেক বেশি অন্ধবিশ্বাস ধরে রাখে। নইলে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করা মানুষ তন্ত্রে বিশ্বাস করে কী করে?"

"আপনি তো অনেক কিছুই বলে ফেললেন ভাই।"

"অক্ষর মাইন্ড করো না ব্রো, কিন্তু এই যুগে এসব।"

"ভাই আমি তো দেখেছি, ঐশীর মতো একজনকে!"

"তোমার মধ্যে ভয়টা সংক্রমিত হয়েছে। আর এর জন্য দায়ী সাহানা আন্টি আর মুন।"

"আপনাকে বোঝাতে পারব না ভাই। কিন্তু এসবের কিছুই আমি তখন শুনেছিলাম না। শুনলে না ভয় সংক্রমিত হবে।"

সুলতানের দোকানে সামনে দাঁড়িয়ে আলাপ করে চলেছে ওরা। রাত প্রায় নটার মতো বেজে গেছে। ওরা দুজন ছাড়া আর কেউই নেই দোকানের সামনে। পাঁচ মিনিট আগে শুধু এক গলির মুখের দোতলা বাড়ি থেকে একটা বাচ্চা কয়েকটা চিপস নিয়ে গেছে।

"সুলতান ভাই.. তোমার দোকানে তো বেশি মানুষ আসে না, সিগারেটই যা বিক্রি হয়, তাও বেশিরভাগই কেনে ওই মেসের ছেলেরা। চলে-টলে তোমার

ঠিকমতো?" বিল দিতে দিতে বলল ফাহাদ।

"চলে স্যার, আপনাদের দোয়াতে," একশো টাকার নোটটা ক্যাশবাক্সে রাখতে রাখতে বলল সুলতান। বেটেখাটো মানুষ সে, গায়ের রং শ্যামলা।

"আচ্ছা সুলতান, তোমার দোকানের কবছর হল?"

"এই ধরেন দশ-বারো।"

"আমাদের বাড়ি নিয়ে কোন ভূতুড়ে ঘটনা শুনেছ?"

"ভূতুইড়া ঘটনা মানে? ভূত?"

"হ্যাঁ!"

"আরে নাহ্। ওই বাড়ি তো হইল কদিন আগে। তার আগে মাঠ আছিল।"

"তা মাঠ নিয়ে কোনো কাহিনি।"

"এই পুরা এলাকাতেই কোনো ভূতুইড়া কাহিনি নাই;" খুচরা টাকাগুলো ফাহাদের হাতে ধরিয়ে দিল সুলতান।

অর্কিড ভিলার দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা।

"সুলতান বারো বছর ধরে এই এলাকাতে আছে, সেও কিছু দেখেনি, শোনেনি। আর তোমরা কজন।" ফ্যাচ করে হাসল ফাহাদ।

"সবাই কি আর সব দেখে, সব শোনে।" উদাস ভঙ্গিতে বলে উঠলো অক্ষর।

"আরে যাও যাও। আর কোনো কিছুই হবে না। কই আজ সারাদিনে তো কিছু দেখলো না কেউ!"

পরের একটা সপ্তাহ বেশ নির্বিঘ্নেই কেটে গেল অর্কিড ভিলার বাসিন্দাদের। অদ্ভুত বা অলৌকিক কিছুই হল না।

এমনকি আফতাবসাহেবও সেই অদ্ভুত বাচ্চাটাকে কোথাও দেখলেন না।

এর মধ্যে সাহানার স্কুলও খুলে গেছিল। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে এসব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ খুব কমই পাচ্ছিলেন তিনি। এখন সাহানা বাইরে গেলে আর আফতাব, হাবিব মিয়ার পাশে বসে থাকেন না। বাড়িতেই থাকেন। উনার আর ভয় লাগে না।

ফাহাদের কথার চোটে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে গেল মুনের। সেই মৌলবিকে সে আর একবার ফোন দিয়েছিল, কিন্তু তিনি এখনও ঢাকাতে আসেননি। মুনকে পরে ফোন দিতে বলা হয়েছে।

অলৌকিক ঘটনাগুলো শুধুই সবার অবচেতন মনের কল্পনা, এই ব্যাপারটা প্রতিনিয়তই সবাইকে বোঝাতে চাচ্ছে ফাহাদ।

ক্রমাগত ফাহাদের কথা শুনে অক্ষরেরও মনে হচ্ছে যে সম্ভবত পুরো ব্যাপারটাই ওদের মনের কল্পনা ছিল।

ঐশীও বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে। এখন আর বাড়ি ছাড়ার কথা বলে না।

শুধুমাত্র দেবলীনাই দিনে অন্তত পাঁচবার বলেন, "এই বাড়িটা ভালো না!"

হুট করেই অর্কিড ভিলার পরিবেশটা কেমন বদলে গেল তাই না?

অতিরিক্ত শান্ত পরিবেশ আসলে ঝড়ের পূর্বাভাস। কী ভয়ংকর একটা সময় যে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে তা যদি জানত অর্কিড ভিলার বাসিন্দারা।

।। ২ ।।

হুট করে ঘুমটা ভেঙে গেল সাহানার।

আশেপাশে তাকাতে লাগলেন তিনি। জিরো পাওয়ারের সবুজ আলোতে সব কিছু বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছেন আফতাব।

বেশ গরম পড়েছে।

বালিশের তলা থেকে মোবাইলটা বের করলেন সাহানা, রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। পরের দিন শুক্রবার, তাই আজ একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিলেন তিনি। শুক্রবার বেশ ভোরে উঠে পুরো সপ্তাহের জমে থাকা কাপড়গুলো কেচে ফেলেন তিনি।

একটা বেশ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। তবে সেটার কথা এখন ঠিক মনে পড়ছে না তাঁর।

এমনটা মাঝে মাঝেই হয়। স্বপ্ন দেখার পর সেই স্বপ্নের কথা মনে করতে পারি না আমরা। শুধু এটুকু মনে পড়ে যে স্বপ্নটা খারাপ ছিল, না ভালো ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নটা খারাপই হয়।

বিছানাতে উঠে বসলেন তিনি। একটা ব্যাপার মনে পড়ল, স্বপ্নের মধ্যে বেশ জোরে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন আর তাতেই ঘুমটা ভেঙে গেছে।

সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে আলো জ্বালালেন তিনি। এনার্জি বাল্‌বের উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভেসে যেতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে ডাইনিংয়ে এলেন সাহানা। একটু বাথরুম যাওয়া প্রয়োজন। বামপাশেই বাথরুমটা।

খুট.. ডাইনিংয়ের লাইটটাও জ্বালিয়ে দিলেন তিনি।

পানির জগটা উপুড় কাত হয়ে পড়ে আছে ডাইনিং টেবিলের ওপর, ঢাকনিটা কিছুটা খুলে গেছে আর সেই ফাঁক দিয়েই অনেকখানি পানি বের হয়ে পুরো টেবিলটা ভিজে গেছে। পানি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে মেঝেতে।

তবে কি জগটা পড়ে যাওয়া শব্দেই ঘুম ভেঙেছিল সাহানার?

কিন্তু জগটা পড়ল কী করে? কেউ না ফেললে তো ওটার এভাবে পড়ার কথা না। ডাইনিং টেবিল বরাবর জানালাটা বেশ দূরে। এমনটা প্রায় অসম্ভব সেখান থেকে বাতাস এসে জগটা পড়ে যাবে। আর পানি ভর্তি একটা জগ ফেলতেও সেই রকমের জোরদার বাতাস লাগে।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সাহানা। নাহ, পরিবেশ শান্ত। আকাশে মেঘের কোনো চিহ্নই নেই। দিব্যি তারাভরা সুন্দর একটা রাতের আকাশ।

তার মানে কোনো ঝড়-তুফান ওঠেনি। তাহলে জগটা পড়ল কী করে?

কেমন যেন অদ্ভুত লাগতে লাগল। আনমনেই বাথরুমের সামনে এসে পড়লেন তিনি।

বাথরুমের লাইটটা জ্বালাতেই সাহানার পুরো শরীর যেন কেঁপে উঠল।

একটা ছোট্ট বাচ্চা, দুই-তিন বছর বয়স হবে, গায়ের রং কুচকুচে কালো, বাথরুমের গামলাটার মধ্যে বসে পানি নিয়ে খেলা করছে। আলো জ্বলতেই সাহানার দিকে তাকাল সেই বাচ্চা, চোখদুটো পুরোপুরি কালো, সাদা অংশ নেই সেখানে।

ঠিক যেমন আফতাব দেখেছিলেন!

তাড়াতাড়ি চোখদুটো কচলালেন সাহানা। নাহ, কিছু নেই! পুরো বাথরুম ফাঁকা। গামলাটা পুরোটাই পানিতে ভর্তি, ওটার মধ্যে কেউ বসেছিল বলে মনে হচ্ছে না।

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে চিৎকার-চেঁচামিচি করে বাড়ি মাথায় তুলত, নইলে বাথরুমের সামনে থেকে দৌড়ে পালাত। কিন্তু সাহানার ধাতটাই আলাদা। প্রচণ্ড সাহসী তিনি।

উনি ধরেই নিলেন যে উনার হ্যালুসিনেশন হয়েছে। হ্যালুসিনেশনের একটা প্রধান শর্ত হল যে জিনিসটা মানুষ দেখে সেটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকতে হয়। যেহেতু আফতাবের মুখে তিনি একাধিকবার একটা অপার্থিব বাচ্চার কথা শুনেছেন, তাই তার অবচেতন মনের মধ্যে সেই বাচ্চার একটা প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়ে গেছে। আর যেহেতু একটা খারাপ স্বপ্ন আর জগটা পড়ে যাওয়া নিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে উনার মনের মধ্যে, সেক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

দরজা লাগিয়ে বাথরুমে বসলেন তিনি।

দুই-তিন মিনিট পর দরজা খুলতে গিয়ে আবার বড়ো ধরনের ধাক্কা খেলেন সাহানা। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ! কিন্তু কে বন্ধ করল? আফতাব? আফতাব এমন কাজ কেন করবে? আর ও তো ঘুমাচ্ছে!

ভেতর থেকে বন্ধ বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে লাগানোর মতো শয়তানি আফতাবের মাথাতে থাকার কথা না। কিন্তু বাড়িতে তো আফতাব আর উনি ছাড়া কেউ নেইও।

ঠিক তখনই উনার মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা স্বপ্নটার কথা, একদম পরিষ্কার।

স্বপ্নটা এমন, একটা বিরাট বড়ো পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পুকুরটার ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। মানুষটা মুণ্ডুহীন!

পুরো শরীরে আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল সাহানার। এই স্বপ্নের কথা এখনই মনে পড়তে হল তাঁর? ভয়ের নিয়মটাই অবশ্য এমন। মানুষ যখন ভয় পেতে শুরু করে তখন তার মাথাতে অন্য ভয়ের কথাগুলোও চলে আসে। কেউ কেউ তো গভীর রাতে সিনেমাতে দেখা কিছু দানবের কথা ভেবেও বাথরুমে যায় না।

কিন্তু সাহানা অমন মানুষ নন। সাহসী তিনি, কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে, সেটাকে কোনোভাবেই আর হ্যালুসিনেশন বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন না তিনি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, বাথরুমে বন্দি তিনি। এটা কি হ্যালুসিনেশন হতে পারে?

অদ্ভুত একটা শব্দ শুরু হল বাইরে। যেন কেউ পুরো ডাইনিং জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ছোটো কোনো বাচ্চার পায়ের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

তবে কি সেই বাচ্চাটা? যাকে তিনি একটু আগে দেখেছেন? যাকে দেখে আফতাব ভয় পেতো?

শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দরজাটা ধরে টান দিলেন সাহানা। উনাকে অবাক

করে দিয়ে খুলে গেল সেটা, প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু সময়মতো সামলে নিলেন।

নাহ্! কেউ নেই ডাইনিং-এ।

বাইরের ছিটকিনিটাতে হাত দিলেন সাহানা। পুরোপুরি বাম দিকে হেলে আছে ওটা। হয় ওটা কখনও লাগানোই ছিল না, কিংবা কেউ লাগিয়ে দিয়েছিল আবার খুলে দিয়েছে।

সাহানার টানে যে দরজাটা খোলেনি সেটা নিশ্চিত। যদি ওইভাবেই খুলত তাহলে ছিটকিনিটা ভেঙে যেত।

সাহানা বুঝতে পারলেন যে মনকে আর ফালতু বুঝ দিয়ে লাভ নেই। কোনো হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না উনার, যা হচ্ছে পুরো অলৌকিক আর অতিপ্রাকৃত।

কেমন যেন ঠান্ডা লাগছে লাগতে শুরু হল তাঁর। পুরো বাড়ির তাপমাত্রাই যেন এক নিমেষেই বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে।

মনে মনে হাসলেন সাহানা, কোথায় যেন তিনি পড়েছিলেন যে অতিপ্রাকৃত সত্তাগুলোর উপস্থিতির একটা বড়ো প্রমাণ হলো সেই জায়গাটার সঙ্গে বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রার একটা বড়ো তারতম্য।

সম্ভবত এই অতিপ্রাকৃত শক্তিটা নিজের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাহানাকে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে চাইছে।

নাহ্, কোনো লাইট আর বন্ধ করবেন না তিনি। জ্বলে থাকুক সবগুলো।

টলতে টলতে কোনোমতে শোবার ঘরে এলেন তিনি। বিছানায় গভীর ঘুমে অচেতন আফতাব। তাঁকে ঘিরে ধরেছে একগাদা মশা। এই অবস্থাতে কয়েল জ্বালানো কিংবা মশারি দেওয়া কোনোটাই সম্ভব নয় সাহানার পক্ষে। খাক কিছুটা রক্ত ওরা আফতাবের।

এই ঘরের লাইটও বন্ধ করলেন না সাহানা। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি।

তখনই পাশের বারান্দা থেকে দৌড়াদৌড়ির শব্দ আসতে লাগল, ঠিক ডাইনিং-এর মতো। মনে হচ্ছে যেন কোনো ছোটো বাচ্চা ক্রমাগত বারান্দার একপাশ থেকে আর একপাশে দৌড়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো ডান থেকে বাম দিকে যাওয়ার শব্দই শুধু আসছে। বাম থেকে দৌড়ে আবার বামে ফিরে আসার কোনো শব্দ নেই। মানে কী?

জানালা খুললেন সাহানা, বাইরে কী হচ্ছে তাকে দেখতে হবে।

সেই বাচ্চাটাই। ডান থেকে বামপাশের দৌড়াচ্ছে আর দেয়ালের সামনে এসেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এরপর আবার তাকে ডানপাশে দেখা যাচ্ছে।

বুকের ওপরটা হুট করেই ভারী ভারী লাগছে সাহানার। হৃদরোগ আর উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে তাঁর। কোনোক্রমেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না।

কিন্তু যা হচ্ছে! তাতে তো...

এখন কী করবেন সাহানা? আফতাবকে জাগাবেন? কিন্তু সে তো মহাভীতু, তাকে জাগালে ভয় পেয়ে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মুন কিংবা ঐশীকে ফোন করবেন? এত রাতে কি ওরা ফোন ধরবে? ফাহাদ তো এই বাড়ির অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপার বিশ্বাসই করে না!

তবে ডাকলে ওরা আসবে।

কিন্তু বইতে পড়া কিংবা টিভিতে দেখা ভূতের গল্পে যা হয়, একগাদা মানুষ আসলে ভূত-টুত আর কিছু থাকে না! তখন কি ফাহাদ উনাকে নিয়ে হাসবে? অক্ষরও তো হাসতে পারে! হয়তো এখান থেকে গিয়ে নিজেদের বউদের বলবে, "বুড়িটার ভীমরতি দেখো, এত রাতে কোনো কারণ ছাড়াই ভয় পেয়ে একটা ফ্যান্টাসি গল্প তৈরি করে পড়শিদের ঘুম হারাম করছে!"

আত্মসম্মানবোধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ খারাপ একটা ভূমিকা পালন করে। এই জিনিসটার কারণেই তীব্র বিপদেও অনেক মানুষ চুপচাপ থাকে, কাউকে জানায় না।

বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন সাহানা, এই ভয়ংকর রাত তাঁকে যেভাবেই হোক পার করতে হবে।

থেমে গেল বারান্দার সেই দৌড়াদৌড়ির শব্দ। কেমন একটা অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা ছেয়ে গেল চারপাশে। সাহানা খেয়াল করলেন যে পুরো ঘরটাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে, এমনকি একটু আগে মশার যে মৃদু গুঞ্জন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন তাও শোনা যাচ্ছে না।

ঘরের আবহাওয়া হুট করেই কেমন যেন শীতল হয়ে যেতে লাগল। ঠিক একটু আগের ডাইনিং-এর মতো।

তবে কি ওটা এখন ঘরে? কিন্তু কোনো পায়ের শব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে ঘরের ঠান্ডা বাড়তে লাগল। রীতিমতো কাঁপতে লাগলেন সাহানা। কিন্ত চোখ খুললেন না।

বুকের বামপাশটায় চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগতেন তিনি।

একটা অস্ফুট রকমের শব্দ আসতে লাগল ঘরের ঠিক মাঝখান থেকে। শব্দটা অনেকটা কুকুরের কান্নার মতো, তবে খুবই আস্তে। যেন ঘরের মাঝখানে বসে কোন বাচ্চা কুকুর কেঁদে চলেছে।

ঠান্ডা বেড়েই চলেছে। এসি চললে ঘর যেমন ঠান্ডা হয় ঠিক তেমন অবস্থা অনেকটা।

বাম কাত হয়ে শুয়ে আছেন সাহানা, মেঝের দিকে, ওদিক থেকেই আসছে শব্দটা। উনার কেন যেন মনে হচ্ছে ঠিক সামনেই কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ খুললেন তিনি, নাহ্ কেউ নেই। ঘরের মাঝখানে কেউ নেই।

ডান দিকে তাকালেন, নাহ্ সেখানেও কেউ নেই। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ধোঁয়া, কুয়াশার মতো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার বাম দিকে ঘুরলেন সাহানা, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল তাঁর, খাটের একদম পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাচ্চাটা। মাথা নীচু করে সাহানাকে দেখছে সে।

বুকের ব্যথাটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

"ক...ক...কে তুমি?" কোনোমতে বললেন সাহানা।

কোনো উত্তর দিল না বাচ্চাটা কিন্তু ওর মুখটা বদলে গেল, সেই ছোটো বাচ্চার মুখটা পরিণত হলো একটা বীভৎস, কুৎসিত মুখে। তরমুজের বিচির মতো দুটো চোখ, বিরাট বড়ো মুখ, সেখানে অসংখ্য সূচালো দাঁত, মুখের এখানে-সেখানে ভয়ংকর সব ঘা, সেগুলো থেকে ক্রমাগত পুঁজ বের হচ্ছে। ওই মুখ পৃথিবীর কোনো

মানুষের মুখ না।

যেন একটা ছোট বাচ্চার মাথা কেটে সেখানে নরকের কোনো পিশাচের মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কুৎসিত পিশাচটা শব্দ করে হেসে উঠল।

চিৎকার করতে গিয়েও পারলেন না সাহানা, কোনো শব্দ বের হল না উনার মুখ থেকে।

***

"এই ছুটির দিনে এত সকাল সকাল কে দরজা নক করছে, তাও এত জোরে, মুন একটু দেখো তো" বিরক্ত কণ্ঠে বলল ফাহাদ। সারারাত পাবজি খেলেছে সে।

"হুম।" পাশ থেকে বলে উঠল মুন, এখনও ঘুম পুরোপুরি ভাঙেনি ওর।

"আরে দেখো না কে জোরে নক করছে, আমার শরীরটা একটু খারাপ।"

"হুম, ওহ হ্যাঁ।" বিছানাতে উঠে বসল মুন, "সারারাত গেম খেললে খারাপ তো..." থেমে গেল ও। আসলেই বেশ জোরে কেউ নক্ করছে।

তাড়াতাড়ি নেমে দরজার দিকে দৌড়ে গেল ও।

দরজা খুলে আফতাবকে দেখতে পেল সে। ভদ্রলোকের মুখে দেখে মনে হচ্ছে কিছু দেখে বেশ ভয় পেয়েছেন উনি।

"মুন, তো... তোমার আন্টি।"

"আন্টি, কী হয়েছে উনার?"

"ও উঠছে না, এসো তো।"

আফতাবের পেছন পেছন তাদের ফ্ল্যাটে ঢুকল মুন।

ডাইনিং টেবিলে জগটা তখনও উলটে আছে, বাঁকা চোখে সেদিকে তাকাল মুন।

বিছানাতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন সাহানা, চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, একটা হাত বুকের বাম পাশটা খামচে ধরে রয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে কোনো কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তিনি।

বুকটা কেঁপে উঠল মুনের। তাড়াতাড়ি সাহানার গায়ে হাত দিল সে, বরফের মতো ঠান্ডা!

নাড়ি দেখল সে। তারপর নাকের সামনে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস বোঝার চেষ্টা করল। যা ভেবেছিল তাই।

"শি ইজ নো মোর!" এই বলে মাটিতে বসে পড়ল মুন।

বুকফাটা আর্তনাদ করে কান্নাতে ভেঙে পড়লেন আফতাব।

***

"আঙ্কেল আন্টির কি হার্টের প্রবলেম ছিল?" অক্ষরের কণ্ঠে বিস্ময়।

"হ্যাঁ ছিল কিছুটা, সঙ্গে হাই ব্লাড প্রেশারও ছিল," প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আফতাব। ইতোমধ্যেই দুইবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, এখন সোফার একটা কোনাতে বসে নীরবে কেঁদে চলেছেন।

একটু সরে এল অক্ষর আর ফাহাদ।

"তাইলে ভাই সম্ভবত হার্ট অ্যাটাকই, কী বলেন? কার্ডিওজেনিক শকও হতে পারে, পাম্প করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত পায় না হার্ট, আবার অনেকক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের ফলেও কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। তবে উনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভয় পেয়েছেন। সেই হিসাবে কার্ডিওজেনিক শকই সম্ভবত। তারপরেও ভুল হতে পারে, যেহেতু আমরা কেউই ডাক্তার নই। কোনো ডাক্তার ডেকে দেখা যেতে পারে।" ফাহাদের দিকে তাকাল অক্ষর। মেডিক্যাল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘাঁটাঘাঁটি করে।

"ভয় পেলে হার্ট অ্যাটাক হতেই পারে," খেঁকিয়ে উঠল ফাহাদ, "আর এর মধ্যে আবার ডাক্তার কেন? স্বাভাবিক মৃত্যু!"

"না মানে আমি শুনেছি, এইক্ষেত্রেও নাকি চাইলে পরীক্ষা করানো যায়।"

"বাদ দাও তো, সারাটা দিন উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা আর কল্পনার জাল বুনলে মানুষ দিনে রাতে এমনিতেই ভয় পায় আর এসব হয়ে যায়।"

"ফাহাদ, শি ইজ নো মোর, এইভাবে কথা বলবে না," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল মুন। ওর পিছে পিছে ঢুকল ঐশী আর দেবলীনা। এতক্ষণ শোবার ঘরেই ছিল ওরা, যেখানে সাহানার মৃতদেহ রয়েছে।

"আরে মুন, তোমরা এইসব ভূতুড়ে গল্প ফাঁদিয়েই সমস্যাটা বাঁধিয়েছ, আন্টির মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে উনি কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন। কদিন আগে ভূত-ভূত করে কী কাণ্ডটাই না তোমরা করলে।"

"আঙ্কেল, রাতে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল?" আফতাবকে প্রশ্ন করল ঐশী।

"ন না... আমি তো ঘুমিয়েই ছিলাম।" তোতলাচ্ছেন আফতাব।

"উনাকে আর কোনো প্রশ্ন করে আমাদের বিপদে ফেল না ঐশী, উনার অবস্থা এমনিতেও ভালো না," বিরক্ত হল ফাহাদ।

"আমি বাড়িতে ঢুকেই দেখেছি ডাইনিং-এর ওপর জগটা ওলটানো, ওটা কি আপনার কাছ থেকে উলটেছে আঙ্কেল? মানে পানি খেতে গিয়ে?" সোফাতে আফতাবের ঠিক পাশে বসল মুন।

"না। আমি তো পানিই খাইনি। সকালে উঠে দেখি সাহানা তাকিয়ে আছে। ওর গা-হাত-পা ঠান্ডা! আমি কত ডাকলাম, ও উঠল না। আমি পানি খাইনি, এখনও খাইনি!" আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন আফতাব।

"এই মুন, তোমার কি এখন ঝামেলা না করলে হয় না? বলছি না উনার অবস্থা ভালো না?" খেঁকিয়ে উঠল ফাহাদ।

"দেখো ফাহাদ, আমার কাছে ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কী করে উলটালো জগটা? এমনও তো হতে পারে যে আন্টি কিছু দেখে রাতে ভয় পেয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, উনি কিছু দেখে ভয় পেলেন, উনার শরীরের সঙ্গে টেবিলটার ধাক্কা লাগল, জগটা পড়ে গেল। এর পর? উনি আবার এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এখানে আর ভূতুড়ে গালগল্প লাগিয়ো না মুন। বিরক্ত লাগছে তোমাদের এসব।"

"গল্প? এগুলো গল্প মনে হয় তোমার কাছে?" উঠে দাঁড়াল মুন।

"এহ, ভাইয়া-আপু, বাদ দেন তো," দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল অক্ষর।

"এই যে ভাইসাবেরা, উনাদের বাড়িত খবর দিসেন? আত্মীয়-স্বজন?" কখন যে হাবিব মিয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়ালই করেনি।

"নাহ, এখনও সম্ভবত হয়নি। আপনি ঠিকানা জানেন?" বলল অক্ষর।

"আমি কেমনে জানমু? আফতাব সাহেবরে জিগান।"

"বাবুল কই?"

"অয় ঘুমাইতেসে," চলে গেল হাবিব মিয়া।

সবাই চুপ মেরে গেল। মৃত্যু জিনিসটা চিরকালই রহস্যময়। এমন এক রহস্য, যা মৃত ব্যক্তির আশেপাশের মানুষদেরকেও জীবনের শেষ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

"এই বাড়িটা ভালো না," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন দেবলীনা।

***

"দেখুন, আমার বোনকে কিন্তু আমরা নিয়ে যাব, আমাদের আজিমপুর গোরস্থানে ওকে কবর দেওয়া হবে, ওরা যদি নিয়ে যেতে চায় তবে কিন্তু আমরা শুনব না," বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল ফাহাদ। যেন সাহানারই একটা অল্পবয়স্ক সংস্করণ, বোঝাই যাচ্ছে ছোটোবোন।

"আমার মনে হয় না আফতাব আঙ্কেলের আত্মীয়রা আপত্তি করবেন, সমস্যা হবে না," মাথা নাড়ল ফাহাদ।

"আচ্ছা ঠিক আছে।"

সাহানার মৃতদেহ কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে ডাইনিং-এ রাখা হয়েছে। পাশেই বসে আছেন উনার দুই বোন আর এক ভাই।

আফতাবের কাছ থেকে কিছুই জানা যায়নি। অবশেষে সাহানার মোবাইল ঘেঁটে তাঁর ভাইয়ের নম্বর বের করে মুন। তারপর ফোন করে সব কিছু জানায় অক্ষর। এর পর উনারাই আফতাব সাহেবের বাড়িতে খবর দেন।

ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসে আছেন আফতাব, পাশের দুটো চেয়ারে উনার দুই ভাই।

এলাকার বেশ কয়েকজন মানুষ এসেছেন। পুরুষেরা অধিকাংশই ড্রইংরুমে বসে আছেন। নারীরা একজন একজন করে মৃতদেহের মুখ দেখছেন।

ড্রইংরুমে বসে থাকা লোকেদের সবাইকেই মুখে চেনে ফাহাদ, তবে একমাত্র আহাদ সাহেব ছাড়া আর কারো সঙ্গেই তেমন পরিচয় নেই তার। আহাদ সাহেবের পাশে বসে আছে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সি একটা ছেলে। ছেলেটা ফর্সা এবং বেশ লম্বা, আহাদ সাহেবের সঙ্গে চেহারাতে অনেক মিল ছেলেটা। সম্ভবত উনার ছেলে।

মোবাইলে সময় দেখল ফাহাদ, বেলা বারোটা বেজে গেছে। সাভার থেকে আফতাব সাহেবের দুজন ভাই আসতেই একটু দেরি করে ফেলেছেন।

"ফাহাদ ভাই," অক্ষরের কণ্ঠ শোনা গেল দরজার দিক থেকে।

"হুম," ঘুরে তাকাল ফাহাদ, একটা নীল পাঞ্জাবি পরে এসেছে অক্ষর।

"ভাই, শোনেন," ওর পাশে এসে দাঁড়াল ফাহাদ, "খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে? আমার বাড়ি চলেন। মুন আপুকে অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও কিছু খাওয়ানো গেল না। ভেঙে পড়েছেন উনি।"

"এখন আর খাওয়া ইচ্ছা নেই অক্ষর, এত মানুষ। সবকিছু শেষ হোক, তারপর।"

"তা কী ঠিক হল?"

"আজিমপুরে, এখন আহাদ সাহেবকে বলতে হবে।"

"একটা জিনিস খেয়াল করেছেন ভাই? দুজনের সঙ্গেই উনাদের আত্মীয়-স্বজনের বেশ দূরত্ব ছিল। নইলে কখনও আমাদের উনারা বলেননি। দেখেন এদের হাবভাব।"

"সেটাই।"

ব্যাপারটা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে ফাহাদ। বাড়িতে ঢোকার পর সাহানার এক বোন একটু কেঁদে উঠেছিল, ওইটুকুই। এখন পর্যন্ত ওরা সবাই স্বাভাবিকই আছে। আফতাবের দুই ভাইয়ের মধ্যে তো কোনো ভাবান্তরই নেই। মানসিক দূরত্ব থাকলে যা হয়।

"আঙ্কেল," আফতাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফাহাদ, "আন্টিকে উনার ভাই-বোনেরা আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করতে চাচ্ছে। আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?"

"ন.. নাহ..." কান্নায় ভেঙে পড়লেন আফতাব।

"দাফন শেষ হওয়ার পর আফতাবকে আমরা কিছুদিনের জন্য আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে চাই, এই ফাঁকা বাড়িতে ও থাকবে কী করে?" পাশ থেকে বলল উনার এক ভাই।

"আঙ্কেল কি যেতে চাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, ও যাবে।"

"হুম।"

সরে এসে আবার অক্ষরের পাশে দাঁড়াল ফাহাদ।

"কবর আজিমপুর গোরস্থানেই হবে। আর আফতাবকে কিছুদিনের জন্য উনার ভাইয়েরা নিয়ে যেতে চাচ্ছে।"

"বেশ তো। একা বাড়িতে উনি থাকতে উনার খারাপই লাগত। ভয়-টয়।"

"সেটাই।"

তখনই ড্রইংরুম থেমে বেরিয়ে এলেন আহাদ সাহেব। সঙ্গে সেই ছেলেটা।

"ফাহাদ সাহেব, অক্ষর সাহেব...লাশ কোথায় দাফন করা হবে?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"আজিমপুর গোরস্থানে সম্ভবত," বলল ফাহাদ।

"এটা আমার ছেলে, ইরফান, স্কুলে পড়ে।"

"ওহ, ওকে দেখেছি, তবে আপনার ছেলে সেটা জানতাম না," বলল অক্ষর।

অক্ষর আর ফাহাদের সঙ্গে করমর্দন করল ইরফান।

"এলাকাতে একটু কম বের হয় আর কী। কটাই বা বন্ধু ওর এখানে? যে কটা ছেলে আছে সব ছোটো। যাইহোক ভদ্রমহিলা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। ভালো মানুষ বেশিদিন বাঁচে না," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আহাদ সাহেব।

"সেটাই," মুখ ঘুরিয়ে বলল ফাহাদ।

***

"কবর মনে হয় আজিমপুরে দেওয়া হবে, অক্ষর তো তাই বলল," মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রেখে বলল ঐশী।

"হুম, এই সাহানা আন্টির সঙ্গে কালই কথা হল আর আজ তিনি।" মুনের চোখে কেমন যেন শূন্য দৃষ্টি।

"আপু, ভেঙে পড়বেন না এভাবে। একদিন তো সবাইকে মরতেই হবে। চা খাবেন? আপনার চোখদুটো লাল হয়ে আছে!"

"খাওয়া যায়।"

"পাঁচ মিনিট," রান্নাঘরে চলে গেল ঐশী।

চুপচাপ বসে রইল মুন। সাহানার হাসিমুখটা যেন এখনও ভাসতে ওর চোখের সামনে।

মোবাইলটা বেজে উঠল ওর। সম্ভবত ফাহাদ ফোন দিয়েছে।

না, ফাহাদ না! মোবাইলের স্ক্রিনে নম্বরটা দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল মুনের।

"হ্যালো," ফোনটা ধরল ও।

"মওলানা আসগর খান বলছিলাম। আমি কদিন ঢাকার বাইরে ছিলাম। আপনার এই নম্বর থেকে আমার খোঁজ করা হয়েছে," ওপাশ থেকে বলে উঠল একটা ভরাট কণ্ঠ।

"হ্যাঁ, মওলানা সাহেব। আমিই ফোন দিয়েছিলাম, আমাদের বাড়িতে একটা সমস্যা। মানে আমাদের পুরো ভবনেই!"

"হুম বুঝেছি, ঠিকানা বলুন, আর আজকে কখন আপনি বাসায় থাকবেন?"

"আজ না। আজ একটু সমস্যা আছে।"

"এইসব ব্যাপারে দেরি করা উচিত নয় কিন্তু।"

"আসলে একজন মারা গেছেন আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে।"

"ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। একটা প্রশ্ন করতে পারি, যদি কিছু মনে না করেন?"

"হ্যাঁ করুন।"

"উনার মৃত্যু কি স্বাভাবিক?"

"আপাতদৃষ্টিতে তাই। কিন্তু আমার মনে হয় না মৃত্যুটা স্বাভাবিক।"

"হুম, আপনার কী মনে হয়? যে কারণে আপনি আমাকে ফোন দিয়েছিলেন সেই কারণটাই কি উনার মৃত্যুর জন্য দায়ী?"

"হ্যাঁ! আমি তাই মনে করি।"

"আচ্ছা, যেদিন আসতে হবে সেদিন আমাকে ফোন দেবেন। আর..."

"কী?"

"সাবধানে থাকবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ডাকুন, উনি সহায় থাকলে কোনো খারাপ শক্তিই কিছু করতে পারবে না।"

"অবশ্যই।"

কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে এল ঐশী।

"ঐশী, ওই যে ভদ্রলোক যার কথা বলেছিলাম, বাড়ির সমস্যাটার ব্যাপারে? ঢাকা বাইরে ছিলেন না? উনি ফোন দিয়েছিলেন," একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল মুন।

"ওহ হ্যাঁ হ্যাঁ, কী বললেন উনি?"

"উনি এসেছেন। ভাবছি পরশু বা তার পরের দিন উনাকে ডাকব।"

"আপু.. এখন আবার এসব নিয়ে ঘাঁটাবেন? আর তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তারপরেও.."

"ঐশী.. সাহানা আন্টি মারা গেছেন। উনার মুখটা দেখেছ? কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন উনি। আর তুমি বলছ সমস্যা নেই?"

"আপু, আপনি কী ভাবছেন। ওই কারণে আন্টি মারা গেছেন?"

"ভাবছি না, আমি এটাই বিশ্বাস করি।"

***

"বুঝলে অক্ষর, টাকা! সবই আফতাব আঙ্কেল আর সাহানা আন্টির ব্যাংকে জমা থাকা টাকাগুলো, এগুলোর জন্যই আঙ্কেলের ভাইরা উনাকে কাছে নিয়ে রাখতে চাচ্ছে। নিঃসন্তান, এখন একটু ভুং-ভাং বুঝিয়ে যদি টাকাগুলো হাতানো যায়," সিগারেটটা ধরিয়ে বলল ফাহাদ।

"হুম, টাকা বড়োই অদ্ভুত জিনিস ভাই। সাহানা আন্টির আত্মীয়দের মধ্যেও তো ব্যাপারটা থাকতে পারে," অক্ষরের হাতেও সিগারেট।

"তা পারে, কিন্তু ওরা এখনও কিছু প্রকাশ করছে না আর কী, ভালো করেছেন দুজন.. এই মানুষগুলো থেকে দূরত্ব রেখে।"

সুলতানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পাড়াটা আজকে অন্যদিনের চেয়ে জমজমাট লাগছে। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে অনেকেই অর্কিড ভিলাতে ঢুকছে সাহানার মৃতদেহ দেখতে। তাই হয়তো এমন মনে হচ্ছে।

গেটে বাবুলকে দেখা যাচ্ছে। হাবিব মিয়ার কোনো পাত্তা নেই।

"ফাহাদ ভাই, একটা জিনিস খেয়াল করেছেন?" সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল অক্ষর।

"কী ব্যাপার?"

"হাবিব মিয়া আর বাবুলকে কখনও একসঙ্গে দেখা যায় না!"

"তো?"

"কিছু না, এমনিতেই বললাম।"

ঠিক তখনই সুলতানের দোকানের সামনে একটা মোটর সাইকেল থামলো। আরোহীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অক্ষর। ওদের বাড়িওয়ালা আনোয়ার সাহেব! ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

"আপনারা এখানে? আমি কিছুক্ষণ আগেই শুনলাম। হাবিব মিয়া আমাকে ফোন করেছিল। খুব খারাপ লাগছে! ভদ্রমহিলা কদিন আগেই আমার কাছে এসেছিলেন।" কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব আনোয়ার সাহেবের মধ্যে।

"সমস্যা নেই আঙ্কেল, চলুন, ভেতরে চলুন," এগিয়ে এল অক্ষর।

"আপনাদের দুজনের সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা আছে, প্লিজ একটু সাইডে আসুন।"

"কী কথা?"

"আসুন তো।"

দোকান থেকে একটু সামনে এগিয়ে গেল ওরা।

"দেখুন, যেসব কথা আমাকে উনি বলেছিলেন। মানে, ওইসব অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার। আমি জানি এগুলো নিয়ে আপনারা চিন্তাতে, কিন্তু এসব কাউকে বলবে না। আপনারা বাড়ি ছেড়ে দিন, দরকার হলে, অ্যাডভান্স টাকা আমি ফিরিয়ে দেব, কিন্তু আমি চাই না বাড়িটার কোনো বদনাম রটুক," ফাহাদের হাত ধরলেন আনোয়ার সাহেব।

"দেখুন আঙ্কেল, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলেই বাড়ি নিয়েছি, আর আমাদের কোথায় যাওয়ারও ইচ্ছা নেই। আর ইনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। আপনি কি মনে করেন এর পেছনে কোনো ভৌতিক ক্রিয়া আছে?" ঠান্ডা গলাতে বলল ফাহাদ।

"না, কিন্তু কথা ছড়াতে কতক্ষণ?"

"আমরা কেউই এগুলো সিরিয়াসলি নিইনি, আন্টি হয়তো নিয়েছিলেন। আর আমরা কেউই বাড়ি ছাড়ছি না, কী বল অক্ষর?"

"হুম," আনমনে বলল অক্ষর।

"হুম কী? আমার সঙ্গে একমত না তুমি?"

"উমম হ্যাঁ, একমত ভাই।"

"শাবাশ, চলুন ভেতরে চলুন," আনোয়ার সাহেবকে বলল ফাহাদ।

অর্কিড ভিলার দিকে যেতে লাগল ওরা তিনজন।

***

রাত পৌনে আটটার মতো বাজে। পুরো অর্কিড ভিলাতে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

শোবার ঘরের বিছানাতে বসে ল্যাপটপে কাজ করছে মুন।

হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকল ফাহাদ। মাত্রই আজিমপুর থেকে এসেছে সে আর অক্ষর। সাহানার দাফন সম্পন্ন হয়েছে, আফতাবকেও নিয়ে গেছে তাঁর ভাইয়েরা। মুন আর ঐশী বাড়িতেই ছিল।

"টেবিলে খাবার রাখা আছে, খেয়ে নিও," বলল মুন।

"রান্না করেছ? কী দরকার ছিল? বাইরে খেতাম দুজন।"

"সারাদিন কিছু রান্না করিনি, রাতে তো করতেই হত, খেয়ে নাও গিয়ে।"

"চলো তবে একসঙ্গে খাই, আসলেই বেশ খিদে পেয়েছে।"

"নাহ, দুপুরে ঐশীদের বাড়িতে একটু খেয়েছি, আর ইচ্ছা করছে না।"

এগিয়ে এসে মুনের কাঁধে হাত রাখল ফাহাদ, "মুন! তুমি এত কেন ভেঙে পড়ছ? মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।"

"আমি ভেঙে পড়িনি ফাহাদ," ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে মুখ না তুলেই বলল মুন, "ওই মওলানা সাহেব ঢাকা এসেছেন, পরশু বা তারপরে একদিন উনাকে ডাকছি।"

"মুন প্লিজ," আঁতকে উঠল ফাহাদ, "এই বাড়িতে একজন মারা গেছে!"

"সেজন্যই উনার আসাটা প্রয়োজন।"

"তার মানে তুমি আসলেই মনে করছ।"

"হ্যাঁ আমি সেটাই মনে করি।"

"মুন, ফর গডস সেক।"

"ফাহাদ, এসব নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো।"

চুপ মেরে গেল ফাহাদ।

"অফিস থেকে ছুটি নাও নাকি কদিন?" কিছুক্ষণ পর আবার বলে উঠল সে, "তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। কাল অফিসে যেও না।"

"নাহ, যেতে হবে। সাত দিনের ছুটি পাওনা ছিল, এ-বাড়িতে আসার আগে তিন দিনের ছুটি নিয়েছিলাম। বাকি চারদিনের ছুটি এখন চাইলে ঝামেলা হবে। দেখি কী করা যায়!"

"সামনের সপ্তাহে সাহানা আন্টির মিলাদ, উনার ভাইয়ের বাড়িতে। ভদ্রলোক ধানমন্ডিতে থাকেন। আমাদের যেতে বললেন। যাবে?"

"দেখা যাক।"

"আমাদের বাড়িতেও একটা মিলাদ দেওয়া প্রয়োজন।"

"দেখা যাক।"

খাবার টেবিলের দিকে পা বাড়াল অক্ষর। এখন মুনের সঙ্গে কথা বলা আর একটা দেয়ালের সঙ্গে কথা বলা একই ব্যাপার।

***

তিন দিন পর...

অফিস থেকে বের হয়ে ঘড়ি দেখল মুন। দুপুর একটা পঞ্চান্ন বাজে।

মোবাইল থেকে মওলানা আসগরের নম্বরটা বের করে ডায়াল করল সে।

"হ্যালো," দুবার রিং হবার ফোনটা ধরলেন আসগর।

"আমি ওই যে..."

"চিনতে পেরেছি, বলুন।"

"আজ আসতে পারবেন আমাদের বাড়িতে?"

"সমস্যা নেই, আপনি ঠিকানাটা আমাকে মেসেজ করে দিন, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভবত আসছি।"

"ইয়ে মানে, সন্ধ্যার আগে আসলে একটু ভালো হয়।"

"তাই আসব।"

অর্কিড ভিলার ঠিকানাটা মেসেজ করে দিয়ে মেসেঞ্জারে ঐশীকে নক দিল মুন।

"ঐশী, কোথায়?"

"একটু বাইরে মায়ের সঙ্গে এসেছি। উনার এক বোন অসুস্থ, হাসপাতালে আর কী।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল ঐশী।

"ওহ, কেমন আছেন উনি?"

"বেশি ভালো না আপু।"

"অক্ষরও তোমাদের সঙ্গে?"

"নাহ, ও অফিসে, ওখান থেকে এখানে আসবে। কোনো সমস্যা হয়েছে আপু?"

"ওই যে একজনের কথা বলেছিলাম না? উনি আজ আসবেন। তোমার বাড়িতে

যদি একটু যাওয়ার দরকার হতো।"

"ওহ, এখনই আসবেন?"

"নাহ, দেরি আছে।"

"হুম, দেখা যাক, অবস্থা ভালো হলে আমরা আসছি। কিন্তু ভালো না হলে..."

"হুম, আচ্ছা দেখো কী হয়।"

***

কিছু মানুষকে দেখলে কোনো কারণ ছাড়াই মনে শ্রদ্ধা এসে যায়। মওলানা আসগরকে দেখেও ঠিক তেমনটাই মনে হয়েছে মুনের।

ভদ্রলোকের বয়স ষাট-সত্তরের ঘরে হবে, মুখে চাপ দাড়ি, উচ্চতা মাঝারি আর গায়ের রং শ্যামলা।

অর্কিড ভিলাতে ঢোকার পর থেকেই মুখটা কেমন গম্ভীর করে আছেন তিনি।

মোবাইলে সময় দেখল মুন, বেলা তিনটা। আসগর সাহেব তাড়াতাড়ি এসে যাওয়াতে খুশিই হয়েছে সে। সন্ধ্যা হলেই ফাহাদ এসে যাবে আর ইনার সম্মুখে পড়লে নানান প্রশ্ন করে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করত সে, এই একটা কাজ করাতে ওর জুড়ি নেই।

"মা, আপনাদের এই বাড়িটাতে একটা খারাপ কিছু আছে, তবে এখানকার হাওয়া আর মাটিতে আমি তার কোন চিহ্নই পাচ্ছি না, দেখি কী করা যায়," আসগর সাহেবের কণ্ঠে উদ্বেগ।

"একটু দেখুন, আমার খুবই ভয় লাগছে। আচ্ছা, কোনো খারাপ জিনের ব্যাপার কি?"

"আসলে জিন তো বেশ কয়েক প্রকার আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিনদের সৃষ্টি করেছেন উত্তপ্ত আগুনের ধোঁয়া থেকে। নাস নাস, ফালিস আর ঘুল এই তিন ধরনের জিনের সঙ্গেই মানুষের বেশি দেখা হয়। এরা খুবই নিম্নস্তরের জিন। নাস নাস আর ফালিস একটু-আধটু ভয় দেখায়। বাড়িঘরে মূলত এদেরই হালকা প্রভাব থাকে। ঘুল ভয় দেখায় না সাধারণত। এদের প্রচণ্ড লোভ বেওয়ারিশ মৃতদেহের প্রতি, সেটা খেতে গিয়ে মাঝে মাঝে মানুষের সামনে পড়ে যায়। তবে এই বাড়িতে যে জিনিসটা আছে, তাকে আমার মোটামুটি বুদ্ধিসম্পন্ন মনে হচ্ছে। মানে অনুভব করা যায় ব্যাপারটা। যদিও আমি বুঝতে পারছি না, জিনিসটা কী! তারপরেও! আর আপনি যেসব ঘটনা বললেন তা শুনেও বোঝা যাচ্ছে এর বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে।"

"তার মানে আপনি বলছেন ওটা জিন না?"

"আসলে এভাবে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না এখনই। আর একটু দেখতে হবে। সাধারণত ইফ্রিত আর মারিদ জিনেরা মোটামুটি বুদ্ধিমান হয়। তবে এরা মানুষের কাছে খুবই কম আসে, হ্যাঁ, এরা মানুষের ওপর ভর করতে পারে। তবে সেটাও বিশেষ কারণে, যেমন ধরুন মানুষ নিজের অজান্তেই তাদের কোনো ক্ষতি করলে বা কোনো মানুষকে পছন্দ করলে। আর একটা কারণ রয়েছে। কালো জাদুর মাধ্যমেও এদের মানুষের পিছে লাগানো যায়। তবে কোনো বাড়ির ওপরে এরা প্রভাব বিস্তার করে না। আচ্ছা, এই ভবনের কোনো ফ্ল্যাটে ঢোকা যাবে?"

"আমাদের ফ্ল্যাটে যাবে, বাকিগুলো তো বন্ধ।"

"একটা ফ্ল্যাটে গেলেই হবে, ওটার প্রভাব গোটা বাড়িতেই রয়েছে, কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে সেটা বুঝতে হবে। একটা ফ্ল্যাট পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।"

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল মুন।

ভেতরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন আসগর। মুখটা থমথমে হয়ে গেল তাঁর।

"কোনো সমস্যা?" ভয়ে ভয়ে বলল মুন।

"এই জিনিসটা জিন না। এমনকি আমার পরিচিত কোনো জিনিসের সঙ্গেই আমি এর মিল পাচ্ছি না। এই বাড়ি আর বাড়ির জায়গাটার ওপর এর প্রভাব। কিন্তু এটা আসলে কী না বুঝতে পারলে কিছু করা খুবই কঠিন... প্রায় অসম্ভব..." বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

ধীরে ধীরে এদিক-সেদিক দেখলেন। তারপর ডাইনিং-এ এসে দাঁড়ালেন।

"কী মনে হয়?" বলল মুন।

"তিনতলাতে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বললেন না? উনার মতোই অবস্থা অনেকটা আমার। আমিও বুঝতে পারছি না জিনিসটা কী। জিন নয়, অতৃপ্ত কোনো আত্মাও নয়। কারণ অতৃপ্ত আত্মা খুব কম সময়ের জন্য পৃথিবীর বুকে থাকতে পারে আর ওরা এত বড়ো একটা বাড়ির ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে না। কোনো বিশেষ ধরনের কালো জাদুর অস্তিত্বও টের পাচ্ছি না। কিন্তু কিছু একটা আছে।"

"কিছুই কি করা যাবে না?"

"আপনাদের এই বাড়িটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো হবে। আমার মনে হয় না এই জিনিসটাকে এখান থেকে তাড়ানো যাবে। তবে একটা ছোট্ট ব্যবস্থা করে যেতে পারি আমি। যতদিন আপনারা এই বাড়িতে থাকবেন ততদিনের একটা সেফটি আর কী।"

"কী?"

"আপনার ফ্ল্যাটের একটা ঘর বন্ধ করে দিতে পারি। এর ফলে কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তাই আর সেই ঘরে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও আছে। যে-কারণে সম্ভবত সেই তান্ত্রিক ভদ্রলোক কাজটা করেননি।"

"কী খারাপ দিক?"

"আমাদের অজান্তেই নানান অতিপ্রাকৃত সত্তা আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করে। এরা আমাদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। এদের মধ্যে যেমন খারাপ প্রাণী রয়েছে, ঠিক তেমনি কিছু ভালো প্রাণীও রয়েছে। মনে করুন, আপনি আপনার কোন বন্ধুর সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে চান, খুব করে চান। কিন্তু হঠাৎ করে আপনার কী মনে হল, আপনি গেলেন না। পরে হয়তো আপনি জানতে পারলেন যে ওখানে গেলে আপনার কোনো ক্ষতি হত কিংবা জানতেও পারলেন না। মোট কথা হল, ক্ষতি হত আর কী। এইক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে অতিপ্রাকৃত কোনো ভালো সত্তা আপনার মনের ওপর প্রভাব ফেলে আপনাকে ওই জায়গাতে যেতে দেয়নি। আর খারাপরা কী করে সেটা তো বলার দরকার দেখি না। আপনি তো দেখলেনই এই কদিনে। তো ঘর বন্ধ করে দিলে সেই ভালো সত্তাগুলোও আর প্রবেশ করবে না। কিন্তু এখন এই রিস্কটা নিতেই হবে। আমাকে কিছু কাগজ

কলম দিন।”

কাগজ আর কলম এনে দিল মুন। তারপর বলল, “তিলতলার ওরা...”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ ওদের জন্যও ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি, আপনি এই ঘরে ঢুকবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বের না হচ্ছি,” এই বলে বসার ঘরে ঢুকে গেলেন আসগর।

দশ মিনিট পর বেরিয়ে এলেন তিনি। মুনের হাতে দুটো ছোট্ট কাগজ তিনি, কাগজে কী যেন লেখা রয়েছে।

“এই দুটো কাগজ সুতো দিয়ে বেঁধে, সেই ঘরের দরজাতে বেঁধে দেবেন। যতদূর বুঝলাম এখানকার সেই জিনিসটার ক্ষমতা রাতের বেলা বেশি থাকে। রাতের বেলা ওই ঘর থেকে কম বের হবে। একটা আপনার জন্য আর একটা উনাদের জন্য।”

“আচ্ছা, ওটাকে কি তাড়ানো যেত না? কোনভাবেই?” আকুতি ঝরে পড়ল মুনের কণ্ঠে।

“আপনি যদি ক্যানসার রোগীকে যক্ষ্মার চিকিৎসার করেন তবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? ঠিক তেমনিই ওটা আসলে কী না জেনেই ওটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হবে অতি ভয়াবহ একটা ব্যাপার। আর এতে করে প্রাণও যেতে পারে। আমার কথা শুনুন.. রাতে ওই ঘরটা থেকে কম বের হবেন। যত দ্রুত সম্ভব বাড়িটা ছেড়ে দিন।”

“হুম তাই করতে হবে।” থেমে গেল মুন, তারপর বলল, “আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়, যে আন্টি মারা গেছেন তার মৃত্যুর জন্য ওই জিনিসটা দায়ী?”

“সম্ভবত।”

“হায় আল্লাহ!”

“আল্লাহকে ডাকুন, বিপদ থেকে মুক্তি শুধু উনিই দিতে পারেন। আমি তবে যাই এখন।”

***

“হ্যাঁ, বলেন মুনআপু,” ফোনটা ধরল অক্ষর।

“অক্ষর তুমি এখন কোথায়?”

“এইতো ক্লিনিকে এলাম।”

“ওহ, রোগীর অবস্থা কেমন?”

“বেশি ভালো না, ঐশী বলল যে আপনি যার কথা বলেছিলেন উনি আজ আসবেন। এসেছিলেন কি?”

“হ্যাঁ।”

“কী বললেন?”

“তোমার ওই দাদা যা বলেছিলেন অনেকটা তেমনই। বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে।”

“হুম,” কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অক্ষর, “আর কোনো উপায় নেই?”

“নাহ, তবে ছোট্ট একটা ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি। এসো তুমি তারপর তোমাকে বলছি।”

“আপু আজ মনে হয় আমাদের বাড়িতে আসা হবে না। রোগীর সঙ্গে শুধু

উনার ছেলে... সেও ঢাকা ভালোমতো চেনে না।"

"বুঝতে পেরেছি! সমস্যা নেই, তোমরা আসলেই কথা হবে। ভালো থেকো, খেয়াল রেখো রুগির।"

"আপনারাও ভালো করে থাকবেন আপু।"

মুন জানত না ওই দ্বিতীয় কাগজটা আর কখনোই অক্ষরকে দেওয়া হবে না ওর। প্রয়োজনই হবে না।

প্রায় ফাঁকা অর্কিড ভিলাতে আজ রাতে আর একটা খারাপ ঘটনা ঘটবে!

***

"তা এইটার জন্য কত নিল বুড়োটা?" দরজাতে ঝোলানো কাগজটার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল ফাহাদ।

"উনি টাকা নেন না," মুনের গলা শান্ত।

"বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেছে, আমি কিন্তু পারব না, নিজে বাড়ি খোঁজো আর শোনো বাড়িওয়ালার কাছ থেকে অ্যাডভান্সের টাকাটাও কিন্তু তুমিই চাইতে যাবে হুঁহ।"

"এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।"

"গড! মুন তুমি আসলেই এই বাড়ি ছেড়ে যেতে চাও? ভূতের ভয়ে? সিরিয়াসলি? এই যুগে!"

"পারলে রাতে ঘর থেকে কম বের হয়ো, আর আমি বিকালেই রান্না করে নিয়েছি। রাতের খাবার আমরা এই ঘরেই খাব।"

"হোয়াট! এই ঘরে খাওয়া। গ্রামের মতো বিছানাতে!"

কোনো উত্তর না দিয়ে ল্যাপটপে টাইপ করতে লাগল মুন।

আরও কিছু কথা বলে উত্তর না পেয়ে চুপচাপ বসে রইল ফাহাদ। সে বুঝতে পেরেছে যে মুন এই বাড়িতে থাকবে না, প্রচণ্ড জেদি মেয়েটা। যা ভাবে তাই করে।

রাতের খাওয়া শেষে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে একমনে সিগারেট টানছে ফাহাদ। খুব বিরক্ত লাগছে ওর। সারাটাজীবন মুনের জেদের কাছে পরাজিত হয়েছে সে। কে নাকি ভূত দেখল, একজন মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু হল তারপর কে না কে এসে কী নাকি বলল; এখন বাড়ি ছাড়তে হবে?

সিগারেটটাও ঘরের মধ্যে টানার উপায় নেই। মুনের চোখ দেখতে হবে।

গেটের দিকে নজর পড়ল ওর। কেউ নেই! গোটা বাড়ির তিনটা ফ্ল্যাট আজ ফাঁকা, শুধু সে আর মুন আছে। এমন সময়ে হাবিব মিয়া কোথায়? আর কোথায়ই বা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বাবুল? কোনো চোর বা ডাকাত যদি ঢুকে পড়ে?

মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল ওর।

"আমি একটু নীচ থেকে আসছি," ঘরে ঢুকে মুনকে বলল ফাহাদ।

"নামতেই হবে? বললাম না সমস্যা?"

"গেটে কেউ নেই.. হাবিব মিয়া কি ফাজলামি পেয়েছে নাকি? আজ এমনিই বাড়িতে কেউ নেই," বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ফাহাদ।

নীচের পরিবেশ একদম নির্জন। রাস্তাতে মানুষজন একদমই নেই। বেশ খানিকটা দূরে একটা কুকুর শুয়ে আছে, সুলতানের দোকানের আলোটা দেখা

যাচ্ছে।

হাবিব মিয়া কিংবা বাবুলের কোন পাত্তা নেই।

ওদের ঘরটার দিকে নজর পড়ল ফাহাদের, দরজাটা কিছুটা খোলা। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ও ঘরে বেশ কম পাওয়ারের এনার্জি বাল্‌ব জ্বলছে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝলক এসে স্পর্শ করল ফাহাদের শরীর। যেন ঘরের ভেতরটা খুব বেশিই ঠান্ডা।

দরজার ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে তাকাল ফাহাদ আর তারপরেই ভয়ের একটা হীমশীতল স্রোত বয়ে গেল ওর পুরো শরীরে।

ঘরের ভেতরের বিছানাটাতে চোখ বন্ধ করে যে শুয়ে আছে তার শরীররটা বাবুলের কিন্তু মাথাটা হাবিব মিয়ার! কেমন যেন একটা গলগলে ধোঁয়া বের হচ্ছে মাথাটা থেকে আর ওটা ক্রমে ক্রমে পরিণত হচ্ছে বাবুলের মাথাতে!

আতঙ্কে যেন একদম পাথর হয়ে গেল ফাহাদ।

***

কীভাবে যে সে দোতলাতে উঠল তা সম্ভবত ফাহাদ নিজেও জানে না। কোনোমতে দরজাটা লাগাল সে।

তবে সবাই ঠিকই বলছিল? বাড়িটা আসলেই ভালো না! হাবিব মিয়া আর বাবুলের রূপ ধরেই এই বাড়িতে থাকে পিশাচটা! আর এজন্যই কখনও ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায় না।

এই পিশাচটাই তবে ওর, ঐশীর আর আফতাব সাহেবের রূপ ধরেছিল!

এই পিশাচটাই তবে ছোটো বাচ্চার রূপ ধরে আফতাবকে ভয় দেখাত? এই কি সাহানার মৃত্যুর জন্য দায়ী?

এখন কী করবে ফাহাদ? বন্ধ দরজা তো ওই পিশাচকে আটকাতে পারবে না। মুনকে গিয়ে সব খুলে বলবে? কিন্তু মুন যদি অনেক বেশি ভয় পায়? না না মুনকে এখনই সব বলা যাবে না।

এখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে ওরা দুজন? কিন্তু অনেক রাত হয়েছে। এত রাতে কোথায় যাবে ওরা? আহাদ সাহেবকে ফোন দিলে কেমন হয়? কিন্তু উনিই কি বিশ্বাস করবেন? আর বাড়ি থেকে বের হলে যদি পিশাচটা পিছু নেয়?

তার চাইতে মুনের কথামতো শোবার ঘরে বসে থাকাই ভালো হবে। এসব তাবিজ-কবচে তো বিশ্বাস করে না ও। কিন্তু একটু আগে নীচে যা দেখল তাতেই কি বিশ্বাস করত আগে? পৃথিবীতে অনেক কিছুই হতে পারে, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না।

মুখটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে ঘরে ঢুকল ফাহাদ।

"হাবিব মিয়াকে পেলে?" জিজ্ঞাসা করল মুন, মশারি দিচ্ছে ও।

"হ্যাঁ। শোনো মুন, কাল থেকেই নতুন বাড়ি দেখা শুরু করে দাও।"

"ফাহাদ!" অবাক হয়ে গেল মুন, তারপর ফাহাদের চোখে চোখ রেখে বলল, "তুমি কি কিছু দেখেছো?"

"আরে না না কী দেখব!"

"বাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে রাজি হয়ে গেলে।"

"আসলে তোমরা সবাই ছাড়তে চাচ্ছ তাই আর কী।"

"ফাহাদ, কিছু দেখলে আমাকে বলো, লুকিও না।"

"আরে না! কী দেখব?" বিছানাতে শুয়ে পড়ল ফাহাদ।

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মুন।

***

রাত গভীর হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা স্পর্শ করেছে তিনটাতে।

কথিত আছে রাত তিনটার সময়ে নাকি জগতের সব খল অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলো নিজেদের ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে যায়। সেটাকেই সত্য প্রমাণ করতে যেন ফাহাদদের বাথরুমের সোপকেসে রাখা সাবানটা আপনা-আপনিই নড়ে উঠল।

উপরে উঠে গেল সেটা, তারপর বাতাসে ভাসতে লাগল। যেন অদৃশ্য কেউ সেটা হাতে নিয়ে আছে!

বিছানাতে উঠে বসল ফাহাদ। খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখছিল সে। একটা বড়ো প্রাসাদ, সেখানে কজন মুণ্ডুহীন মানুষ... উফফ, ভয়াবহ।

জানালার দিকে তাকাল ও, আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। মানে কিছুক্ষণ পরেই ভোর।

স্বভাববশতই বাথরুমে যাওয়ার জন্য বিছানা থেকে উঠল ফাহাদ। তখনই দরজাতে ঝোলানো সেই কাগজটা নজরে পড়ল ওর। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল গত রাতে দেখা সেই পৈশাচিক রূপান্তর।

'ধুপ ধুপ ধুপ' একটা অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল ডাইনিং-এ। সেখানকার লাইট বন্ধ, তারপরেও ঘর থেকে ফাহাদের মনে হতে লাগল যেন কিছু একটা দৌড়ে বেড়াচ্ছে পুরো ডাইনিং জুড়ে আর বারবার ওদের ঘরের দরজার সামনে এসে ফিরে যাচ্ছে!

তবে কি সেই পিশাচটা?

মুনকে ডাকবে ও? নাহ, মুন ভয় পাবে। একদম সকালে উঠে মুনকে সব খুলে বলবে সে।

দৌড়াদৌড়ির শব্দটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। গিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে ফাহাদের।

কিন্তু বাইরে বের হওয়াটা কি ঠিক হবে?

আচ্ছা এসব ওর মনের ভুল নয়তো? সত্যিই কি ডাইনিং-এ কেউ দৌড়াচ্ছে?

মানসিক চাপ খুব খারাপ জিনিস। এটাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। ফাহাদেরও তাই হল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সেই শব্দ।

লাইট জ্বালাল ফাহাদ। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই।

মনের ভুল তবে? আচ্ছা সন্ধ্যাবেলাতে কি সত্যিই হাবিব মিয়ার ঘরে কিছু দেখেছিল ও? নাকি সেটাও মনের ভুল।

ভাবতে ভাবতেই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে, মাটির দিকে তাকালেই দেখতে পেত যে টয়লেটের সাবানটা-আপনা-আপনিই ওর পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রায় ছুটতে ছুটতে নর্থ অ্যান্ড ক্লিনিকে প্রবেশ করল অক্ষর আর ঐশী। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকা আহাদ সাহেবকে নজরে পড়ল অক্ষরের।

"আহাদ সাহেব," ডেকে উঠল সে।

"চলে আসুন," ইশারা করলেন আহাদ সাহেব।

"কী অবস্থা এখন?" বিচলিত কণ্ঠে বলল অক্ষর।

"চলুন গিয়েই দেখবেন, আরও কিছু রিপোর্ট আসা বাকি।"

"মুন আপু কই?" জিজ্ঞাসা করল ঐশী।

"উনি কিছু ফর্ম পূরণ করতে গেছেন। আমি আমার জীবনে এত শক্ত মহিলা আগে দেখিনি। ভদ্রমহিলা শুরুর দিকে খুব কাঁদছিলেন কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ভোরবেলা নামাজ পড়ে আমি একটু বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম। সকাল সকাল হাঁটা অভ্যাস আমার। তখনই দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে উনি ছুটে আসছেন... এই হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার আমার পরিচিত, তাই এখানেই নিয়ে এলাম।"

"আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আহাদ সাহেব," বলল অক্ষর, "আমরা কাল বাসায় ছিলাম না আর কালই...মুন আপু এই বিপদের সময়ে আমাদের পেলেন না।"

"চলুন," বলে ইশারাতে লিফটটা দেখালেন আহাদ সাহেব।

লিফটে উঠে গেল ওরা। গন্তব্য পাঁচতলা, ওখানেই আই.সি.ইউ। আহাদ সাহেবই ফোন দিয়েছিলেন অক্ষর আর ঐশীকে।

লিফট পৌঁছলো পাঁচতলাতে।

আই.সি.ইউ-এর সামনের বেঞ্চিটাতে বসে আছে ইরফান।

"মুন আপু কই?" বলে উঠল ঐশী।

"আন্টির আসতে একটু সময় লাগবে," বলল ইরফান।

"এদিকে আসুন," কাচের জানালাটার দিকে ওদের ডাকলেন আহাদ সাহেব।

ভেতরে ফাহাদকে দেখা যাচ্ছে।

আই.সি.ইউ! এক অদ্ভুত জগৎ, যেন কোনো এক অজানা মৃত্যুপুরীতে শুয়ে আছে ফাহাদ। কিছু বিদঘুটে যন্ত্র থেকে সাপের মতো কিলবিলে কিছু তার বের হয়ে লেগে আছে ওর শরীরে আর মুখে।

"উনি কোমাতে, মাথাতে খুব বাজে ভাবে আঘাত লেগেছে। সম্ভবত প্রচুর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়েছে," বললেন আহাদ সাহেব।

"ফাহাদ ভাই!" দু ফোঁটা পানি অজান্তেই বেরিয়ে এল অক্ষরের চোখ থেকে। ঐশীও কাঁদছিল।

তখনই একজন ডাক্তারের করিডোর দিয়ে মুনকে আসতে দেখা গেল।

"মুন আপু," চিৎকার দৌড়ে গিয়ে মুনকে জাপটে ধরল ঐশী। কিছুক্ষণ ঐশীর দিকে তাকিয়ে থেকে মুনও কাঁদতে শুরু করল।

"দেখুন এখানে কান্নাকাটি করবেন না," বলে ফাহাদকে দেখতে ঢুকে গেলেন ডাক্তার।

মুনকে নিয়ে বেঞ্চে বসল ঐশী। অক্ষর আর আহাদ সাহেব দাঁড়িয়ে রইল।

পাঁচ-সাত মিনিট পর বেরিয়ে এলেন ডাক্তার।

"ডক্টর, ওর কী অবস্থা?" উঠে দাঁড়াল মুন।

"যেমন ছিল তেমনই, এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না, দেখা যাক কী হয়," চলে গেলেন ডাক্তার।

"আপু, এসব কী করে হল?" জিজ্ঞাসা করল অক্ষর।

"ভোরের দিকে একটা বিকট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি পাশে অক্ষর নেই, তাড়াতাড়ি করে ডাইনিং-এ এসে দেখি অক্ষর চিৎ হয়ে পড়ে আছে! ওআ মাথার দিকটায়... রক্ত... কতবার ওকে মানা করেছিলাম ঘর থেকে বের হতে!" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মুন।

"কিন্তু উনি পড়ে গেলেন কী করে?"

"ওর শরীর থেকে কিছু দূরে আমি বাথরুমের সাবানটা দেখেছি। সম্ভবত ওটার ওপর পা পড়েই! কিন্তু ওটা ডাইনিং-এ কী করে এল? যাই হোক, অনেকখানি রক্ত পড়েছিল.. ওর বুকের দিকে তাকালাম, নিশ্বাস চলছে! আমি কাঁদতে কাঁদতে নীচে নেমে যাই হাবিব মিয়াকে ডাকতে। কিন্তু নীচে হাবিব মিয়া বা বাবুল কেউই ছিল না। ওদের ঘরটাও ফাঁকা। বাধ্য হয়ে বাইরে বের হলাম, একা মানুষ কী করে হাসপাতালে নিয়ে যাব? তখনই আহাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা! খুবই ভালো মানুষ, উনিই ফোন করে সব ব্যবস্থা করলেন। আধা ঘণ্টার মধ্যেই এখানে চলে আসতে পেরেছি আমরা।"

"আপু আমরা থাকলে হয়তো আপনাকে এত কষ্ট করতে হত না," মুনের হাত ধরল অক্ষর।

"তোমরাও তো একজন অসুস্থ মানুষের কাছেই ছিলে। দোষ আসলে আমার ভাগ্যের, হুট করেই মুনের মুখটা শক্ত হয়ে এল, "অক্ষর, তুমি আমার সঙ্গে এসো তো, ঐশী এখানেই থাকুক। আহাদ সাহেব কিছু মনে করবেন না, বাড়ির ব্যাপারে কিছু কথা বলতাম!"

"আরে না না, সমস্যা নেই," মাথা নাড়লেন আহাদ সাহেব।

হাঁটতে লাগল অক্ষর আর মুন।

***

"ফাহাদ ভাই কবে নাগাদ ভালো হতে পারেন?" আহাদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল ঐশী।

"আসলে এটা বলা যায় না," হাসলেন আহাদ সাহেব, "আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে কি কোনো সমস্যা আছে?"

"সমস্যা মানে?" চমকে গেল ঐশী, অক্ষর পাশে নেই, কী বলবে বুঝতে পারছিল না ও।

"ফাহাদ সাহেব আমাকে একবার কিছু ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। দোকানদার সুলতানও বলছিল সেদিন যে, আপনারা নাকি এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাতে।"

"আসলে, কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।"

"হুম, বুঝতে পেরেছি। নতুন বাড়িতে...এমন ব্যাপার-স্যাপার!"

"বাবা কী ধরনের সমস্যা? ভূত-প্রেত?" পাশ থেকে বলে উঠল ইরফান। সাহানা মারা যাওয়ার দিনে সে-ও অক্ষর আর ফাহাদের ফিশফিশানি আলোচনা

কিছুটা শুনেছিল।

"বাদ দাও বাবা, এগুলো ছড়ালে বাড়িটার বদনাম হবে।"

***

"তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ফাহাদ ভাই কিছু দেখেছিলেন?" অক্ষরের কপালে চিন্তার রেখা।

ক্লিনিকের পেছনের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

"হ্যাঁ.. নীচ থেকে ওপরে এসে ও বাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে হুট করে কেন রাজি হল? ওর মুখের হাবভাবও কেমন যেন লেগেছিল। আর একটা ব্যাপার চিন্তা করেছ? সাবানটা?"

"হ্যাঁ, ওটা ওখানে কী করে এল?"

"অক্ষর, ওই বাড়িতে আমি আর ফেরত যাচ্ছি না। তোমরাও বাড়িটা ছেড়ে দাও। এটাই উচিত। বাড়িওয়ালাকে একটু কষ্ট করে বলে দাও যে আমাদের অ্যাডভান্সের টাকার দরকার নেই। পারবে না?"

"পারব আপু। আমাদের বহু আগেই কাজটা করা উচিত ছিল। আমার এক কলিগের বাড়িতে দুটো ঘর ফাঁকা আছে। আপাতত ওখানেই ব্যবস্থা করব। কিন্তু ওই বাড়িতে আমি আর যাব না।"

"আর একটা কাজ করো ভাই, বাড়িওয়ালাকে বলে দিও আমাদের ফার্নিচারগুলো আমি পরে কারও সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসব। অ্যাডভান্স টাকা তো নিচ্ছি না, তাই উনার খুব একটা ক্ষতি হবে না। এখন ফাহাদ সুস্থ হয় কিনা কে জানে! সাহানা আন্টির বাড়িতেও যোগাযোগ করো, ওরা আপাতত সব নিয়ে গিয়ে রাখুক। ওদেরকে সব কিছু বলার দরকার নেই, শুধু বলো আমরা আর থাকছি না, আর আফতাব আঙ্কেল তো একা একা থাকতে পারবে না। আফতাব আঙ্কেল যদি ঢাকা ফেরেন তখন উনারাই বাকী সব ঠিক করবেন আর না ফিরলেও ব্যাপারটা উনারা দেখে নিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।"

"আমি আজই উনার সঙ্গে দেখা করব আপু! আর ভয় পাবেন না, ভাই সুস্থ হয়ে যাবেন।"

"আমি লেখাপড়া জানি ফাহাদ, আমি জানি শতকরা কজন মানুষ কোমা থেকে ফেরে," এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল মুনের চেহারাতে। ওই হাসির সামনে খুব অসহায় মনে হতে লাগল অক্ষরের।

***

সেইদিনই আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করল অক্ষর। ভদ্রলোক কিছুটা বিব্রত হলেও আপত্তি করলেন না। সম্ভবত উনি নিজেও বাড়ির অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

বাড়িতে এসে আর হাবিব মিয়া বা বাবুলকে পেল না অক্ষর। ওদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। হাবিব মিয়ার মোবাইলটাও বন্ধ পাওয়া গেল। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ওরা।

তাই বাড়ির প্রধান দরজার চাবি বুঝে নিতে আনোয়ার সাহেবকে নিজেই

আসতে হল। হাবিব মিয়া আর বাবুলের অন্তর্ধান নিয়ে প্রথমে একটু উশখুশ করলেন তিনি। ভাড়াটিয়াদের মূল্যবান কিছু নিয়ে যদি ওরা ভেগে থাকে তবে তো ক্ষতিপূরণ তাঁকেই দিতে হবে।

কিন্তু দেখা গেল তেমন কিছুই না, তিনটি ফ্ল্যাটই বাইরে থেকে তালা মারা ছিল, আর সেই তালাগুলো ঠিক আগের মতোই আছে। এমনকি নীচতলার একটা চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত খোয়া যায়নি, ওদের ঘরটাও যেমন ছিল তেমনই আছে। তখন আর মাথা ঘামালেন না তিনি।

একজন দারোয়ান আর তার তথাকথিত সহকারীকে নিয়ে ভাবার মতো এত সময় আর কোথায়?

সেদিনই দুপুরে এসে সাহানাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেল তাঁর ভাই।

ঐশী আর দেবলীনাকে নিয়ে বিকালের আগেই অর্কিড ভিলা ছেড়ে চলে গেল অক্ষর।

দিন যেতে লাগল। ফাহাদের অবস্থা অপরিবর্তিত রইল।

দিন পনেরো পরে অক্ষর আর কয়েকজন শ্রমিক গোছের লোককে নিয়ে এসে নিজেদের সব ফার্নিচার নিয়ে গেল মুন। সেদিনও আসতে হল আনোয়ার সাহেবকে।

এভাবেই একদমই ফাঁকা হয়ে গেল অর্কিড ভিলা।

দোকানদার সুলতানের মুখে শুনেই হোক কিংবা কয়েকদিনের মধ্যে ওই বাড়িতে দুটো দুর্ঘটনা আর ভাড়াটেদের ছেড়ে যাওয়ার কারণেই হোক, পুরো অঞ্চলে গুজব ছড়িয়ে পড়ল অর্কিড ভিলা নিয়ে।

প্রায় দেড়মাসের মতো ভাড়া না হওয়ার পরে একদিন এসে 'টু-লেট' সাইনবোর্ডটা খুলে নিয়ে গেলেন আনোয়ার সাহেব। সুলতান একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, যে ভাড়া হয়েছে নাকি? তিনি জানালেন, ভাড়া আর দেবেন না। বাড়িটাকে একদম আটতলা করবেন তারপর আবার ভাড়া।

হাবিব মিয়া কিংবা বাবুলকে আর ওই অঞ্চলে দেখাই গেল না!

এভাবেই দুটো মাস কেটে গেল।

সময় খুব অদ্ভুত জিনিস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জিনিসের প্রতিই মানুষের আগ্রহের তারতম্য ঘটে। ঠিক সেভাবেই অর্কিড ভিলা নিয়ে গুজবগুলোতে ভাটা পড়ল।

শুধুমাত্র একজন মানুষ মাঝে মাঝেই এই বাড়িটা নিয়ে ভাবে, ইরফান।

।। ৩ ।।

কিছু রিকশাওয়ালা আছে যাদের সব কিছুতেই ঝামেলা। এদের আপনি যা বলবেন ঠিক তার উলটোটা করতেই এরা পছন্দ করে।

আফ্রিতার ভাগ্যেও আজ তেমনই এক রিকশাওয়ালা জুটেছে।

"আপা, দশটা টাকা বেশি দিয়েন," রিকশা থামিয়ে বলল লোকটা।

আশেপাশে তাকাতে লাগল আফ্রিতা। এই মোড়ের কথাই বলেছিল ইরফান। বেশ জমজমাট একটা জায়গা।

"ও আপা, দশটা টাকা বেশি দিয়েন," আবার বলে উঠল রিকশাওয়ালা।

"ভাড়া না ঠিক করে উঠলাম?" বিরক্ত হল আফ্রিতা।

"আপা এত রোদ, অনেক কষ্ট হইসে।"

"আমি তো আপনাকে শর্টকাটেই আসতে বললাম, আপনিই তো ঘুরলেন!"

"আপা, দশ টাকা বেশি দিলে কিছু হইব না, আপনারা বড়োলোক মানুষ।"

ব্যাগ থেকে টাকা বের করে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল আফ্রিতা। এদের সঙ্গে তর্ক শুরু করলে সারাটা দিন এমনই চলবে। কাজের সময়ে এগুলো ওর ভালো লাগে না।

বিকাল হতে চলেছে।

ইরফান যে গলিটার কথা বলেছিল সেটা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হবে। ইরফানকে ফোন দেবে কি? নাহ, ছেলেটা অতিরিক্ত উৎসাহী, ওকে নিয়ে কাজে গেলে ঝামেলা হতে পারে। আগে নিজে গিয়ে বাড়িটা একটু দেখে তারপর ওকে ডাকা যাবে। ওর বাড়ি তো ওখানেই, আর আফ্রিতার যে ভক্ত, ডাকলেই চলে আসবে।

চোখ বন্ধ করল আফ্রিতা। প্রায় পনেরো সেকেন্ড পর চোখ খুলল সে।

নাহ; আশেপাশে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি নেই।

সম্ভবত ওই বাড়ির অতিপ্রাকৃত শক্তিটা খুব বেশিদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আবার এমনও অনেক জিনিস রয়েছে যারা নিজেদের প্রভাবকে লুকিয়েও রাখতে পারে।

"আফা, ও আফা," পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল।

সেই রিকশাওয়ালা ব্যাটা নাকি? আবার কী করতে এসেছে? বিরক্ত হয়ে ঘুরলো আফ্রিতা।

না, সে নয়। একটা বেশ বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি। মুখে খোচা খোচা দাড়ি। মাথায় একেবারেই চুল নেই লোকটার।

"অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন গো আফা, কাউরে খুঁজতাসেন? নাকি কোথাও যাবেন?" বলল লোকটা।

খুশিই হল আফ্রিতা। এমনিতেই একটু পরে কাউকে সে অর্কিড ভিলার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতই। ইরফানকে যতটা এড়িয়ে কাজ করা যায় ততটাই ভালো।

"অর্কিড, ভিলা, চেনেন?" বলল সে।

"ওই বাড়ি? কেন? ভাড়া নিতে? ওই বাড়ি তো আর ভাড়া হইব না। এমনিও হচ্ছিল না, বাড়িওয়ালা এখন আটতলা করার ধান্দাতে আছে, বইলছে আটতলা করে একবারেই ভাড়া দেবে!"

"ওহ তাই! আমার কপালটাই খারাপ। আচ্ছা, এলাম যখন একটু দেখেই যাই, কী বলেন? ঠিকানাটা দিন," উত্তরটা তৈরিই ছিল আফ্রিতার।

"আসেন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"আরে না আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আমাকে বলেন কোনদিক দিয়ে যেতে হবে। একজন একটা গলির কথা বলেছিল, ওটা দেখিয়ে দিলেই হবে।"

"আরে আসেন তো আফা, ওই এলাকার পিছেই, চলেন।"

লোকটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগল আফ্রিতা।

"কী সমস্যা তোমার? এত সহজ একটা ম্যাথ!" একটা অঙ্ক তিনবারেও ইরফানকে বোঝাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলল আরিফ।

"আসলে ভাইয়া, আসলে... হয়েছে কী," আমতা আমতা করতে লাগল ইরফান।

"দেখো, আজকে শুরু থেকেই তোমাকে অন্যমনস্ক লাগছে, কী হয়েছে? পড়াশোনা করতে ভালো লাগছে না?"

"তা না ভাইয়া, আসলে একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছি তো, তাই আর ম্যাথটা বুঝতে ইচ্ছা হচ্ছে না," হাসল ইরফান।

"তা সেই ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবো, আমি যতক্ষণ আছি সময়টা আমাকে দাও।"

দুই সপ্তাহ ধরে ইরফানকে ম্যাথ পড়াচ্ছে আরিফ। এক-দেড় মাস আগে এলাকার সেই ছাত্রাবাসটাতে এসেছে সে।

আরিফের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। দেখতেও বেশ সুদর্শন সে। উচ্চতা মাঝারি ধরনের, গায়ের রং শ্যামলা। সুলতানের দোকানে আহাদ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় তার আর সেখান থেকেই ইরফানের গৃহশিক্ষক হিসাবে বহাল হওয়া।

"ভাইয়া! আসলে বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং," ফিক করে হাসল ইরফান। বারবার মোবাইলের দিকে তাকাচ্ছে সে।

"আজকালের ছেলেদের কাছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার.. কোনো মেয়ে তো? এর বাইরে আর ভাবো কি তোমরা?"

"ভাইয়া, ব্যাপারটা একটা মেয়েকে নিয়েই, তবে অমন না যেমন আপনি ভাবছেন। একটা আপু, উনি ভূত-প্রেত তাড়াতে পারেন।"

"তাকে নিয়ে তোমার চিন্তা কেন?"

"ওই আপু আজ আসবে আমাদের পাড়াতে। অর্কিড ভিলা আছে না? ওই রাস্তার ওপাশের বাড়িটা।"

"ওই ফাঁকা বাড়িটা, হুম ওটার ভাড়াটিয়ারা নাকি সবাই চলে গেছিল। একজন নাকি মারাও গেছে। শুনেছি সুলতান ভাইয়ের কাছে।"

"ওই বাড়িটা দেখতেই আসছে আপু।"

"কেন?"

"উনাকে আমিই খবরটা দিয়েছি।"

"ভূত তাড়াতে পারেন?"

"হ্যাঁ!"

"শোনো ইরফান, ভূত বলে না কিছুই নেই। এগুলো মানুষের কল্পনা। আর এইসব লোকেরা যারা ভূত তাড়িয়ে বেড়ায় তারা সব জোচ্চোর হয়। এই মেয়েও সম্ভবত তেমনই।"

"আরে কী বলেন! আপু অনেক ফেমাস, দুটো এফএম রেডিওতে উনার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, উনাকে নিয়ে কয়েকটা পত্রিকাতে আর্টিকেলও বের হয়েছে!"

"আহ, বাদ দাও রেডিওগুলো। ভুয়া গল্প ছড়াতে এদের জুড়ি নেই।"

ইরফানের ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ।

"আফ্রিতা আপু!" ফোনটা প্রায় খেয়ে ফেলার ভঙ্গিতে ধরল সে।

***

প্রচণ্ড বিরক্ত আরিফ। ইরফানের সঙ্গে নীচে নামছে ও।

কী একটা উদ্ভট মেয়ে এসেছে, তার জন্য ওর পড়া বাদ দিয়ে দিয়েছে ইরফান। বিষয়টা ওর আত্মসম্মানেও কেমন যেন বাঁধছে।

বেরিয়ে এল ওরা।

অর্কিড ভিলার সামনে একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। ওদের দিকে পেছন ঘুরে সোজা অর্কিড ভিলার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। মেয়েটা বেশ লম্বা, প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। সাধারণত বাঙালি মেয়েরা এত লম্বা হয় না। পরনে একটা জিন্‌সের প্যান্ট আর ফতুয়া, ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুল।

একটু অবাকই হল আরিফ। সে ভেবেছিল জটাধারী কোনো পাগলি টাইপের কাউকে দেখবে।

"ওই তো আফ্রিতা আপু, চলেন ভাইয়া পরিচয় করিয়ে দিই," এগোতে লাগল ইরফান।

মেসে ফিরে যাবার কথাই ভাবছিল আরিফ। কিন্তু আফ্রিতাকে দেখার পর একটা অদ্ভুত কৌতূহল ওকে ঘিরে ধরল। তাই সেও ইরফানের পিছু নিল।

"আফ্রিতা আপু," প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ইরফান।

ঘুরে তাকাল আফ্রিতা। গায়ের রং শ্যামলা ওর, মুখটা লম্বাটে, একটা অদ্ভুত বোকামির ভাব রয়েছে চেহারাতে, চোখে চশমা, সবমিলিয়ে বেশ মায়াকাড়া চেহারা।

এই মেয়ে যে ভূত তাড়াবে সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না আরিফ।

"ইরফান? অবশেষে আমাদের দেখা হল," হাসল আফ্রিতা।

"আই আম রিয়েলি লাকি, আপু, অনারড টু মিট ইউ," গদগদ হয়ে হয়ে গেল ইরফান, "ইনি আরিফ ভাইয়া, আমার ম্যাথ টিউটর! উনার কাছেই পড়ছিলাম।"

"হাই," আবার হাসল আফ্রিতা, "আপনাদের তো ডিসটার্ব করে দিলাম তবে।"

ওর হাসিটা খুবই সুন্দর।

"না না, ভূতপ্রেতের ব্যাপার-স্যাপার শুনলাম, আমার তো বেশ মজাই লাগছে, বিরক্তির কিছু নেই," বলল আরিফ।

"আপনি এসবে বিশ্বাস করেন না, তাই না?" চশমাটা খুলল আফ্রিতা।

"কী করে বুঝলেন?"

"আপনার কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পারলাম," চশমাটার কাচদুটো রুমাল দিয়ে মুছে আবার পড়ল সে, "যাই হোক ইরফান, এটাই তো সেই বাড়ি, তাই না?"

"হ্যাঁ আপু এটাই," এগিয়ে গেল ইরফান।

"হুম.. বাড়িটাতে কিছু একটা আছে, তবে মাটি বা বাতাসে সেটার কোনো চিহ্ন নেই।"

"এখন কী করতে হবে আপু?"

"আসলে বেশিরভাগ পিশাচশক্তি মাটি আর বায়ুতে নিজেদের চিহ্ন রাখলেও কিছু কিছু পিশাচের চিহ্ন পানিতেও থাকে। ওদের উপস্থিতি পানি পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়.."

"জলপিশাচ? স্যরি নেটে এসব নিয়ে ঘাঁটছি খুব।"

"না না, আমার মনে হয় না এখানে কোনো জলপিশাচ আছে, আর জলপিশাচ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওদের জলাভূমি লাগে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বদ্ধ পানি লাগে। তেমন কোনো ব্যাপার এখানে নেই।"

"আপু এখানে আগে নাকি একটা পুকুর ছিল। ভরাট হয়ে গেছে।"

"জলপিশাচ থাকলে শুদ্ধিকরণ ছাড়া পুকুর ভরাট করতেই পারত না। হয়তো ছিল, কিন্তু ভরাট যেহেতু করেছে সেটার একটা ব্যবস্থা করেই করেছে। এখনকার সমস্যার জন্য কোনো জলপিশাচ দায়ী নয়। আর একটা কথা, বেশিরভাগ জলপিশাচের উপস্থিতির চিহ্ন মাটি আর বায়ুতেই পাওয়া যায়। পানি পরীক্ষা করতে চেয়েছি বলেই জলপিশাচ ভেবো না।"

"ওহ,"

"বাপ রে! কত্তরকম কথা, এসব কোথা থেকে জেনেছেন? ভূতেরা এসে বলে গেছে আপনাকে?" ফোড়ন কাটলো আরিফ।

"আচ্ছা ইরফান শোনো, বাড়িতে তো তালা লাগানো। এখন বেশ সকাল, নইলে একটা ব্যবস্থা করা যেত। যাই হোক, বাদ দাও, আসলে এই বাড়ির পানি দেখতে পারলে..." আরিফের কথার কোনো উত্তর দিল না আফ্রিতা।

"আপু এই বাড়ির পিছে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, আর আমার যতদূর মনে পড়ে সেখানেই এই বাড়ির দেয়ালঘেষে একটা ট্যাপকলও আছে। ওটা দিয়ে হবে?"

"হবে না মানে, নিয়ে যেতে পারবে?"

"আসুন আসুন," বলে সোজা হাঁটতে শুরু করল ইরফান।

"আমি কি আসতে পারি, ভূত-প্রেতের ব্যাপার কিনা," বলল আরিফ।

"আসুন," মৃদু হাসল আফ্রিতা।

সুলতানের দোকানের সামনে দোতলা বাড়িটার পাশের চিপাগলিটা দিয়ে ঢুকল ইরফান, তার পিছে পিছে আফ্রিতা আর আরিফ।

খুবই সংকীর্ণ রাস্তা এবং বেশ নোংরা, মাঝেমধ্যেই বাড়িগুলোর পেছনের ড্রেন।

দুই-তিন মিনিট, এভাবে হাঁটার পরে একটা ছোট্ট মাঠের মতো জায়গাতে এসে পৌছল ওরা।

"এই যে এটাই অর্কিড ভিলার পেছন, আর ওইযে কলটা, এখন পানি বের হলেই হয়। মাঝে মাঝেই স্কুলে যাওয়ার সময় এই শর্টকাটটা নেই, সোজা ওই বাড়িটা দেখছেন? ওর পাশের গলিটার পরেই মোড়! এলাকার অনেকেই চেনে না এই রাস্তা," বলল ইরফান।

ভালো করে জায়গাটা দেখল আফ্রিতা। অর্কিড ভিলার পেছনের অল্প একটু ফাঁকা জমি, জমিটার আশেপাশে আরও কয়েকটা ভবনের পেছনদিক। বেশ ঘিঞ্জি একটা পরিবেশ।

আজকাল এইরকম একটু করে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নিয়মই নাকি করা হয়েছে। এতে করে বাড়িগুলোর মধ্যে একটু করে ফাঁক থাকে, ঝুঁকি কমে।

কলটা অর্কিড ভিলার দেয়ালের সঙ্গেই।

কলটার প্যাঁচ খুলতে লাগল আফ্রিতা। বেশ শক্ত হয়ে গেছে, বোঝাই যাচ্ছে, মেলাদিন কেউ কলটা ছাড়েনি।

প্যাঁচ একটু ঢিলা হতেই পানির একটা সরু ধারা বেরিয়ে এল।

হাতের মুঠোর সেই পানি নিল আফ্রিতা তারপর শুঁকল।

মুহূর্তেই চেহারা বদলে গেল ওর, "ওহ, এই তাহলে ব্যাপার! শহরের বুকে এমন ব্যাপার আগে কখনও শুনিনি!"

"কী হয়েছে আপু? বুঝতে পারলেন কিছু?" বলল ইরফান।

"সম্ভবত," গম্ভীর হয়ে গেছে আফ্রিতা।

"ভূতের খোঁজ পেয়ে গেলেন নাকি?" হেসে উঠল আরিফ।

কোনো উত্তর দিল না আফ্রিতা।

***

"বুঝলে ইয়াং লেডি, আজকাল দিনকাল যা দাঁড়িয়েছে," খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন আহাদ সাহেব, "গত মাসে পাশের এলাকাতে সন্ত্রাসীদের দুটো গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে তিনজন মারা গেল, সেটার কূল-কিনারা নাকি পুলিশ এখনও করতে পারছে না!"

"অপরাধ," হাসল আফ্রিতা, "খুব রহস্যময় জিনিস, বালজাকের বলা সেই লাইনটার মতো, 'Behind every great fortune, there is a crime' ভালো লাগে আমার উনাকে!"

"ওয়াও, তুমি বালজাকের লেখা পড়ো? আমি ভাবতাম আজকালের ছেলে-ছোকরারা উনাকে চেনেই না!"

"উনার খুব ভক্ত আমি," চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলল আফ্রিতা।

"ইরফান যতটুকু বলল, তুমি ভূত-প্রেত নিয়ে কাজ করো, ওঝা টাইপ, তোমাকে দেখে বেশ অবাকই হয়েছি। আচ্ছা, এই ভূতের ব্যাপারটা ছাড়া আর কিছু করা হয়? মানে চাকরি-বাকরি?"

"আসলে আমাদের দেশের অনেক মানুষেরই ধারণা বড়োবড়ো চুল, জট, দাড়ি এগুলো না থাকলে কেউ এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে পারে না। সিনেমাতেও তাই দেখায়। চাকরি করি না, পারিবারিক ব্যাবসা আছে, সেখানেও পুরোপুরি যোগ দেইনি।"

"হুম,অর্কিড ভিলা। তোমার কী ধারণা? ওটা হন্টেড?"

"ধারণা না, ওখানে খারাপ কিছু একটা আছে। সেজন্যই আপনার কাছে আসা, আপনি ছোটো থেকেই এই এলাকাতে আছেন। ওই বাড়ি বা বাড়ির জমিটা নিয়ে কোনো ঘটনা? বা কোনো খারাপ অতীত? ওখানে নাকি আগে একটা পুকুর ছিল?"

"হ্যাঁ ছিল। তবে খারাপ কোনো ঘটনা নেই, একদমনেই। যতদূর শুনেছি পুকুরটা ব্রিটিশ আমল থেকেই ছিল, দিব্যি সেখানে গোসল করত মানুষ, কোনো সমস্যা হয়নি, কাউকে টেনে নিয়ে যায়নি পানির তলাতে। হাহা, কোনো শিকল-টিকলের কথাও শোনা যায়নি।"

"ব্যাপারটা শিকল বা কোনো জলপিশাচ সংক্রান্ত নয়, আমি সম্ভবত বুঝতে পেরেছি ওখানে কোন জিনিসটা আছে।"

"তাই? তবে ওটা তাড়ানোর ব্যবস্থা করো।"

"আসলে অতিপ্রাকৃত অনেক শক্তির মধ্যেই মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষমতা

প্রবল। তাই মানুষের অভিজ্ঞতাগুলো শুনে নেওয়া দরকার। শুধু আমি যা বুঝেছি তার ভিত্তিতে কাজ করতে গেলে বিপদ হতে পারে। দেখা গেল আমি যা ধারণা করেছি ওটা তেমন কিছুই না।"

"তখন কী হবে?"

"আমার প্রাণসংশয় হতে পারে। যাই হোক, তবে কোনোই ঘটনা নেই? এলাকাতে কি এমন বয়স্ক কেউ আছে যার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে?"

"কেউই নেই তেমন। এই এলাকার মানুষ এমনিতেই একে অপরের সঙ্গে মেশে কম। আর আমি মোটামুটি সবাইকেই চিনি, কেউই তোমাকে কোনো ভূতুড়ে ঘটনার ব্যাপারে বলতে পারবে না। বললাম না? ব্রিটিশ আমল থেকে পুকুর, কিছুই হয়নি, তারপর আমার চোখের সামনেই ভরাট হল।"

"হুম, আচ্ছা, তবে যারা ভাড়াটিয়া ছিলেন তাদের সঙ্গে একটু কথা বলতাম, শুনলাম উনাদের সঙ্গে আপনার ভালো পরিচয় ছিল। যদি একটু নম্বর দিতেন কারো। উনাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে শুনতাম।"

"উনারা কি আসলেই কোনো ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয়েছিলেন? এটা কিন্তু মূলত সুলতানের দোকান থেকে ছড়িয়েছে যে উনারা কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তাতে থাকতেন, ওকে নাকি জিজ্ঞাসাও করেছিল! অক্ষর সাহেবের নম্বর দেওয়া যায়। ফাহাদ সাহেব মানে যিনি এখনও কোমাতে, উনার স্ত্রীকে এসবের মধ্যে আনার কোনো দরকার দেখছি না। ভদ্রমহিলা এমনিই যথেষ্ট চিন্তাতে থাকেন।"

"আচ্ছা আর যিনি মারা গেছেন, উনার হাজব্যান্ড?"

"আফতাব সাহেব কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। উনার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। শোনো তোমাকে আমি অক্ষর সাহেবের নম্বরটা দিচ্ছি। উনার সঙ্গেই কথা বলো।"

নম্বরটা মোবাইলে সেভ করে নিল আফ্রিতা।

"থ্যাংক ইউ," চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে বলল সে।

"গুড লাক, আশা করছি তুমি ও-বাড়ির ভূতটাকে রামধোলাই দিতে পারবে, আচ্ছা শোনো আমি একটু বাজারে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল।" উঠে দাঁড়ালেন আহাদ সাহেব।

"আচ্ছা, একটা ব্যাপার, ওই বাড়ির যে দারোয়ান ছিল, তাকে নাকি দ্বিতীয় দুর্ঘটনার পর আর এলাকাতে দেখা যায়নি।"

"ও হ্যাঁ, শুধু সে না, বাবুল নামে তার সঙ্গে যে ছেলেটা থাকত তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়িওয়ালা প্রথমে ভেবেছিলেন যে সম্ভবত কিছু চুরি করে পালিয়েছে ওরা, কিন্তু পরে দেখা গেল তেমন কিছুই না।"

"ওদের খোঁজ করা হয়নি?"

"নাহ, ব্যাপারটাকে আর গুরত্ব দেয়নি কেউই, আর সুলতানের কারণে যে দুর্নামটা রটেছে বাড়িটার, এখন আর মনে হয় না কোনো ছিঁচকে চোরও ওখানে ঢুকতে সাহস পাবে। যেই ওর দোকানে কিছু কিনতে গেছে তাকেই ইনিয়ে বিনিয়ে সুলতান বলেছে যে ওই বাড়ির লোকেরা নাকি ভূত নিয়ে চিন্তিত ছিল! তাই আর সম্ভবত বাড়িওয়ালা আর নতুন দারোয়ানও রাখেননি।"

চলে গেলেন আহাদ সাহেব।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল ইরফান। সঙ্গে মধ্যবয়স্ক বেশ সুন্দরী এক মহিলা। সম্ভবত ওর মা।

"আপু, ইনি আম্মু," বলল ইরফান।

"আমি আফ্রিতা, আন্টি," হাসল আফ্রিতা।

"শুনলাম ইরফানের কাছ থেকে," থমথমে গলাতে বললেন ইরফানের মা, "আসলে মা শোনো, ওই বাড়িটা না ভালো না।"

"কেন আন্টি? কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন?" আগ্রহী হয়ে উঠল আফ্রিতা।

"নাহ, আসলে ওই বাড়ি নিয়ে কোনো কাহিনিই নাই। কিন্তু, ওই বাড়িটা, বোঝাতে পারব না, রাতের বেলা ওই দিকে তাকালেই কেমন লাগে! যে মহিলা মারা গেলেন না? উনার সঙ্গে একবার কথা হইসিল।"

"বাড়ি নিয়ে কিছু বলেছিলেন?"

"নাহ, কিন্তু তারে কেমন যেন অস্থির লাগতেসিল। যেদিন উনি মারা গেলেন, দেখতে গেছিলাম। কিছু একটা ব্যাপার ছিল, ওই বাড়ির ভাড়াটিয়াদের মুখ দেখেই বুঝা যাইতেসিল। যেইটা ওরা বাইরের কাউরে কয়নাই!"

"আপু এটা একদম সত্য," বলল ইরফান, "ফাহাদ আঙ্কেলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি আর আব্বু ছিলাম। উনারা সবসময়ই কিছু একটা লুকাতে চান। আর আম্মু যা বলল, ওই আন্টি মারা যাওয়ার দিনেও ওরা সবাই কিছু লুকাচ্ছিল!"

"কথা যা ছড়াইসে সবই সুলতানের দোকান থেকে, কিন্তু মনে হয় না আসল কথা বের হইসে। ও শুধু কয়, ওই বাড়ির লোকে নাকি ভয় পাইত," বললেন ফাহাদের মা।

"আচ্ছা আন্টি, আমি এখন উঠি পরে কথা হবে," উঠে দাঁড়াল আফ্রিতা।

"আচ্ছা মা, আইস আবার।"

"আপু চলেন আমি আপনাকে এগিয়ে দেই," আফ্রিতার পিছু পিছু দরজার দিকে গেল ইরফান।

***

"আপু, বলেন না কী সমস্যা বাড়িটাতে?" অস্থিরভাবে বলল ইরফান।

"সব খুলে বলব, আরও কিছু ব্যাপার দেখতে হবে।" হাঁটতে শুরু করল আফ্রিতা।

"আপু কথা দেন, সব খুলে বলবেন, আমাকে সঙ্গে রাখবেন, কতদিনের ইচ্ছা আপনার কাজ দেখব!"

"হুম," থামল আফ্রিতা, "এগুলো খুব রিস্কি ব্যাপার, তারপরেও তুমি না থাকলে এই অদ্ভুত কেসটার খবর আমি পেতাম না। সমস্যা নেই, শেষ দিনটাতে তোমাকে ডেকে নেব।"

"শেষ দিন বলতে?"

"অপদেবতাটার মুখোমুখি হওয়ার দিন, যাই হোক তোমার আব্বু ব্যাপারটা খুব ঠাট্টার ছলে নিয়েছেন। এখন অক্ষর সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

"দেখুন আপু, ওইটা সুলতান ভাইয়ের দোকান। আরে আরিফ ভাইয়াও দেখি দাঁড়িয়ে।"

কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল ইরফান। সঙ্গে মধ্যবয়স্ক বেশ সুন্দরী এক মহিলা। সম্ভবত ওর মা।

"আপু, ইনি আম্মু," বলল ইরফান।

"আমি আফ্রিতা, আন্টি," হাসল আফ্রিতা।

"শুনলাম ইরফানের কাছ থেকে," থমথমে গলাতে বললেন ইরফানের মা, "আসলে মা শোনো, ওই বাড়িটা না ভালো না।"

"কেন আন্টি? কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন?" আগ্রহী হয়ে উঠল আফ্রিতা।

"নাহ, আসলে ওই বাড়ি নিয়ে কোনো কাহিনিই নাই। কিন্তু, ওই বাড়িটা, বোঝাতে পারব না, রাতের বেলা ওই দিকে তাকালেই কেমন লাগে! যে মহিলা মারা গেলেন না? উনার সঙ্গে একবার কথা হইসিল।"

"বাড়ি নিয়ে কিছু বলেছিলেন?"

"নাহ, কিন্তু তারে কেমন যেন অস্থির লাগতেসিল। যেদিন উনি মারা গেলেন, দেখতে গেছিলাম। কিছু একটা ব্যাপার ছিল, ওই বাড়ির ভাড়াটিয়াদের মুখ দেখেই বুঝা যাইতেসিল। যেইটা ওরা বাইরের কাউরে কয়নাই!"

"আপু এটা একদম সত্য," বলল ইরফান, "ফাহাদ আঙ্কেলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি আর আব্বু ছিলাম। উনারা সবসময়ই কিছু একটা লুকাতে চান। আর আম্মু যা বলল, ওই আন্টি মারা যাওয়ার দিনেও ওরা সবাই কিছু লুকাচ্ছিল!"

"কথা যা ছড়াইসে সবই সুলতানের দোকান থেকে, কিন্তু মনে হয় না আসল কথা বের হইসে। ও শুধু কয়, ওই বাড়ির লোকে নাকি ভয় পাইত," বললেন ফাহাদের মা।

"আচ্ছা আন্টি, আমি এখন উঠি পরে কথা হবে," উঠে দাঁড়াল আফ্রিতা।

"আচ্ছা মা, আইস আবার।"

"আপু চলেন আমি আপনাকে এগিয়ে দেই," আফ্রিতার পিছু পিছু দরজার দিকে গেল ইরফান।

***

"আপু, বলেন না কী সমস্যা বাড়িটাতে?" অস্থিরভাবে বলল ইরফান।

"সব খুলে বলব, আরও কিছু ব্যাপার দেখতে হবে।" হাঁটতে শুরু করল আফ্রিতা।

"আপু কথা দেন, সব খুলে বলবেন, আমাকে সঙ্গে রাখবেন, কতদিনের ইচ্ছা আপনার কাজ দেখব!"

"হুম," থামল আফ্রিতা, "এগুলো খুব রিস্কি ব্যাপার, তারপরেও তুমি না থাকলে এই অদ্ভুত কেসটার খবর আমি পেতাম না। সমস্যা নেই, শেষ দিনটাতে তোমাকে ডেকে নেব।"

"শেষ দিন বলতে?"

"অপদেবতাটার মুখোমুখি হওয়ার দিন, যাই হোক তোমার আব্বু ব্যাপারটা খুব ঠাট্টার ছলে নিয়েছেন। এখন অক্ষর সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

"দেখুন আপু, ওইটা সুলতান ভাইয়ের দোকান। আরে আরিফ ভাইয়াও দেখি দাঁড়িয়ে।"

সুলতানের দোকানের সামনে থামল ওরা। একটা কোক খাচ্ছিল আরিফ।

"কী খবর আপনাদের? ভূত ধরা শেষ?" দাঁত বের করে হাসল সে।

"আরিফ সাহেব, আপনার দেশের বাসা কোথায়?" জিজ্ঞাসা করল আফ্রিতা।

"রাজশাহি," একটু বিব্রত হয়ে উত্তর দিল আরিফ, "আপনার?"

"ঢাকাতেই, রাজশাহি? ওয়াও রাজশাহি যাওয়া হয়েছে এর আগে আমার। আপনাদের নিউমার্কেটে একটা বড়ো থিম পার্ক আছে না? বেশ মজার জায়গাটা, বিশেষ করা বাচ্চাদের খেলার সরঞ্জামগুলো সেই!"

"হুম, জায়গাটা বেশ ভালো!"

"সেটাই, থাকুন তবে, পরে দেখা হবে। এই ইরফান থাকো, আর এগিয়ে দিতে হবে না। চিনে ফেলেছি এখানকার অলি-গলি," হাসতে হাসতে চলে গেল আফ্রিতা।

ভোরের শিশিরের মতোই কোমল ওর হাসিটা।

***

"হ্যালো," বিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরল অক্ষর। অফিসের কাজের চরম চাপের মধ্যে ফোন ধরতে ওর ভালো লাগে না।

"অক্ষর সৌভিক রায় বলছেন?" ওপাশ থেকে বলে উঠল একটা নারীকণ্ঠ।

"হ্যাঁ, আপনি কে?"

"আমি আফ্রিতা। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।"

"কী বিষয়ে? আমি এখন একটু ব্যস্ত তো।"

"অর্কিড ভিলার ব্যাপারে।"

"অর্কিড ভিলা?" গম্ভীর হয়ে এল অক্ষরের কণ্ঠ, "ওই বাড়িতে তো আমি আর থাকি না। আর ওটার ব্যাপারে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছুক নই।"

"দেখুন, আপনি কি চান না যে অতিপ্রাকৃত শক্তি একটা মৃত্যু আর একজন মানুষের অর্ধমৃত জীবন কাটানোর জন্য দায়ী তার শাস্তি হোক? আমার আপনার সাহায্য লাগবে!"

"ওয়েট ওয়েট, আপনি কি সেই আফ্রিতা এফএম রেডিওতে মাঝে মাঝে আসেন? ভৌতিক বিশেষজ্ঞ।"

"হ্যাঁ, আফ্রিতা। আঁধারের সন্ধান করি। বর্তমান সন্ধানে আপনার সাহায্য দরকার।" হাসল আফ্রিতা।

"আমি বুঝতে পারছি না আমি কী ধরনের সাহায্য করতে পারব, যাই হোক এখন তো ব্যস্ত, পরে ফোন দেই?"

"আমি আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলাম, কোনো সমস্যা হবে কি?"

"না, আজ বিকালে কোথাও বসি? অফিস শেষের পর?"

"আপনার স্ত্রী সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।"

"তাহলে কাল সকালে আমার বাড়িতে আসুন। ওর শরীর একটু খারাপ, বের হচ্ছে না। পরশু আমিও সারাদিন বাড়িতেই থাকব। আপত্তি আছে আপনার?"

"না,"

"আচ্ছা আমার ঠিকানাটা লিখে নিন তাহলে।"

রাত প্রায় সাড়ে দশটার মতো বাজে। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে দোকানের শাটার বন্ধ করল সুলতান।

কিছুটা দূরে তার বাড়ি, হেঁটেই যায় সে।

অর্কিড ভিলার দিকে নজর পড়ল তার। পুরো বাড়ি অন্ধকার। যেন ছোটোবেলায় শোনা গল্পগুলোর কোন রাক্ষস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"শালা ভূতের বাড়ি," আপনমনেই বলে উঠল সুলতান। আজ সকালে একটা মেয়ে এসেছিল বাড়িটা দেখতে। ইরফান, ওই মেয়ে আর আরিফ নামের ছেলেটাকে এলাকার বাড়িগুলোর পেছনদিকে যাওয়ার যে গলিটা রয়েছে সেটাতেও যেতে দেখে সে।

ফিরে এসে আবার আরিফ তার দোকানে এইসব নিয়ে হাসাহাসিও করেছে। ওই মেয়ে নাকি ভূত তাড়ায়।

এখনও ব্যাপারটা কাউকে বলেনি সুলতান। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর একজন-দুজন করে বলা যাবে। কথা শোনার জন্যও অনেকে আসে তার দোকানে। কেউ শুধু শুধুই জিজ্ঞাসা করে, তাদের পুরোটা বলে না সুলতান। আবার কেউ কিছু জিনিস কিনে তারপর জিজ্ঞাসা করে, এদেরকে সবই বলে দেয় সে। বিক্রিবাট্টাও নেহাত খারাপ হচ্ছে না, অর্কিড ভিলার ভূতুড়ে গুজব ছড়ানোর পর থেকে।

হাঁটতে লাগল সে।

গলিটার সামনে আসতেই সে দেখল আরিফ বেরিয়ে আসছে। প্রচণ্ড তাড়াহুড়ার মধ্যে আছে ছেলেটা, সুলতানকে দেখতেই পেল না সে। হনহন করে চলে গেল মেসের দিকে।

একটু অবাকই হল সুলতান। এ না আজ সকালেই ওর দোকানে এইসব নিয়ে হাসাহাসি করেছে? তবে সে ওই গলিতে কেন গেছিল? অর্কিড ভিলার পেছনটা দেখতে? নাকি অন্য কোনো বাড়ির পেছন দেখতে?

আবার এমনও হতে পারে যে মোড় থেকে আসার শর্টকাটটা নিয়েছে সে! হয়তো ইরফান ওকে চিনিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ওই শর্টকাট এলাকার খুব কম মানুষই ব্যবহার করে, বিশেষ করে রাতের বেলাতে।

এগিয়ে চলল সুলতান, ওর কেবলই মনে হচ্ছে অর্কিড ভিলার পেছনেই গেছিল আরিফ।

কিন্তু কেন?

***

ঘরটা আকারে বেশ বড়ো। চারদেয়ালের সঙ্গে চারখানা বইয়ের সেলফ, প্রতিটা দেয়ালের পুরোটা জুড়েই সেলফগুলো। চারিদিকে শুধু বই আর বই।

প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধরে একটা বইটা খুঁজছে আফ্রিতা। কিন্তু পাচ্ছে না।

প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে ওর, কাউকে ডেকে আচ্ছামতো বকুনি দিতে ইচ্ছা করতে ওর। কিন্তু সেই উপায় নেই। এই ঘরে ও ছাড়া আর কেউ ঢোকে না। কাজের লোকেরা তো দূরের কথা, ওর মা পর্যন্ত এই ঘরে কখনও আসেন না।

বইটা তবে গেল কোথায়?

ডানদিকের সেলফটার ওপরে নজর পড়ল ওর, চার-পাঁচটা বই ওখানে রাখা রয়েছে। মাঝে মাঝে পড়ার জন্য কিছু বই বের করে সেগুলো এইভাবে সেলফের ওপরে রেখে দেয় ও। সেভাবেই হয়তো কোনো দিন বইগুলো রেখেছিল, পরে মনের ভুলে ওখানেই থেকে গেছে।

একটু চেষ্টা করতে তাকের ওপরের দিকটাতে হাত পেয়ে গেল সে, লম্বা হওয়ার এই সুবিধা।

খুব সাবধানে বইগুলো নামাল ও। মোট চারটা বই। প্রতিটার অবস্থাই খুব কাহিল। মলাট নষ্ট হয়ে গেছে, পাতাগুলোর অবস্থাও ঝুরঝুরে।

প্রথম বইটা সরাতেই সেই বইটা দেখতে পেল সে, যেটা এতোক্ষণ ধরে খুঁজছিল।

বাকি তিনটা বই সেলফের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল সে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল, সেখানে বইটা নিয়ে বসল ও।

বইটা ১৯৮৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের হয়েছিল, সাঁওতালদের কিংবদন্তি নিয়ে।

***

মেসে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইল আরিফ।

এখন মনে হচ্ছে অর্কিড ভিলার পেছনে শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছে সে। ওখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ থাকছে না, ভবিষ্যতেও কারও আসার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

এখান থেকে কি তবে চলে যাবে ও?

ইরফানকে পড়ানোর কাজটাও শুধু অর্কিড ভিলার কারণেই নিয়েছে ও। ওদের বাড়ির বলতে গেলে একদম সামনেই ওটা।

ওই বাড়ির ওপর নজর রাখতেই পাঠানো হয়েছে তাকে।

আরও কয়েকটা দিন যাক, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে ও থাকবে না চলে যাবে।

***

বইটা সেলফে ঢুকিয়ে রাখল আফ্রিতা। বেশ রাত হয়েছে।

সম্ভবত সঠিক পথেই এগোচ্ছে ও। দরকার শুধু পিশাচটাকে একবার দেখা। তাহলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ও আসলে যেটা ভাবছে সেটা তাই-ই।

সামনা-সামনি দেখা ছাড়াও আরও কিছু আলাদা উপায় রয়েছে পিশাচদের দেখার। সেরকমই একটা পদ্ধতির কথা ভেবে রেখেছে ও।

দেখা যাক অক্ষরসাহেবের বাড়িতে গিয়ে কতটুকু লাভ হয়।

ফেসবুক আর মেসেঞ্জার চেক করতে লাগল আফ্রিতা। অ্যাকাউন্ট আর পেজে বেশ কয়েকটা মেসেজ এসেছে। পেজের মেসেজগুলো বেশিরভাগই নানান কেস সংক্রান্ত। একটা কেস নিয়ে কাজ করার সময়ে বাকিগুলো নিয়ে ভাবাটা ওর পছন্দ নয়, পরে ওগুলো ওপেন করা যাবে।

অ্যাকাউন্টের মেসেজগুলোও কয়েকটা কেস সংক্রান্ত, কিছু বন্ধুদের। ওগুলোও

ওপেন করার মানে হয় না।

ইরফান একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, এক ঝলক দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণে ছেলেটা কতটা সৌভাগ্যবান মনে করছে নিজেকে তা বোঝাতে চেয়েছে! ওই মেসেজটাও সিন করল না সে।

হুম, শেষ মেসেজটা এক লোকের। উদ্ভট প্রকৃতির একটা লোক। লেখালেখি করে। লোকটাকে একদমই পছন্দ নয় আফ্রিতার। তারপরেও মাঝে মাঝে কথা হয়।

লোকটা যে খুব বিরক্তিকর তা নয়। অনেকদিন পর পর মেসেজ দেয়, আর সেখানে শুধু একটাই লাইন থাকে, "কেমন আছেন?"

হুম, অদ্ভুত একটা লোক ব্যাটা।

ওয়াইফাই অফ করে দিয়ে উঠে পড়ল আফ্রিতা, ঘুমাতে হবে।

***

"আচ্ছা, আপনাদের মেসের আরিফ ভাই লোকটা কেমন?" সিগারেট দিতে দিতে প্রশ্ন করল সুলতান।

"আরিফ ভাই? মানে ওই যে চাকরির জন্য প্রিপারেশন? উনি আসলে আমাদের সঙ্গে তেমন মেশেন না। সারাদিন রুমেই থাকেন, দরকার পড়লে বের হন, এসে আবার ঢুকে পড়েন," বলল ছেলেটা। ওর পরনে কলেজ ইউনিফর্ম, পাড়ার মেসটাতেই থাকে। মাঝে মাঝেই সিগারেট নেয় সুলতানের দোকান থেকে।

"মেশে না কেন?"

"কী জানি! সম্ভবত আমরা জুনিয়র দেখে উনার জমে না। আসলে মেসে সবাই কলেজ পড়ুয়া আর উনি সেখানে চাকরির প্রিপারেশন নিচ্ছেন। উনি ছাড়া এত সিনিয়র আর কেউ নাই মেসে। তাই হয়তো আমাদের সঙ্গে দূরত্ব রাখেন, থাকেন, যাই।"

চলে গেল ছেলেটা।

ভাবছে সুলতান। গতরাতের দৃশ্যটা এখনও চোখে ভাসছে ওর।

তখনই ইরফানকে দেখতে পেল সে। স্কুলে যাচ্ছে ছেলেটা সাইকেল নিয়ে। সাইকেল নিয়ে যখন বের হয়েছে তখন শর্টকাটে যাবে না, ওর দোকানের সামনে দিয়েই যাবে।

"ও ইরফান আঙ্কেল, একটু শুনেন," ডাকল সুলতান।

"আরেহ, সলতান আঙ্কেল, আজ কিছু নেব না," সাইকেল থামিয়ে ভেংচি কাটল ইরফান।

"নেবেন না সেইটা ব্যাপার না। আচ্ছা আপনার মাস্টার আরিফ ভাই, আমার দোকানেই তো আপনার আব্বার সঙ্গে তার পরিচয়, তারপর সে আপনাকে পড়াতে যায়। লোকটা না কেমন জানি!"

"কেন, কী করলেন আবার উনি?"

"কাইল আপনার আর ওই আপার সঙ্গে গলির মধ্যে দিয়ে অর্কিড ভিলার পিছে গেছিল আইসা আমার এখানে কী হাসাহাসি! ওই আপা নাকি ভূত ধরতে আসছে। কিন্তু কাইল রাইতে.."

"রাতে কী?"

"দ্যাখলাম কী? উনি ওই গলি দিয়ে বাইর হইতেসেন!"

"আচ্ছা! তাই?" অবাক হল ইরফান।

"হ, অত রাইতে ওই গলিত কেন গেছিলেন উনি? রাইতের বেলা তো পাড়ার মানুষ শর্টকাটের জন্যও ওই গলি ব্যবহার করে না। কোনো লাইট নাই, পুরা অন্ধকার একটা গলি!"

"সেটাই। আচ্ছা আঙ্কেল আমি এখন যাই, ভাইকে জিজ্ঞাসা করব নে।"

"আমার কথা কইয়েন না।"

"আরে ধুর, আমার মাথা খারাপ নাকি?"

***

"অর্কিড ভিলা ছাড়ার পর বেশ কয়েকদিন এক কলিগের বাড়িতে ছিলাম। তারপর এখানে এসেছি, এখন আমরা বেশ ভালো আছি, আরে আপনি বসে আছেন কেন? চা নিন," বলে উঠল অক্ষর।

ঐশী উঠে গিয়ে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল আফ্রিতার দিকে।

"যতদূর শুনলাম ফাহাদ সাহেবের ওই ঘটনার দিনই আপনারা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে," কাপটা হাতে নিয়ে বলল আফ্রিতা।

"হ্যাঁ ঠিক তাই, আসলে ওখানে থাকা আর সেফ ছিল না," একটু থামল অক্ষর, "আসলে আমি আর ওসব নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। আমার স্ত্রীও ভয় পায়।"

"দেখুন, ওই বাড়ির অতিপ্রাকৃত শক্তিটাকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

"কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি?"

"বলুন।"

"আমার অফিসের এক দাদাকে বাড়িতে ডেকেছিলাম। দাদার একটা তন্ত্র-মন্ত্রের বেশ ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। মুন আপু একজন আলেমকে ডেকেছিলেন। উনারা কেউই ধরতে পারেননি যে বাড়ির জিনিসটা আসলে কী! শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা। আসলে আমি আপনাকে ছোটো করছি না।"

"একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর যদি ক্লাস ফাইভের বইয়ের কোন প্রশ্নের উত্তর না পারে, তবে কি উনার জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়?" অক্ষরের দিকে একদৃষ্টিতে চাইল আফ্রিতা।

"এটা কেমন প্রশ্ন?"

"না যায় না। কারণ সম্ভবত উনি অনুশীলনের অভাবে জ্ঞানের নিম্নতর স্তরগুলো থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছেন আবার এমনও হতে পারে যে বিষয় থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই বিষয়টা উনার কাছে নতুন, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক তেমনি ক্লাস ফাইভের একটা ছেলে যদি চট করে ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়, তার মানে এই না যে ছেলেটা ওই ভার্সিটির প্রফেসরের চাইতে বেশি জ্ঞানী। ওর কাছে ব্যাপারটা পরিচিত।"

"মানে আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন?"

"সেটা তো আমি আগেই বলেছি। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল, উনাদের

চাইতে আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা অনেক কম। কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলুন না কেন, আমি বুঝতে পেরেছি পিশাচটা আসলে কী!"

"তাহলে? এখনই ওটাকে শায়েস্তা করছেন না কেন?"

"সেটাই করতে চাই। কিন্তু আপনার সাহায্য দরকার। অভিজ্ঞতাগুলো শুনতে চাই, আপনার আর অন্য কেউ যদি কোনো অভিজ্ঞতা আপনার সঙ্গে শেয়ার করে থাকেন। সেগুলোও, এগুলো শোনার কী দরকার তা আমি আপনাকে পরে খুলে বলব।"

"দেখুন, এগুলো বলে..."

"সমস্যা নেই, আমি এগুলো প্রচার করব না। দয়া করে বলুন।"

"হুম," ঐশীর মুখের দিকে তাকাল অক্ষর।

"উনি এত করে বলছেন, বলো না, তুমি তো অনেক কিছুই জানো," বলল ঐশী।

"আচ্ছা, ঠিক আছে শুনুন।"

"থামুন," আশেপাশে তাকাল আফ্রিতা, "আমি যতদূর শুনেছিলাম আপনার মা-ও আপনাদের সঙ্গে থাকেন, উনি কই?"

"মা, একটু মামাবাড়ি গেছেন। আসবেন কদিন পর। উনাকেও লাগত? উনার তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। তবে উনি বাড়িটা পছন্দ করতেন না।"

"আচ্ছা, আপনি বলুন, তারপর বোঝা যাবে উনাকে লাগবে কী লাগবে না," খালি কাপটা টেবিলে রাখল আফ্রিতা।

"ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল আফতাব আঙ্কেলের সঙ্গে।" বলতে শুরু করল অক্ষর।

***

"কী খবর তোমার ওই ভূতওয়ালির," চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল আরিফ।

"ভাইয়া, উনার তো একটা নাম আছে, তাই না?" খাতা থেকে চোখ না তুলেই বলল ইরফান। একে তো স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই দেখে যে আরিফ চলে এসেছে পড়ানোর জন্য, তারওপর আবার সুলতানের বলা কথাগুলো। সবমিলিয়ে আরিফের ওপর বেজায় মেজাজ খারাপ ওর। আর এখন আবার লোকটা আফ্রিতাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে।

"না মানে বলছিলাম, আবার কোনো অভিযান-টভিযান..."

"তেমন কিছু বলেনি আমাকে।"

"হয়তো তোমাকে না বলেই আসবে?"

"হতে পারে।"

"তোমার কি কোনো কারণে মন খারাপ?"

"না ভাইয়া, স্কুল থেকে এলাম তো, একটু ক্লান্ত।"

আর কথা বাড়াল না আরিফ।

***

"...এর পর আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিলাম, ওখানে থাকা আর সম্ভত ছিল না, মুন

আপুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়, মাঝে মাঝে ফাহাদ ভাইয়াকে দেখতেও যাই। উনি এখনও কোমাতে," দীর্ঘশ্বাস ফেলল অক্ষর।

"ফাহাদ সাহেবের স্ত্রী এখন কোথায় আছেন?" বলল আফ্রিতা।

"আপু এখন অফিসের কাছাকাছি একটা একটা ছোটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন, ওখান থেকে নর্থ অ্যান্ড ক্লিনিকও কাছে হয়," বলল ঐশী, গলা ভারী হয়ে এসেছে ওর।

"ব্যাপারটা তবে শুরু হল সাহানার হাজব্যান্ড আফতাবের সঙ্গে," চশমাটা খুলল আফ্রিতা, "ছোট একটা বাচ্চা, তারপর ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ভয়াবহ হয়ে গেল। জিনিসটা আপনাদের মধ্যেই কয়েকজনের রূপে দেখা দিতে লাগল। প্রথমে সাহানা দেখলেন, তারপর মুন আর তারপর দেখলেন আপনি।"

"হ্যাঁ, ঐশীর রূপে।"

"সাহানার মৃত্যু ভয় পেয়ে আর ফাহাদ সাহেবের দুর্ঘটনাটা পা পিছলে?"

"হুম, মুন আপু সাবান দেখেছিলেন একটা। ফাহাদ ভাইয়ের পায়ের কাছে পড়ে ছিল ওটা।"

"মওলানা আসগর ঘর বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও ফাহাদ বের হয়েছিলেন? এখানে যে পয়েন্টটা সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ তা হল নীচে হাবিব মিয়াকে খুঁজতে যান তিনি আর ফিরে আসেন থমথমে মুখে!"

"হ্যাঁ, ভাইয়া শুরু থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন, তবে ফিরে এসে নাকি উনি বলেন যে পরদিন থেকে বাড়ি দেখবেন। আপু বলেছেন উনার মুখটাও কিছুটা থমথমে ছিল।"

"সম্ভবত উনি কিছু দেখেছিলেন... সেটা উনার স্ত্রীও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।"

"দেখুন.. মুন আপুর সঙ্গে দয়া করে দেখা করতে চাইবেন না। উনি অনেক কিছু নিয়ে ঝামেলাতে আছেন।"

"নাহ আর কারও সঙ্গেই দেখা করার দরকার নেই। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ব্যাপারটা যা ভেবেছিলাম তাই। হাবিব মিয়ার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল বাবুল, তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"ওদের দুজনকে আপনি কখনও একসঙ্গে দেখেছেন?"

"এই প্রশ্ন কেন করছেন?" চমকে উঠল অক্ষর।

"বলুন না," রহস্যময় হাসি খেলা করছে আফ্রিতার চোখে।

"জানেন, এটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। ওদের দুজনকে কখনোই একসঙ্গে দেখিনি, এ থাকলে ও থাকত না আর ও থাকলে এ। এমনকি মাঝে মাঝে কেউই থাকত না। কিন্তু দুজনকে একসঙ্গে কখনোই দেখিনি!"

"সেটাই হওয়ার কথা," হাসল আফ্রিতা, "জানেন অক্ষর সাহেব, আহাদ সাহেবের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। উনি সেই ঘটনাটা আমার কাছে পুরোপুরি গোপন করে গেছেন যে উনার ছোটোবেলাতে সাপের খেলা দেখানো একটা লোক ওই বাড়ির জমিতে ভয় পেয়েছিল! যেটা উনি ফাহাদ সাহেবকে বলেছিলেন আর আমি শুনলাম আপনার কাছ থেকে।"

"কেন উনি ব্যাপারটা গোপন করলেন?"

"হয়তো উনি আমাকে তেমন গুরত্ব দেননি। নয়তো ঘটনাটাকেই গুরত্ব দেননি। যাই হোক, সমস্যা তো প্রতিনিয়ত হত না, তাই না? মাঝে মাঝে?"

"হ্যাঁ, একদিন সমস্যা হলে তারপরের বেশ কয়েকটা দিন আর কোনো সমস্যা হত না। দেখুন মিস. আফ্রিতা, আহাদ সাহেব যদি ঘটনাটাকে গুরত্ব না দিতেন তবে কি উনি ওটা এতদিন মনে রাখতেন?"

"হুম.. আচ্ছা পরে দেখা যাবে, হাবিব মিয়া বা বাবুলের বাড়ি কোথায়, এরা কোথা থেকে এল এই ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন আপনাদের বাড়িওয়ালা?"

"হ্যাঁ, কিছুটা বলেছিলেন, সাহানা আন্টি মারা যাওয়ার দিন। বললামই তো বাড়িটা নিয়ে উনার বেশ বড়ো পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু টাকা-পয়সার জন্য আটকে গেলেন। তো উনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে বাড়িতে একজন গার্ড রাখবেন। কিছু সংস্থা আছে না, সিকুরিটি গার্ড নিয়োগ দেয়? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওইসব ক্ষেত্রে বেতন অনেক বেশি, আর ওই সংস্থাকেও কিছু টাকা দিতে হবে। নানান সংস্থা ঘুরে একটু বাজার যাচাই করছিলেন তিনি। তো ওই এলাকারই মোড়ের 'সানলাইট সিক্যুরিটি'র অফিসের সামনে হাবিব মিয়ার সঙ্গে উনার পরিচয়। লোকটা বলেছিল এই কাজ সে আগেও করেছে। তখনই তাকে নিয়ে এলেন উনি, তো বাড়ি তখনও তৈরি হচ্ছে। এরপর হাবিব মিয়া বলে যে তার এলাকার একটা ছোটো ছেলে আছে, বাবুল নাম, অভাবে আছে, উনার সঙ্গে থাকলে একটু ভালো হয়। আপত্তি করেননি আনোয়ার সাহেব। বাবুলও আসে কিছুক্ষণ পর। সেই সময়ে মিস্ত্রিদের দেখাশোনার দায়িত্ব বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পালন করে লোকটা। তাই উনাকেই রেখে দেওয়া হয়। তখন থেকেই একতলার ওই ঘরটাতে থাকত ওরা। এখানেও একটা ব্যাপার জানেন?"

"কী?"

"তিনি কিন্তু এটা বলেছিলেন যে দুপুরবেলা আসে বাবুল, তখন কিন্তু হাবিব মিয়া নাকি বাড়ির কাজের জন্য একটা নতুন বেলচা কিনতে গেছিল। একটু পরেই সেই বেলচা নিয়ে হাজির হয় বাবুল আর বলে যে সে-ই বাবুল, হাবিব মিয়া তাকে পাঠিয়েছে।"

"হুম, যেমনটা ভেবেছিলাম।"

"আফ্রিতা," কেঁপে উঠল অক্ষর, "তবে কী, তবে কী?"

"হ্যাঁ, সম্ভবত সেটাই।"

"কী অক্ষর, আমি বুঝতে পারলাম না?" পাশ থেকে বলে উঠল ঐশী।

"হাহাহা, মিসের রায়, একটু পরে বুঝুন, হ্যাঁ? আরও কিছু কথা বলে নেই? আর আপনার কাছে একটা সাহায্য লাগবে। সবচেয়ে বড়ো সাহায্যটা সম্ভবত আপনার কাছ থেকেই পাচ্ছি।"

"কী সাহায্য?" অবাক হল ঐশী।

"পরে বলছি, আচ্ছা অক্ষর সাহেব, ফাহাদ সাহেবের দুর্ঘটনার পর থেকে তো হাবিব মিয়া আর বাবুলকে আর দেখা যায়নি তাই না?"

"হ্যাঁ, ওদের আর দেখা যায়নি। চলে আসার পর আবার একদিন মুন আপুর জিনিসপত্র আনতে গেছিলাম। সেদিনও কেউ ছিল না। বাড়িওয়ালাকে ডেকেই সব

কিছু করতে হয়েছে।"

"উনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেছে হাবিব মিয়া?"

"না, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বলেছেন হাবিব মিয়ার কোনো খোঁজ পাননি, মোবাইলও বন্ধ।"

"আচ্ছা, এবার শেষ প্রশ্ন। আপনি তো নিশ্চিত যে সাহানার মৃত্যু অস্বাভাবিক ছিল?"

"একদম। মুন আপুও নিশ্চিত।"

"বেশ, আমি এখন মোটামুটি আশি ভাগ নিশ্চিত যে আমি যা ভাবছি তা ঠিক, বাকিটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য পিশাচটাকে দেখতে হবে। আর সেটার জন্য আমার মিসেস. রায়ের সাহায্য দরকার।"

"কী সাহায্য?" বলল ঐশী।

"দেখুন, আপনার রূপ ধরেছিল ওটা, তাই না?"

"হ্যাঁ!"

ব্যাগ থেকে কাগজের একটা পৃষ্ঠা বের করল আফ্রিতা আর একটা সিলপ্যাড। সিলপ্যাডটা খুলল ও। সাধারণত সিলপ্যাডের কালি নীল বা সবুজ হলেও এটার কালি একদম টকটকে লাল!

"শুনুন," সিলপ্যাড আর কাগজ ঐশীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল আফ্রিতা, "বুড়ো আঙ্গুলে কালি নিয়ে কাগজে একটা ছাপ দিন, টিপসই আর কী। হাহা, তবে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু।"

"কী ব্যাপার?"

"আপনি যে মুহূর্তে আঙুলটা কাগজে লাগাবেন সেই মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য পিশাচটার মুখ আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। ওর আসল চেহারা। ভয় পেতে পারেন।"

"ওর কোনো ক্ষতি হবে না তো? আমিই টিপ দেই না হয়?" এগিয়ে এল অক্ষর।

"না না আপনি দিলে হবে না, আপনার রূপ ধরতে ওটাকে কেউ দেখেনি।"

"কিন্তু ওর যদি কোনো, কোনো ক্ষতি হলে?"

"কিছুই হবে না।"

"ভয় পাবে না তো?" ঐশীর কাঁধে হাত রাখল অক্ষর।

"নাহ," এই বলে সিলপ্যাডে আঙুলটা লাগিয়ে তারপর কাগজের ওপর সেই স্পর্শ করাল ঐশী। তারপরেই ভয়ংকর এক আর্তচিৎকার করে সরে গেল সে। মাটিতে পড়ে গেল কাগজ আর সিলপ্যাডটা।

"আ...আ...ও!" অক্ষরকে জড়িয়ে ধরল সে।

মাটি থেকে কাগজ আর সিলপ্যাডটা কুড়িয়ে নিল আফ্রিতা।

"কী দেখলে?" ঐশীর মাথাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল অক্ষর।

"ওটা... অনেক ভয়ংকর!"

"উনাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই অক্ষর সাহেব, সমস্যা নেই, উনার আঙুলের ছাপ পেয়ে গেছি। এখন আমার আলাদা পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিতে আমি ওটাকে দেখে নেব।"

"ওহ," স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অক্ষর, "আমি ভেবেছিলাম ও যা দেখবে সেটারই বর্ণনা শুনবেন আপনি।"

"বর্ণনা কেন শুনব? এখন তো ওটার হুবহু প্রতিমূর্তি দেখার উপায় হয়ে গেছে," হাসল আফ্রিতা।

"আমাকে দেখাবেন?" আগ্রহী হয়ে উঠল অক্ষর।

"নাহ, কিছু কাজ একাই করতে হয়, আমি তবে এখন যাই, আপনার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করব অক্ষর সাহেব। আশা করি আমাকে সময় দিতে পারবেন।"

"অবশ্যই, চেষ্টা করব।"

অক্ষরদের বাড়ি থেকে বের হয়ে ইরফানকে একটা মেসেজ পাঠাল আফ্রিতা। তারপর একটা রিকশাতে উঠে পড়ল।

***

"সম্ভবত মেয়েটা ঘটনাটা অক্ষর সাহেবের কাছ থেকে শুনেছে। ফাহাদ সাহেব তবে উনাকে বলেছিলেন।" গম্ভীর মুখে বললেন আহাদ সাহেব।

"তুমি ওটা আপুকে কেন বলোনি আব্বু?" ঠান্ডা গলাতে বলল ইরফান।

"ওটা তেমন গুরত্বপূর্ণ কিছু না বাবা, কোন কালে একটা পাগল কিছুটা পাগলামি করেছিল," ইরফানের চোখে চোখ রাখতে যেন ভয় পাচ্ছেন আহাদ সাহেব।

"আব্বু, তুমি কি জানো বাবা হিসাবে তোমাকে সবসময় আদর্শ মেনে এসেছি, আমার সব বন্ধুরা জানে যে আমার আব্বু ওদের বাবাদের মতো না, আমার আব্বু আমাকে বোঝেন। আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক তোমার, কোনো কিছুই আমার কাছে লুকাওনি তুমি কোনোদিন।"

"হয়তো লুকিয়েছিলাম, শুনলেই তো, এখন আর কী শুনতে চাও?"

"আফ্রিতা আপু ধারণা করছেন ফাহাদ আঙ্কেলকে পুরো ঘটনা বলোনি তুমি। কিছু একটা লুকিয়েছিলে।"

চমকে উঠলেন আহাদ সাহেব। ওই মেয়েটা কি আসলেই জাদু জানে নাকি?

"না না, যা হয়েছিল সবই উনাকে বলেছিলাম।"

"আব্বু, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কখনও মিথ্যা বলো না, কিন্তু আজ তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না! তুমি আসলেই কিছু লুকাচ্ছ।"

"দেখো বাবা, মাঝে মাঝে কাকতালীয়ভাবে অনেক কিছুই হয়ে যায়। আমরা সেগুলোকে অলৌকিক ভেবে নেই," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আহাদ সাহেব, "ওই ব্যাপারটাতেও ঠিক তেমনই কিছু একটা ঘটেছিল শেষে।"

"কী ঘটেছিল?"

"বলতেই হবে? ঘটনাটার কথা ভাবতেই ভালো লাগে না আমার।"

"প্লিজ বাবা!"

"হুম, ওই যে লোকটা সাপের খেলা না দেখিয়ে চলে গেল, তার ঠিক তিনদিন পর মোড়ে একটা খুব বাজে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। আত্মহত্যা আর কী। একটা লোক ছুটে এসে চলন্ত ট্রাকের সামনে পড়েছিল। গোটা শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছিল,

তবে মাথাটা অক্ষত ছিল। আমি তখন কোনো কারণে ওখান দিয়ে আসছিলাম। আমি মৃতদেহটা দেখেছি।"

"তারপর?"

"তারপর? বেশি কিছু না। মৃতদেহটা ছিল সেই লোকটার যে সাপ খেলা দেখাতে এসেছিল!"

***

দেয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে নিজের ঘরে বসে আছে আরিফ।

অর্কিড ভিলার দিকে নজর রাখতে রাখতে ক্লান্ত সে। কই, আজ সারাদিনেও তো কেউ এল না!

ইরফানের কাছ থেকেও কোনোভাবেই বের করা যায়নি যে ওই মেয়েটা আবার এখানে আসবে নাকি।

ইরফানের আচরণও অনেকটা বদলে গেছে। মন খুলে আর কথা বলছে না ছেলেটা।

আচ্ছা, আফ্রিতা নামের ওই মেয়েটাই ওকে কিছু বলতে মানা করে দেয়নি তো ইরফানকে? হতে পারে। নইলে ইরফান তো এমন ছিল না। হাসিখুশি ছেলেটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে।

তবে কি মেয়েটা বুঝে গেছে গেছে যে সে আসলে...

***

"ঐশী, আঙুলের ছাপ দেওয়ার সময়ে তুমি কী দেখেছিলে?" জিজ্ঞাসা করল অক্ষর। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ওর।

"বুঝলে অক্ষর," পানির গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখল ঐশী, "আসলে আমার ঠিক মনে নেই, কয়েক মুহূর্তের জন্যই আমার চোখের সামনে এসেছিল চেহারাটা। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত... বীভৎস একটা চেহারা ছিল!"

"হুম, তোমার কী মনে হয় এই আফ্রিতা মেয়েটা আসলেই ভেলকি-টেলকি জানে?"

"কিছু একটা তো জানে, নইলে আমার সঙ্গে অমন হল কেন? ও তো বলছিল তোমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে।"

"হুম, সেটাই। দেখা যাক কী হয়।"

"অক্ষর, তোমার কী মনে হয়? আসলেই আফ্রিতা ওই খারাপ জিনিসটাকে শেষ করতে পারবে?"

"আমি শুধু এটুকুই চাই, যে অপশক্তি সাহানা আন্টি আর ফাহাদ ভাইয়ের অবস্থার জন্য দায়ী, তার শিক্ষা হোক, এর বাইরে আমি কিছু চাই না।"

অক্ষরের ফোনটা 'টিং' করে উঠল। একটা মেসেজ এসেছে।

মেসেজটা পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে উঠল ওর মুখটা, "হে ভগবান!"

"কী হয়েছে?"

"আফ্রিতা মেসেজ দিয়েছে। ইরফান ওই ব্যাপারে আহাদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিল। উনি ঘটনাটা পুরোপুরি বলেছেন।"

"পুরোপুরি মানে? ওই তো, লোকটা ওখানে সাপের খেলা দেখাল না! এটুকুই তো, তাই না?"

"না, একটু বাকি ছিল, যেটা উনি ফাহাদ ভাইকে বলেছিলেন না। তিনদিন পর ওই লোকটা একটা ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল!"

***

ঘরের আলো নিভিয়ে দিল আফ্রিতা। শুধুমাত্র একটা ছোটো টেবিলল্যাম্প ছাড়া আলোর আর কোনো উৎস নেই ঘরে। ওটার লালচে আলোতে ঘরটাকে কেমন যেন আধিভৌতিক লাগছিল।

মেঝেতে একটা বাটিতে লালচে একটা থকথকে তরল। এই আধো-অন্ধকারে যে কেউ ওটাকে রক্ত ভেবে ভয়ও পেতে পারে।

ব্যাগ থেকে ঐশীর ছাপ দেওয়া সেই কাগজটা বের করল সে। তারপর সেটাকে রাখল সেই তরলের ওপরে।

মোবাইলটাতে সাত মিনিট পর অ্যালার্ম সেট করল।

তারপর ব্যাগ থেকে বের করল একটা বহুদিনের পুরোনো নীলচে মোমবাতি। পুড়তে পুড়তে আকার অনেক ছোটো হয়ে গেছে ওটার।

লাইটার দিয়ে মোমটা জ্বালাল আফ্রিতা।

তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে। তিন-চার মিনিট পরই এক মগ পানি, একটা চামচ আর বেশ বড়ো একটা আয়না নিয়ে ফিরে এল সে।

কিছুক্ষণ পর বেজে উঠল অ্যালার্ম। সাত মিনিট হয়ে গেছে।

কাগজটা খুব সাবধানে তুলল সে। তরলে ভিজে বেশ নরম হয়ে গেছে ওটা, ছিড়ে গেলেই সমস্যা।

অভ্যস্ত হাতে সেই কাগজটা আফ্রিতা ধরল মোমের ওপরে। দপ করে আগুন ধরে গেল সেটাতে আর এক-দুই সেকেন্ডের মধ্যেই পুড়ে গেল সেটার অনেকটা। বাকি রইল শুধু উপরের একটু অংশ, আফ্রিতার আঙুলগুলোর একটু আগ পর্যন্ত।

সেটা নিয়ে পানির সেই মগে ফেলে দিয়ে চামচ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়ল সে।

তারপর আয়নাটাকে রাখল মোমবাতির সামনে। গুনে গুনে তিনবার সেই পানির ছিটা দিল আয়নাতে।

কেমন যেন একটা পরিবর্তন হতে লাগল আয়নাতে। একটু আগেই যেখানে মোমবাতিটার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল সেখানে ফুটে উঠতে লাগল একটা আজব অবয়ব!

ছোট্ট একটা শিশুর শরীর থেকে মাথাটা কেটে যেন সেখানে কোনো এক নিকৃষ্ট শয়তানের মুখ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে! এই ভয়াবহ মূর্তি দেখলে যে-কোনো সাধারণ মানুষ ভয় পেতে বাধ্য।

"তুমিই তবে সেই... যা ভেবেছিলাম... গুদ্রবোঙা," মৃদু হেসে বলল আফ্রিতা।

বহুরূপী অপদেবতাদের চেহারা দেখার এই পদ্ধতিটা অনেক পুরোনো, নেটিভ আমেরিকানরা দীর্ঘকাল থেকে এটা ব্যবহার করে আসছে।

"আফা, ও আফা, খালা খাইতে ঢাকতেসে," ঘরের বাইরে থেকে ভেসে আসল ওদের কাজের মেয়ে শেফালির কণ্ঠ।

"যাও, আমি আসছি," বলল আফ্রিতা।

***

"আজ এত সকাল সকাল ডাকলে যে?" বসতে বসতে বলল আরিফ।

"আজ স্কুলের পরে একটা ছোট্ট ফাংশন আছে তো, তাই আর কী," বই থেকে মাথা না তুলেই বলল ইরফান।

সকালে উঠেই আরিফকে ফোন দিয়ে ইরফান বলে যে আজ একটু সকাল সকাল পড়ালে ভালো হয়। বিকালে বা রাতে সময় না-ও হতে পারে।

ইদানীং ইরফানের কাছাকাছি থাকতে চাচ্ছে আরিফ, তাই ও বলার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে সে।

"কী ফাংশন," বলল আরিফ।

"আরে হয় না স্কুলে, এই ম্যাথটাতে একটু প্রবলেম।" খাতাটা আরিফের দিকে এগিয়ে দিল ইরফান।

আরিফের মনে তখন অন্য একটা চিন্তা ঘুরছে।

***

প্রায় বিকাল হতে চলেছে। রেস্টুরেন্টটাতে ভিড় বলতে গেলে নেই-ই। অক্ষরের অফিসের পাশেই এটা, নতুন খোলা হয়েছে।

কফির অর্ধেকটা প্রায় শেষ করে এনেছে অক্ষর। আফ্রিতা এখনও কাপে হাতই দেয়নি, মোবাইলে কী যেন দেখছে ও।

কফির সঙ্গে একটা বার্গারও নিয়েছে ইরফান। ছেলেটার পরনে স্কুল ইউনিফর্ম, বোঝাই যাচ্ছে স্কুল থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছে সে।

"এখানকার বার্গারটা তো সেই-ই, মাঝে মাঝেই আসতে হবে," মস্তবড়ো একটা কামড় দিয়ে বলল ইরফান।

"লাগলে আর একটা নাও, সমস্যা নেই," হাসল অক্ষর।

"আরে না না, একটাই শেষ করি আগে।"

"শুধু ও কেন? আপনিও কিছু অর্ডার করুন না, শুধু কফি কেন?" মোবাইল থেকে মুখ তুলল আফ্রিতা।

"আজ আপনাকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে মিস. আফ্রিতা," ফাঁকা কাপটা একপাশে সরিয়ে রাখল অক্ষর।

"তা বলতে পারেন। নিশ্চিত হয়েছি সমস্যা আমি যেটা ভেবেছিলাম তাই, এজন্য আপনাদের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ।"

"তাই? তো কী সমস্যা? আমাদের বলা যাবে?"

"তা তো যাবেই, বলার জন্যই তো ডেকেছি। আরে আমার কফি ঠান্ডা হয়ে গেল নাকি," কফির কাপটা তুলে নিল আফ্রিতা, "অক্ষর সাহেবের কফি মনে হয় শেষ, আর এক কাপ নিন তবে।"

"আরে না না।"

"আরে নিন, আর ইরফান একটা পিৎজা চলবে নাকি?"

"স্কুল থেকে এলাম তো, খিদেটা এখনও আছে," দাঁত বের করে হাসল ইরফান।

ওয়েটারকে ডেকে আর এক কাপ কফি আর একটা বেশ বড়ো আকারের পিৎজা অর্ডার করল আফ্রিতা।

"বাপরে বাপ, আজ এত খাওয়া-দাওয়া," আস্তে করে বলল অক্ষর।

"এই ধরনের কিছুর সম্মুখীন আগে হইনি, এই শহরের বুকে হব যে সেই আশাও ছিল না, আপনাদের কারণেই অবশেষে আশা পাচ্ছি। তাই একটু ট্রিট দিচ্ছি।"

"অপদেবতার খোঁজ পেয়ে খুশি আপনি?" অবাক হল ইরফান।

"অভিজ্ঞতা...দরকার আরও অনেক অভিজ্ঞতা। পিৎজাটা আসুক, ওটা খেতে খেতে একটা বোরিং মিথোলজিক্যাল গল্প শুনতে হবে আপনাদের। এমনি এমনি তো আর খাওয়াচ্ছি না। হাহা, তারপরেও হয়তো বোঝাতে পারব যে বাড়িটার আসলে কী সমস্যা।"

"মিথোলজি, ওয়াও! আমার খুব ভালো লাগে!" আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল ইরফান।

"আমারও মন্দ লাগে না," চোখ নাচাল অক্ষর।

***

অন্ধকার প্রাসাদটার কোনো শেষ বা শুরু নেই।

ফাহাদ শুধুই হেঁটে বেড়াচ্ছে। সময়ের হিসাব বহু আগেই হারিয়ে ফেলেছে সে।

শুধুই ফাঁকা করিডোর আর নিঃস্তব্ধতা, আর কিছুই নেই এই প্রাসাদে।

মাঝে মাঝে একটা করে দরজা খুঁজে পায় সে, দরজাটা খোলার পর মুনকে দেখতে পায়। ওর দিকে তাকিয়ে হাসে মেয়েটা।

তারপরেই মুনের চেহারাটা বদলে যায় সে, পরিণত হয় একটা ভয়াবহ মুণ্ডুহীন প্রেতে!

আবার হাঁটতে শুরু করে ফাহাদ। শুধু হেঁটেই যায়।

***

পিৎজা খেতে ইচ্ছা করছে না অক্ষরের। এইসব খাবার-দাবারের ব্যাপারটা বেশ বিরক্ত লাগছে ওর। কফিতেই চুমুক দিচ্ছে সে। এক টুকরো পিৎজা নিয়ে একবার ওটাতে কামড় দিচ্ছে আর একবার কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আফ্রিতা।

ইতোমধ্যেই দুই টুকরা পিৎজা খেয়ে তৃতীয়টা হাতে নিয়েছে ইরফান।

"তো শুরু করা যাক, কী বলছেন?" খেতে খেতে বলল আফ্রিতা।

"হুঁ হুঁ।" আর বেশি কিছু বের হল না ইরফানের মুখ দিয়ে, পিৎজার টুকরোটার ওপর জলহস্তী কামড় বসাচ্ছে সে।

শুধু মাথা নাড়ল অক্ষর।

"আচ্ছা সাঁওতাল, শুনেছেন তো ওদের ব্যাপারে?" শুরু করল আফ্রিতা, "সাঁওতালদের ভাষাতে দেবতাদের বলা হয় বোঙা। সৃষ্টিকর্তা যে দেবতা তিনি হলেন শিংবোঙা, ধীরে ধীরে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন তিনি, সৃষ্টি করলেন পৃথিবী। সৃষ্টি করলেন অন্যান্য সব দেবতা মানে বোঙা, মানুষ, পশু-পাখি আর বাকি সব কিছু। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন সূর্যকে। সূর্যের নাম দিলেন নিজের নামে। সাঁওতালেরা এজন্যই সূর্যকে বলে শিং। সূর্যের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন শিংবোঙা। আর বাকি সব বোঙারা বাস করতে লাগল স্বর্গে। এই

পৃথিবীর দেখাশোনার ভার তিনি দিলেন পর্বত দেবতা 'মারাংবুরু' আর গৃহদেবতা 'আবগে বোঙাকে'। ইন্টারেস্টিং না? বাপ রে, এখানকার কফিটা আসলেই সেই।"

"সে আর বলতে, সঙ্গে পিৎজাটাও," সায় দিল ইরফান। কোনো কথা বলল না অক্ষর।

আবার শুরু করল আফ্রিতা, "তো একদিন শিংবোঙার ইচ্ছা হল যে তিনি পৃথিবীতে গিয়ে দেখবেন, তাঁর সৃষ্টিরা সবাই কেমন আছে। মানুষের রূপ ধরে তিনি নেমে এলেন পৃথিবীতে, দেখতে লাগলেন সব কিছু। সবুজ-শ্যামল এক পৃথিবী, মানুষেরাও সবাই সুখে আছে। খুব খুশি হয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। রাস্তার মধ্যে তিনি দেখলেন একটা লোক জমিতে কাজ করছে। শিংবোঙা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী গো, জমিতে বীজ কবে বুনলে?' লোকটা হেসে উত্তর দিল, 'আজকেই বুনলাম।' আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন একটা লোক গাছের নীচে ঘুমিয়ে আছে, তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কখন ঘুমালে?" লোকটা উত্তর দিল, 'এইতো আজ।'

"একটু দূরে যাওয়ার পর তিনি দেখতে পেলেন একটা লোক বেশ বড়ো একটা গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গোরুটার বয়স কত?" লোকটা অবাক হয়ে উত্তর দিল, 'বয়স আবার কী?' 'আরে, বয়স বোঝো না? গোরুটার জন্ম কবে?" রেগে গেলেন শিংবোঙা। 'আজই এটার জন্ম হয়েছে!' উত্তর দিল লোকটা। 'আচ্ছা তবে তোমার জন্ম হয়েছে কবে?' বললেন তিনি। 'আজই আমার জন্ম হয়েছে, শুধু আমার কেন? এই যে আশপাশে যা কিছু দেখছেন, যতো গাছ-পালা, ফুল-ফল, এদের সবার জন্ম হয়েছে আজ।

"বড়ো একটা ধাক্কা খেলেন শিংবোঙা, তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সৃষ্টির একটা বড়ো খুঁত। আসলে সূর্য কখনো ডোবে না, তাই দিনই থাকে চিরকাল। এজন্য মানুষেরা বোঝে না সময় আসলে কী! সঙ্গে সঙ্গে আবগে বোঙা আর মারাং বুরুকে ডেকে পাঠালেন তিনি। প্রথমেই প্রচণ্ড রাগারাগি করলেন, যে তাঁরা কেন তাঁকে সৃষ্টির এই ভুলটা ধরিয়ে দেননি। মারাংবুরু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, কিন্তু আবগে বোঙা বললেন যে এটা তাঁর দায়িত্ব ছিল না। মনে মনে আবগে বোঙার ওপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন শিংবোঙা। মারাংবুরু তখন তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে দিনের অর্ধেক সময় সূর্য অস্ত গেলেই তো আর এই সমস্যা থাকে না। দিন আর রাত থাকলে মানুষ 'আজ' আর 'কাল'-এর পার্থক্য বুঝবে। বুঝতে পারবে সময় আসলে কী!"

থামল আফ্রিতা, অক্ষর আর ইরফান মন দিয়ে ওর কথা শুনছে। গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা আছে মেয়েটার।

"শিংবোঙার খুবই পছন্দ হল মারাংবুরুর পরামর্শ," কফির কাপে একটা ছোট্ট চুমুক দিল আফ্রিতা, "তিনি সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকে আদেশ দিলেন দিনের অর্ধেক সময় অস্ত চলে যাওয়ার জন্য। সৃষ্টি করলেন নক্ষত্রগুলোকে। যাতে করে মানুষ রাতের বেলা আলো পায়। তারপর তিনি আবার ফিরলেন সূর্যের ভেতরে।

"বহুকাল পর আবার তাঁর ইচ্ছা হল পৃথিবীতে ফেরার। মানুষের রূপ ধরে আবার তিনি ফিরলেন, এবার রাতের বেলা। পৃথিবীতে এসে তো তিনি হতবাক। তারাগুলোর আলো এতই কম যে মানুষ রাতের

নিজেও কয়েকবার হোঁচট খেয়ে গেলেন। রাগের মাথাতে আবার তিনি ডাকলেন আবগে বোঙা আর মারাংবুরুকে। এবারও আবগে বোঙা বললেন এসব তাঁর কাজ নয়, তিনি শুধু মানুষের পেশা অনুসারে তাদের মধ্যে খাদ্য বন্টনের দায়িত্বে আছেন, রাতে বা দিনে মানুষ কবার পড়ল তাতে তার কিছুই যায় আসে না। মারাংবুরু আবার ক্ষমা চাইলেন সঙ্গে শিংবোঙাকে পরামর্শ দিলেন আলোর আর একটি একটি বড়ো উৎস সৃষ্টি করতে, যা রাতের মানুষকে আলো দেবে। শিংবোঙা বেজায় খুশি হলেন আর সৃষ্টি করলেন চান্দু মানে চাঁদকে। শিংয়ের আলো রাতের বেলা পৃথিবীর বুকে পৌঁছে দিতে লাগল চান্দু। শিং আর চান্দু দুটোই শিংবোঙার প্রতীক। ইন অ্যা নাটশেল এটাই সাঁওতাল কিংবদন্তির সৃষ্টির শুরুর ব্যাপারটা... আশা করি কেউ বিরক্ত হননি।"

"শুরুর দিকে একটু হয়েছিলাম, তবে এখন বেশ ভালোই লাগছে। আপনি এইসব বলছেন এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। থামলেন কেন? বলুন না," কফির কাপটা আবার হাতে তুলে নিল অক্ষর।

ইরফানও পিৎজা খাওয়া বাদ দিয়ে হা করে আফ্রিতার কথা শুনছে।

"হুম আচ্ছা," বলতে লাগল আফ্রিতা, "তো আবগে বোঙার ওপর শিংবোঙার রাগটা কিন্তু থেকেই গেল। আবগে বোঙার আবার এক ছেলে ছিল। দেবতার ছেলেও দেবতা হয়। সেই বোঙাটা ছিল কিছুটা লম্পট প্রকৃতির। মাঝে মাঝেই পৃথিবীতে এসে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করতো সে, গ্রিক মিথের জিউসের সঙ্গে মিল আছে ব্যাটার। তো এক সর্দারের ছিল অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। নিজের সখীদের নিয়ে পুকুরে গোসল করতে যেত মেয়েটি। একদিন ওই অবস্থাতেই তাকে দেখে ফেলে সেই লম্পট বোঙা। মাথা ঘুরে গেল ব্যাটার! সঙ্গে সঙ্গেই এক বিশাল পাখির রূপ ধরে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেল সে! হায় হায় করতে লাগল ওর সাথিরা।

"মেয়েটাকে স্বর্গে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল বোঙা। নানানভাবে বোঝাতে লাগল যে সে ওকে অনেক ভালোবাসে। একটা সময়ে মেয়েটাও পটে গেল। হাজার হোক এক বোঙা তুলে এনেছে তাকে! এখন তো দেবীই! সুখে-শান্তিতে থাকতে লাগল তারা। একটা সময়ে মেয়েটা গর্ভবতী হয়ে পড়ল। ওর খুব ইচ্ছা হল যে নিজের মা-বাবাকে দেখবে। বোঙাকে সে কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বোঙা খুশি মনেই মত দিল। এক শুভদিন দেখে পৃথিবীতে নেমে এল তারা। সঙ্গে করে পরিবারের জন্য নিল অনেক মাছ, মাংস আর হলুদ করে রান্না করা ভাত।

"মেয়ে আর বোঙা জামাইকে দেখে আনন্দে আত্মহারা সেই সর্দার আর তার বউ। গোত্রের সব লোকেরা এল তাদের দেখতে। সবাই ভেবেছিল যে মেয়েটা আর ফিরবে না। মেয়েটা সবাইকে দুপুরে খাবার দাওয়াত দিল, বলল যে তার স্বামী আর সে প্রচুর খাবার এনেছে। সবাই রাজিও হয়ে গেল। দুপুরবেলা সবাই খেতে বসলো, মেয়েটি ভাত, মাংস আর মাছ সাজিয়ে দিল। কিন্তু কেউ খাবার মুখে তুলল না! তুলবে কী করে? ভাত, মাংস আর মাছ কোথায়? তারা দেখতে পাচ্ছে শুধু পাথর আর ধুলাবালি সাজানো রয়েছে বড়ো বড়ো পাত্রে!

" 'এই খাবার আমাদের জন্য এনেছ তুমি মা?' নিজের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল সর্দার। 'হ্যাঁ, বাবা, খাচ্ছ না কেন তোমরা?' অবাক হয়ে বলল মেয়েটি। সর্দার বুঝতে পারল যে বোঙার জাদুর বলে তাদের মেয়ে পাথর আর ধুলাবালিকে

খাবার মনে করছে। সে যে বোঙা আর তারা যে মানুষ সেটা তার জামাই খুব ভালো করেই বুঝিয়ে দিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে একমনে শিংবোঙাকে ডাকতে লাগলেন সর্দার। কিছুক্ষণ পর প্রকট হলেন শিংবোঙা, তাঁকে সব কিছু খুলে বলল সর্দার। আবগে বোঙার ছেলের স্পর্ধা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন শিংবোঙা, আর আবগে বোঙার ওপর তো তাঁর আগে থেকেই রাগ উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্দাকে একটি বর্শা দিলেন আর বললেন এই বর্শা দিয়ে তোমার জামাইকে খুন কোরো। সাধারণত বোঙাদের মানুষেরা মারতে পারত না, কিন্তু শিংবোঙার দেওয়া সেই বর্শা ছিল বিশেষ একটা বর্শা। ওতে দেবতাদেরও প্রাণ যেতে পারত। অপমানে এতোটাই ক্রোধান্ধ হয়ে গেছিলেন সর্দার যে তিনি কোনো কিছু না ভেবেই বর্শাটা নিয়ে প্রবেশ করলেন মেয়ের ঘরে। ওরা দুজন তখন ঘুমাচ্ছিল। সর্দার সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্শাটা বসিয়ে দিলেন বোঙার পিঠে। ভয়াবহ আর্তনাদ করে উঠল বোঙা। জেগে গেল সর্দার মেয়ে।"

"তারপর?" উত্তেজনার বশে একটা পিৎজা তুলে নিয়েছে অক্ষর।

"বোঙাকে বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সর্দারের মেয়ে। আহত অবস্থায় বোঙা বলল, 'তুচ্ছ মানব, তুই আমাকে হত্যা করলি? কিন্তু আমার এক অংশ এই পৃথিবীতে নতুন করে জন্মাবে! সে প্রতিশোধ নেবে, আমি অভিশাপ দিলাম, তোর পুরো গোত্র শেষ হয়ে যাবে।' তারপর সে মরে গেল। হুট করেই থেমে গেল সর্দারের মেয়ে, কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল সে। এর পর আর কখনোই কারও সঙ্গে কোনো কথা বলেনি সে। অনেক চেষ্টা করেও ওর মুখ দিয়ে আর কেউ কোনো শব্দ বের করতে পারেনি।

"যাই হোক মেয়েটা গর্ভবতী ছিল। কমাস পর এক অদ্ভুত সন্তানের জন্ম দিল সে। ছোট্ট বাচ্চাটার মাথাটা ছিল দানবীয় ধরনের।, সবার চোখের সামনেই সামনেই দৌড়াতে দৌড়াতে জঙ্গলে ঢুকে যায় বাচ্চাটা। কিছুক্ষণ পরেই মারা যায় সর্দারের মেয়ে। এর পরের দিন সকালে গ্রামের সামনে সর্দারের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। গ্রামের পুরুষদের মৃতদেহ পাওয়া যেতে থাকে এখানে-সেখানে, নিখোঁজ হতে থাকে গ্রামের যুবতি মেয়েরা। একটা সময়ে ওই গ্রামের পাশের গ্রামেও এমন হতে থাকে, তারপর তার পাশের... সব গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে এক নতুন আতঙ্ক। এক অপদেবতার আতঙ্ক, যে অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক দেবতা। সেই পিশাচের নাম সাঁওতালেরা দিয়েছে 'গুদ্রবোঙা' বা 'বামন অপদেবতা'।

"সবাই মিলে শিংবোঙার কাছে প্রার্থনা শুরু করল, তিনি যেন তাদের রক্ষা করেন এই পিশাচের হাত থেকে। দয়া হল শিংবোঙার। ততদিনে সেই অপহৃত মেয়েদের গর্ভে জন্ম নিয়েছে আরও অনেক গুদ্রবোঙা। সব গুদ্রবোঙাকে তিনি সরিয়ে দিলেন জঙ্গলে, দিনের বেলাতে তাদের ক্ষমতাকে একদম কমিয়ে দিলেন। সেই থেকে ওরা জঙ্গলেই থাকে। আমাদের অর্কিড ভিলাতে যে পিশাচটার প্রভাব রয়েছে সেটাও একটা গুদ্রবোঙা। সাঁওতালদের বামন অপদেবতা। সেই সব খারাপ ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী।

"আচ্ছা! ছোটো বাচ্চা দেখতেন আফতাব আঙ্কেল। কিন্তু জঙ্গল..." প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল অক্ষর।

"আহা, এখনও বাকি আছে," ওকে থামিয়ে দিল আফ্রিতা, "লোভ জিনিসটা খুব খারাপ। লোভের বশে পড়ে কিছু মানুষ এই অপদেবতাদের সাধনা শুরু করল। এরা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য অনেকটাই পরিবর্তন করতে পারে, বিনিময়ে মানুষদেরও এদেরকে কিছু দিতে হয়।"

"তবে কি অর্কিড ভিলাতে কেউ গুদ্রবোঙার সাধনা করেছে?"

"ব্যাপারটা ঠিক অমন না। শুনুন, গুদ্রবোঙা সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। নিম্নশ্রেণির, মধ্যম শ্রেণির আর উচ্চ শ্রেণির। যদিও সব গুদ্রবোঙা দেখতে অনেকটা একই রকম হয়। সাঁওতাল সর্দারেরা সাধারণত নিম্নশ্রেণির গুদ্রবোঙাদের সাধনা করে। এরা সরাসরি মানুষকে গুপ্তধনের সন্ধান দেয়, কারও ক্ষতি করতেও এদেরকে ব্যবহার করা যায়। এরা নিজেদের রূপ পরিবর্তন করতে পারে না, ওই বিদঘুটে রূপেই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এদের কোনো বিবেক-বুদ্ধিও নেই। সাধারণত ছোটো বাচ্চা-কাচ্চা এবং যুবতি মেয়েদের বিনিময়ে এরা কাজ করে। তবে এদের বশও করা যায়। অনেক সাঁওতাল সর্দারই ছোটো ছোটো পাথরের মধ্যে এদেরকে বন্দি করে রাখে, তখন কিছু না দিয়েও এদেরকে দিয়ে কাজ করানো যায়। এরা সরাসরি মানুষকে আঘাত করে থাকে। এদেরকে খুব সহজেই শেষ করে দেওয়া যায়।

"মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙারা বেশ বুদ্ধিমান হয়। এদেরকে বশ করা যায় না, সাধারণত উচ্চশ্রেণির গুদ্রবোঙাদের অধীনে থাকে এরা। এরাই মূলত নিজেদের রূপ পরিবর্তন করতে পারে। অর্কিড ভিলাতে যে গুদ্রবোঙাটির উৎপাত সে মূলত মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙা। এরা মানুষকে সরাসরি আঘাত করে না, ভয় দেখায়। ভোরের আলোতে এরা নিজের রূপে থাকতে পারে না, অন্য কোনো রূপ ধরে থাকতে হয়। আবার কোনো একটি রূপে এরা একটা নির্দিষ্ট সময়ই থাকতে পারে। এর পর রূপ পরিবর্তন করতে হয়। আপনি বলেছিলেন না, হাবিব মিয়া আর বাবুলকে কখনও একসঙ্গে দেখা যেত না? এই কারণেই দেখা যেত না।"

"গড! এই তাহলে ব্যাপার?"

"নিম্নশ্রেণি আর মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙাদের একটা বড়ো দুর্বলতা হল রসুন। এমন না যে এরা রসুন দিয়ে এদেরকে মেরে ফেলা যায়। বরং রসুনের গন্ধে এদের দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে আর একটা সময়ে এরা অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। তাই এরা রসুন থেকে দূরে থাকে। মধ্যমশ্রেণির গুদ্রবোঙাদেরও খুব সহজেই শেষ করা যায়।"

"থামুন থামুন," আবার প্রায় লাফিয়ে উঠল অক্ষর, "ঐশী আমাকে বলেছিল যে হাবিব মিয়া নাকি একবার মুন আপুরে রসুনের চপ আর সাহানা আন্টিকে রসুন এনে দিয়েছিল না। অবশ্য পরে ওকে একবার আমিও ডিম আনতে বলেছিলাম, সেদিন শরীরটা খারাপ লাগছিল। সেদিন ওটাও এনে দেয়নি। ও নাকি কাউকে কিছু এনে দেয় না।"

"এসব তো আমাকে বলেননি! যাই হোক, ব্যাপার না। সে রসুনে ভয় পায়, কিন্তু পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই পরে কাউকেই আর কিছু এনে দেয়নি, এই তো!"

"আচ্ছা, বললেন না যে মধ্যম গুদ্রবোঙাদের শেষ করা সহজ?"

"অর্কিড ভিলার মূল সমস্যাটা কোনো মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙা নয়। আমি সব বলছি। আচ্ছা, এবার আসি উচ্চশ্রেণির গুদ্রবোঙাদের কথাতে। এরা মহাক্ষমতাশালী হয়, এদের ক্ষমতা এতোই যে অনেকে এদেরকে মিথোলজিক্যাল দেবতাদের সঙ্গেও তুলনা করে। এদের অধীনেই নিম্নশ্রেণি আর মধ্যমশ্রেণির গুদ্রবোঙারা থাকে। এদের বশ করা যায় না, মূলত এদেরই সাধনা করতে হয়। এদের সাধনার উপায় হলো 'সমাধি' প্রতিষ্ঠা করা।

"সমাধি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই গুদ্রবোঙার একটি ছোটো মূর্তি বানাতে হয়। তারপর পুকুর কাটার মতো একটি বেশ বড়ো চারকোনা গর্ত করতে হয়। সেই গর্তের ভেতর আর একটি ছোট গর্ত করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হয় গুদ্রবোঙার মূর্তি। মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর পাঁচজন মানুষকে সেখানে বলি দিতে হয়। দুজন পুরুষ, দুজন নারী আর একজন হিজড়া। শিরচ্ছেদ করে তাদের শরীরগুলো সেখানেই রেখে দিতে হয় আর মাথাগুলো মূর্তিটার বেদিতে ওটার পায়ের কাছে রাখতে হয়। এর পর জায়গাটা মাটিচাপা দিয়ে দিতে হয়। এর পর সাতদিন অপেক্ষা করতে হয়। যদি সমাধি ঠিকঠাক প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে সাতদিন পর সকালে উঠে দেখা যাবে যে সেই বড়ো গর্তটা পানিতে ভরে গেছে আর সৃষ্টি হয়েছে একটা পুকুরের। আর যদি এমনটা না হয় তবে বুঝতে হবে কোনো একটা ভুল হয়েছে, গুদ্রবোঙা সমাধি গ্রহণ করেনি। এইভাবেই গুদ্রবোঙার সমাধি সৃষ্টি হয়।

"শোনা যায় আগে অনেক জমিদারই এইভাবে গুদ্রবোঙার সমাধি সৃষ্টি করতেন। সমাধি সৃষ্টির পর আর কিছু করতে হয় না। যে সমাধি সৃষ্টি করে তার আর্থিক অবস্থার খুবই উন্নতি হয়। সে যে কাজে হাত দেয় সেই কাজেই সোনা ফলে। তার বংশধরেরাও একই সুফল ভোগ করে। সমাধির পুকুরেও অলৌকিক কিছু ঘটে না। এখানে মানুষ নির্বিঘ্নেই গোসল করতে পারে। একশো বছর পর পুকুরটা ভরাটও করে ফেলা যায়। তবে একশো বছর হওয়ার আগে ভরাট করতে গেলে পুকুর তো ভরাট হবেই না বরং যে ভরাট করতে যাবে তার বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। অর্কিড ভিলার নীচেও ঠিক এমনই এক গুদ্রবোঙার সমাধি রয়েছে। যা সম্ভবত বহু আগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কে করেছিল তা এখন আর জানা সম্ভব না, কারণ বহু বছর আগের কথা। তবে একটা ব্যাপার কী জানেন? সমাধির সেই জমির বিক্রি করে দিলেও তার বংশই সমাধির সুফল ভোগ করবে, যে সমাধিটা প্রতিষ্ঠা করেছিল। গুদ্রবোঙা তো আর দলিলের মারপ্যাঁচ বোঝে না।"

কফির কাপে টানা কয়েকটা চুমুক দিল আফ্রিতা। অক্ষরের চোখে বেশ কিছু প্রশ্ন খেলা করছে। ইরফান অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"একশো বছর পর পুকুর ভরাট করা হলে," মোবাইলটা বের করে নোটিফিকেশন চেক করতে লাগল আফ্রিতা, "সেই জায়গাতেও কোনো সমস্যা হয় না। ওখানে খেলাধুলা, ঘোরাঘুরি, দোকানপাট এগুলো করা যায়। কিন্তু সাপের খেলা দেখাতে আসা লোকটার ব্যাপারটা একটু আলাদা। সম্ভবত সে নিজেও একজন কালো জাদুকর ছিল। নিম্নশ্রেণির তন্ত্রসাধকদের মধ্যে একটা নীতি থাকে। নিজের চাইতে ক্ষমতাবান কোনো শক্তির এলাকাতে গিয়ে জাদু দেখানোকে এরা বিরাট বড়ো অপরাধ মনে করে। লোকটা ওই জমিতে পা রেখেই বুঝতে পারে যে ওখানে তার চাইতে অনেক শক্তিশালী এক ক্ষমতা বিরাজমান রয়েছে। তাই সে

চলে যায়। কিন্তু ওই যে, অপরাধ! নিম্নশ্রেণির তন্ত্রের প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম খুবই কড়া। এখানে জাদু দেখাতে এসে সে যে অপরাধ করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল আত্মহত্যা করে।"

"নিম্নশ্রেণির তন্ত্র বলতে?" অনেকক্ষণ পর কথা বলল ইরফান।

"নিম্নশ্রেণির তন্ত্র হল কালো তন্ত্র, এইগুলো দিয়ে শুধু পিশাচদেরই বশ করা যায় আর মানুষের ক্ষতিই করা যায়। আমাদের দেশে তন্ত্র বলতে মূলত এরই চর্চা হয়। সস্তা কিছু ক্ষমতার লোভে মানুষ এর চর্চা করে। কিন্তু উচ্চতন্ত্রের সামনে এইসব ক্ষমতা আসলে কিছুই নয়। তারানাথ তান্ত্রিক পড়েছ? গল্পে গল্পে এই ব্যাপারটা বেশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিল বিভূতিভূষণ আর তাঁর ছেলে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

মাথা নাড়ল ইরফান। সে পড়েনি।

"পড়ে নিও," মোবাইলটা টেবিলে রাখল আফ্রিতা, "সমাধির ওপরের জমিতে যখন কেউ স্থায়ীভাবে থাকার আয়োজন করে কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তখন কিন্তু সমস্যাটা শুরু হয়। উচ্চশ্রেণির গুদ্রবোঙারা এটা সহ্য করতে পারে না। আনোয়ার সাহেব বলেছেন না যে উনার বাবা বাড়ি তৈরি শুরু করার কথা চিন্তা করার পরেই টাকা পয়সার টানা-টানি শুরু হয়েছিল? উনিও বাড়িটা নিজের ইচ্ছামতো শেষ করতে পারেনি, কারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন? এগুলো গুদ্রবোঙার সমাধিতে হস্তক্ষেপ করার কারণেই হয়েছে। একটু আগে বললাম না, যে সমাধির সুফল যে ওটা প্রতিষ্ঠা করেছিল সে বা তার বংশধরেরা ভোগ করে? কুফলের ব্যাপারটা একটু আলাদা। এইক্ষেত্রে কেউ যদি সমাধির ক্ষতি করতে যায় তবে গুদ্রবোঙা তার ক্ষতি করে, প্রতিষ্ঠাকারীর বংশের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তবে প্রতিষ্ঠাকারীর বংশের কেউ যদি ক্ষতি করতে যায় তবে আবার তাদের ক্ষতি হবে।

"একটা সমাধি তৈরি পর সেটাকে নিজের বলে বেছে নেয় কোনো উচ্চশ্রেণির গুদ্রবোঙা। অর্কিড ভিলার সমাধিটাকে যে গুদ্রবোঙা বেছে নিয়েছিল তার আদেশে তারই অধীনের এক মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙা হাবিব মিয়া এবং বাবুলের রূপ ধরে এসে গার্ডের চাকরি নিল। উদ্দেশ্য, এখানে থাকা মানুষদের ভয় দেখিয়ে বিদায় করে দেওয়া যায়। সমাধি রক্ষার জন্য কখনও নিম্নশ্রেণির গুদ্রবোঙাদের পাঠানো হয় না, ওদের কাজ ওই কিছু মানুষের হয়ে বেগার খাটা। ওহ একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম, এই যে আপনাদের পাড়াতে লোক এত কম বা মানুষ মানুষের সঙ্গে মেশে কম, এটার কারণ হল ওখানে গুদ্রবোঙার সমাধি থাকা। যে এলাকাতে গুদ্রবোঙার সমাধি থাকে, সে অঞ্চলের মানুষ পুরোপুরি মিশুক হয়ে উঠতে পারে না।

"গুদ্রবোঙার সমাধির একটা অশুভ প্রভাব রয়েছে। যেটা বয়স্ক মানুষদের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ ফেলে। ঠিক এ কারণেই অক্ষর সাহেবের মা বলতেন যে ওই বাড়ি ভালো না। যাই হোক, মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে, এরা প্রথমেই ভয় দেখায় দুর্বলচিত্তের মানুষদের। একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, শুধুমাত্র আফতাবকেই কিন্তু সে সরাসরি একটা বাচ্চার রূপ ধরে ভয় দেখিয়েছে, তাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিনের বেলা! বাকিদের ক্ষেত্রে সে

আপনাদের মধ্যেই কারো রূপ নিয়েছে, ধোঁকা দিয়েছে। ভয় কিন্তু দেখায়নি, ভয় আপনারা পেয়েছেন ব্যাপারটা বুঝে ওঠার পর। যদিও সাহানা আর ফাহাদ সাহেবের সঙ্গে শেষে এসে কী হয়েছিল তা আমরা জানি না!"

"হ্যাঁ!" বলে উঠল অক্ষর, "আফতাব আঙ্কেল দিনের বেলাতেও ভয় পেয়েছেন!"

"দিনের বেলাতে গুদ্রবোঙাদের ক্ষমতা কম থাকে। তাই সে সরাসরি আপনাদের সামনে ভেলকি না দেখিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল আফতাব আঙ্কেলকে ভয় দেখিয়েছে। ওই সময়ে সে অত সহজে আপনাদের রূপ ধরতে পারত না। রূপ পরিবর্তন করতে ওর একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। হাবিব মিয়া কিংবা বাবুলের রূপ ক্রমাগত ধরে ধরে ওটা ওর আয়ত্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু আপনাদের কারও রূপ ধরা অনেক কঠিন ব্যাপার ওর জন্য, বিশেষ করে সকালবেলা। এক রূপ থেকে আর এক রূপে যাওয়ার মাঝখানে গুদ্রবোঙাকে আবার নিজের আসল রূপে আসতে হয় কিন্তু! সবমিলিয়ে অনেক সময়ের ব্যাপার। তাই সে নিজের ছোট্ট শরীরটার সঙ্গে শুধু একটা সাধারণ বাচ্চার মাথার রূপ কোনোভাবে সৃষ্টি করে আফতাব সাহেবকে ভয় দেখাতো।"

"নিজের আসল রূপে কেন ভয় দেখাত না? ওটা তো আরও বেশি ভয়ংকর! ওই ভয়াবহ মাথাটা আর কী!"

"মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙারা নিজেদের আসল রূপ যদি কোনো মানুষকে দেখিয়ে ফেলে তবে সে ওই মানুষের সামনে যতই ছদ্মবেশে আসুক না কেন মানুষটা তার আসল রূপই দেখতে পাবে। যদি সে আফতাব সাহেবের সামনে আসল রূপে দেখা দিত তবে পরে তিনি হাবিব মিয়া কিংবা বাবুলকেও ওই রূপেই দেখতেন। তাই মাথার জায়গাতে সে একটা ছোটো বাচ্চার মাথা বসিয়ে নিত। শুধু তাই নয়, গুদ্রবোঙার এই রূপ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা যদি কেউ দেখে ফেলে সেক্ষেত্রেও ওর কিছু সমস্যা হয়, পরে আসছি সে ব্যাপারে।

"আফতাবের ভয় পাওয়াটা আপনারা তেমন গুরত্ব দিলেন না। কারণ উনি তো মানসিকভাবে অসুস্থ। তারপর শুরু হল খেলা। সে আপনাদের মধ্যেই অনেকের রূপ ধরে আপনাদের সামনে দেখা দিতে লাগল। আপনারা ভয় পেয়ে গেলেন। সাহানা দেখা করলেন বাড়িওয়ালার সঙ্গে, তিনি কিছুই মানলেন না। পাড়ার লোকেরাও বলল এমন কোনো ঘটনা নেই। সাহানার মৃত্যু ছিল একটা বড়ো ধাক্কা.. আর উনার মৃত্যুর জন্য ওই গুদ্রবোঙাটাই দায়ী!"

"আমি জানি!" মাথা নীচু করল অক্ষর।

"ওর উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানো। সেদিন রাতে সাহানাকে সম্ভবত একটু বেশিই ভয় দেখিয়ে ফেলেছিল সে। আপনার সুধাকর দা এবং মুনের ডাকা আসগর সাহেব দুজনেই বলেছিলেন যে অশুভ একটা প্রভাব আছে। কিন্তু উনারা গুদ্রবোঙা বিষয়টার সঙ্গে পরিচিত নন দেখে ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। আমি প্রথম এসে এই বাড়ির পানিতেই গুদ্রবোঙার ছায়া পেয়েছিলাম। যাই হোক, ফাহাদ সাহেব আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘাড়ত্যারামি করেছেন, উনি মানেননি কিছু। আসগর সাহেব যে ঘর থেকে বের হতে মানা করেছিলেন সেটাও আমলে নেননি। কিন্তু ওই দুর্ঘটনার দিন রাতে নীচ থেকে এসে উনার মতামত পরিবর্তন হয়েছিল, তাই না? উনার স্ত্রী এটা ধারণা করেছিলেন যে নীচে উনি কিছু একটা দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, মুন আপু এটাই বলেন। উনি নীচ থেকে এসে বাড়ি ছাড়তে রাজি হয়ে গেছিলেন।"

"একটা মধ্যমশ্রেণির গুদ্রবোঙার রূপ পরিবর্তন মানে এক রূপ থেকে আর এক রূপে যাওয়ার প্রক্রিয়া যদি কোন মানুষ দেখে ফেলে, তবে সেই মানুষের সামনে এর আগে যে নকল রূপগুলো ধরে সে এসেছিল সেই রূপগুলো আর ধরতে পারবে না সে! কোনোদিনই না, কারও সামনেই না। আমার মনে হয় ফাহাদ সাহেব সেদিন রাতে ওর রূপ পরিবর্তন করাটাই দেখে ভয় পেয়েছিলেন। যেহেতু ফাহাদ সাহেব ওর শুধু দুটো নকল রূপ দেখেছে, হাবিব মিয়া আর বাবুল। এই রূপদুটো সে আর কোনোদিন ধরতে পারবে না। এই জন্যই হাবিব মিয়া আর বাবুলকে ওই দিনের পর আর পাওয়া যায়নি!"

"এজন্যই কি সেদিন রাতে ফাহাদ ভাইকে?"

"হ্যাঁ, অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে আসগর সাহেবের বলে দেওয়া কথা না মেনেই ঘর থেকে বের হয়েছিলেন তিনি, আর যার ফলাফল... যাই হোক, এই হল অর্কিড ভিলার রহস্যের মোটামুটি একটা সমাধান।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ রইল।

"ওই অপদেবতাটাকে শায়েস্তা করবেন না আপু?" বলল ইরফান। পিৎজাটা পুরো শেষ করে এনেছে সে।

"হ্যাঁ, করতে হবে। তবে সমস্যা শুধু ওই অপদেবতাটা না। বড়ো সমস্যা হল সমাধিটা, তারপর সমাধির তথাকথিত পবিত্রতা রক্ষা করতে আসা গুদ্রবোঙাটা। ওটাকে শেষ করা খুবই সহজ, তবে এখন যদি ওকে আমরা শেষ করে দিই তবে সাত থেকে আটদিন পর ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সেই উচ্চশ্রেণির গুদ্রবোঙাটা আসবে, যে এই সমাধিটাকে নিজের বলে বেছে নিয়েছিল। ওকে হারানো প্রায় অসম্ভব!"

"তবে উপায়?" অক্ষরের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

"প্রথমে সমাধিটাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। তারপর ওই গুদ্রবোঙাটা মারতে হবে। আর এর জন্য আপনার সাহায্য লাগবে অক্ষর সাহেব।"

"আমার সাহায্য?"

"অর্কিড ভিলাতে যারাই বসবাস করতে গিয়েছিল সবার ওপরেই রয়েছে গুদ্রবোঙার সমাধির অভিশাপ। আপনার ওপরেও, ওই সমাধিকে নিষ্ক্রিয় করতে একটা কাজ করতে হবে আর এই কাজ করতে পারে শুধুই এমন একজন মানুষ যার ওপর অভিশাপ রয়েছে।"

"কী করতে হবে আমাকে?"

"সেটা পরে বুঝিয়ে বলব। তেমন কঠিন না, আবার সেই সময়ে জিনিসটা কঠিনও লাগতে পারে আপনার কাছে। কাল অথবা পরশু আমরা সবাই অর্কিড ভিলাতে যাবে। ওটার একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট আছে না? যেটা ভাড়া হয়েছিল না? ওখানেই কাজগুলো করতে হবে। কারণ গুদ্রবোঙার সমাধি বিনষ্টকরণের জন্য এমন একটা জায়গায় উত্তম যেখানে সবচেয়ে বেশিদিন মানুষের পা পড়েনি। আর ওই ভবনে ওইটাই অমন জায়গা।"

"বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে হবে, আপনার কী মনে হয়? উনি এসব বিশ্বাস করবেন? চাবি দেবেন আমাদের?"

"রাতের বেলা যাচ্ছি, সমস্যা নেই! চাবি লাগবে না, এমনিই ঢুকতে পারব।"

"চাবি ছাড়া কী করে? দরজা ভেঙে ঢোকার প্ল্যান করছেন নাকি?"

"আরে নাহ, একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে, আপনি আসছেন তো, নাকি?"

"হ্যাঁ আসব, কিন্তু ভেতরে ঢুকব কী করে?"

"আসুন, তারপর দেখবেন," রহস্যময় হাসি খেলে গেল আফ্রিতার চোখে, "আচ্ছা, ইরফান তোমার টিউটর, আরিফ সাহেব। উনি ওই মেসটাতে কবে এসেছেন? ইনারা বাড়ি ছাড়ার আগে না পরে?"

"পরে, বেশ পরে। এই প্রশ্ন কেন আপু?" অবাক হল ইরফান।

"না তেমন কিছু না। শোনো এই ব্যাপারে কারো সঙ্গে তেমন আলোচনা করো না। কথা যাতে না ছড়ায় ওকে?"

"আচ্ছা আপু ঠিক আছে।"

"আচ্ছা মিস. আফ্রিতা, সেই গুদ্রবোঙাটা এখন কোথায়?" প্রশ্ন করল অক্ষর।

"ওটা? ওটা এখনও অর্কিড ভিলার আশেপাশেই আছে, হয়তো নতুন কোনো রূপ ধরে। এজন্যই তো আমি এই রেস্টুরেন্টে ডেকেছি আপনাদের। জায়গাটা আপনার অফিসের কাছে, প্লাস এটা ওই এলাকা থেকে বহু দূরে। মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙারা যে জায়গা পাহাড়া দিতে আসে তার চাইতে খুব বেশি দূর যেতে পারে না। আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে হাবিব মিয়ার দেখা কিন্তু হয়েছিল ওই এলাকার মোড়ের এক সিকুরিটির অফিসে।

"যাই হোক আপনারা যতটা পারবেন ব্যাপারটা গোপণ রাখবেন। ইরফান তুমি কিন্তু তোমার টিউটরকেও কিছু বলবে না। আমি জানি উনি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন।"

কোন এক অজানা কারণে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ইরফানের।

***

স্ট্রিট লাইটের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে চুপচাপ গাড়িগুলো দেখছে অক্ষর। রহস্যময় লাগছে ওগুলোকে।

আবার সেই অর্কিড ভিলাতে যেতে হবে ওকে। সেই অভিশপ্ত জায়গাটা।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে মুনের নম্বরে ফোন করল ও।

"হ্যাঁ বলো অক্ষর," প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা ধরল মুন।

"অফিসের চাপ চলছে তো আপু, তাই যাওয়া হয়নি একদিন, কেমন আছেন ভাইয়া?"

"যেমন ছিল তেমনই," দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুন, "তেমন কোনো উন্নতি নেই।"

"ডাক্তার কিছু বলেছেন?"

"ওইতো, কবে নাগাদ ভালো হবে বা আদৌ ভালো হবে নাকি উনারা বলতে পারছেন না! যাই হোক, তোমরা ভালো আছ?"

"আমরা আছি, আপনি কেমন আছেন আপু?"

"এইতো অফিস থেকে ক্লিনিকে গেছিলাম, ওকে দেখলাম, খোঁজ-খবর নিলাম।

এইমাত্র বাড়ি এলাম।"

"ক্লিনিকের বিল সম্ভবত অনেক বেড়ে চলেছে..."

"হ্যাঁ, অনেক আসছে। ওটা নিয়েই চিন্তাতে। দেখি... কতদিন টানতে পারব জানি না।"

"কোনো হেল্প লাগলে,"

"পাগল ছেলে। বাদ দাও, তোমরা ভালো থেকো। তাহলেই হবে।"

"আপনিও ভালো থাকবেন আপু," ফোনটা রেখে দিল অক্ষর।

অর্কিড ভিলাতে যেতেই হবে ওকে। ওই শয়তান অপদেবতার শেষ না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাবে না ও।

***

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সুলতানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মোবাইল রিচার্জ করছে ইরফান। আফ্রিতা আর অক্ষরের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে তার মাথার ভেতর শুধুই সেই অপদেবতার কথাই ঘুরছে।

"ইরফান আঙ্কেল, আপনার মাস্টার লোকটা কিন্তু ভালো না," টাকা নিতে নিতে বলল সুলতান।

"কেন? কী হল আবার।"

"মেসেও নাকি কারো সঙ্গে তেমন মিশে না, সারাদিন দরজা লাগিয়েই থাকে। এক-দুইবার বের হয় মাঝে মাঝে।"

"তাই নাকি? হুম," চুপচাপ বাড়ির দিকে এগোতে লাগল ইরফান।

ইরফান বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরিফ। ও ভেবেছিল আজ হয়তো ওরা আবার অর্কিড ভিলাতে যাবে।

চুপচাপ মেসের দিকে রওনা দিল সে।

***

একটা বিরাট পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মুন। পুকুরটা ঠিক মাঝখানে মস্তবড়ো একটা প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ফাহাদ। ওকে ঘিরে ধরে আছে কতগুলো মুণ্ডুহীন মানবশরীর।

অনেক কষ্ট হচ্ছে ফাহাদের, অনেক।

ইশারা করে মুনকে ডাকছে ও।

নিজের সর্বশক্তি দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করল মুন। কিন্তু পারল না, ওর শরীরটা যেন আটকে গেছে!

ঘুমটা ভেঙে গেল মুনের।

অফিস থেকে বাড়ি এসে তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। যেদিন থেকে ফাহাদ কোমাতে গেছে তারপর প্রতিদিনই এই স্বপ্নটা দেখছে সে।

কী অর্থ এর? এর সঙ্গেও কি অর্কিড ভিলার সেই অতিপ্রাকৃত শক্তির কোনো সম্পর্ক আছে?

কিছু জানে না মুন! ওই শক্তিটাকে কেউ তাড়াতে পারবে না! কেউ না!

এই স্বপ্নের ব্যাপারে কাউকে বলেনি মুন। আজও সন্ধ্যার দিকে অক্ষর ফোন করেছিল, তাকেও কিছু বলেনি সে।

***

"মা, কালকে তো চল, বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের মিটিং, তুই কোম্পানির চেয়ারম্যান, তুই না থাকলে কেমন লাগে না?" কপট রাগ দেখিয়ে বললেন মিসেস. রায়হান।

"মা ওইসব মিটিং আমার ভালো লাগে না, আর আমি তো নামেমাত্র চেয়ারম্যান। তুমিই ওসব সামাল দাও.." হাসল আফ্রিতা।

"আর কতদিন এইভাবে চালাব আমি? তুই কি কোনদিনই দায়িত্ব বুঝে নিবি না?"

"নেব হয়তো, তবে এখন না, কাল অথবা পরশু তো নয়ই।"

"এগুলো আর কতদিন করবি? তোর বাবাও তো এইসব করতেন। ওর মৃত্যু..."

"মা শোনো," হাত তুলে উনাকে থামিয়ে দিল আফ্রিতা, "বাবা এসব করতেন শুধুই নিজের জন্য। মানুষকে কোনোদিন সাহায্য করেননি উনি। আমি মানুষকে সাহায্য করতে চাই।"

"তোর সঙ্গে কথা পারব না, কিন্তু কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে তো আমি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করতেই পারি। কালকের মিটিংয়ে থাকুক প্লিজ মিস. চেয়ারম্যান," আফ্রিতা হাত ধরলেন মিসেস. রহমান।

"কাল নয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবা, কাল নয়। গুডলাক ফর ইয়োর মিটিং!"

"হুম টেবিলে খাবার রাখা আছে, খেয়ে নিস," গজরাতে গজরাতে চলে গেলেন মিসেস রায়হান।

মৃদু হেসে নিজের ঘরে প্রবেশ করল 'রায়হান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ'র চেয়ারম্যান আফ্রিতা রায়হান।

ঘরটা সবসময়ই আধো-অন্ধকার থাকে। বিছানার পাশে রাখা পানির গ্লাসটা তুলে নিয়ে মেঝেতে রাখল সে।

তারপর ড্রয়ার থেকে একটা ছোটো কৌটা বের করে সেটার মুখ খুলল। কৌটাটা খালি। খালি সেই কৌটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর কৌটার মুখটা বন্ধ করে নিজের ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা ডুবাল সেই গ্লাসে।

নীল হয়ে গেল গ্লাসের পানি।

"পরশু।" আপনমনে বলে উঠল আফ্রিতা।

***

আজও কিছু হল না। মনে মনে বেশ হতাশ আরিফ।

সমস্যা নেই, এখানেই আছে ও। ওর নজর এড়িয়ে কেউ অর্কিড ভিলাতে ঢুকতে পারবে না। সবসময় নজর রেখে চলেছে ও বাড়িটার ওপর।

***

"তবে তুমি যাবে?" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল ঐশী।

"হ্যাঁ," ছোট্ট করে উত্তর দিল অক্ষর।

"আমার খুব ভয় লাগছে অক্ষর, যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়!"

"আফ্রিতা বলেছে আমাকে ওর দরকার।"

"আচ্ছা, ওই মেয়েটাকে আমাদের দেখা দুঃস্বপ্নগুলোর কথা না বলে ভুল করিনি তো আমরা?"

"না, সম্ভবত ও জানে ব্যাপারটা!"

"মানে? ও কী করে জানবে!"

"ও অনেক কিছুই জানে। এই মেয়েটা অন্যরকম ঐশী.. ওই বাড়ি থেকে চলে আসার পর থেকে কেন আমরা ওই স্বপ্নগুলো দেখি তার কারণ সম্ভবত আমি বুঝতে পেরেছি... আফ্রিতা বলেছে আমরা সবাই অভিশপ্ত... যারা ওই বাড়িতে বসবাস করতে গেছিলাম। ওই কারণেই সম্ভবত স্বপ্নগুলো আসে। আমাদের মতো স্বপ্ন সম্ভবত মুন আপু, আফতাব আঙ্কেলও দেখেন। এমনকি..."

"কী?"

"ফাহাদ ভাইয়াও!"

"কী!"

"হ্যাঁ, খুব সম্ভবত ব্যাপারটা এমনই। আমাকে এর শেষ দেখে ছাড়তে হবে।"

অক্ষরের ফোনটা বেজে উঠল।

"আফ্রিতা ফোন দিয়েছে," স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল অক্ষর।

"ধরো," মাথা নীচু করে বলল ঐশী।

"হ্যালো!"

"হ্যাঁ, অক্ষর সাহেব, পরশু রাতে ব্যস্ত নন তো?" আফ্রিতার গলাটা কেমন যেন গম্ভীর শোনাচ্ছে।

"না। পরশু, কেন?"

"কাল বৃষ্টি হবে, আকাশে মেঘ থাকবে, চাঁদটা ঠিকমতো দেখা যাবে না। তাই পরশুই।"

"আবহাওয়া বার্তা দেখলেন নাকি? ওদের কথা কিন্তু সবসময় ঠিক হয় না।"

"হুম আবহাওয়া বার্তাই বলতে পারেন, তবে আপনি যে ধরনের বার্তার কথা বলছেন সে ধরনের না। এই বার্তা ভুল হবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অক্ষর, তারপর বলল, "আমাদের কাজটার সঙ্গে কি চাঁদের সম্পর্ক আছে?"

"হ্যাঁ, শিং আর চান্দু মানে সূর্য আর চাঁদ, শিংবোঙার প্রতিমূর্তি। গুদ্রবোঙার সমাধি ভাঙতে এই দুটির উপস্থিতি থাকা দরকার। একটা প্রকৃত উপস্থিতি আবশ্যক, অন্যটার আত্মিক উপস্থিতি থাকলেও চলে।"

"বুঝলাম না... আত্মিক উপস্থিতি মানে?"

"গুদ্রবোঙার সমাধি রাতে ভাঙতে হয়, তাই আমরা চাঁদের প্রকৃত উপস্থিতি পাব আর সূর্যের আত্মিক..."

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না কিছুই।"

"পরশু আসুন তবে, তাহলেই হবে। আমি ইরফানকে জানিয়ে দিচ্ছি তবে,

ছেলেটা বেশ উৎসাহী।"

"আচ্ছা।"

সেদিন বেশ কয়েকটা চ্যানেলের রাতের খবরের 'আবহাওয়া বার্তা' অংশটা বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল অক্ষর। অন্যদিন যেখানে এই ফিচারটা আসলেই সে চ্যানেল পালটে দিত।

কোনো চ্যানেলেই পরের দিন বৃষ্টির কথা বলল না, বরং একটা প্রখর রোদে ভরা দিনেরই কথা বলা হলো।

***

সকাল নটা বাজে, গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে অফিস ভবনের সামনে পৌঁছোলো অক্ষর। অন্যদিনের চাইতেও অনেক বেশি গরম। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই।

তবে আফ্রিতা যে বলল বৃষ্টি হবে!

অফিসে চেম্বারে ঢুকে সব কিছু গুছিয়ে নিতে দশ মিনিটের মতো লাগল অক্ষরের।

তারপরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর দিতেই গোটা শরীরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল তার। দশ মিনিটের মধ্যেই কালো মেঘে ঢেকে গেছে পুরো আকাশ! কে বলবে যে একটু আগে কড়া রোদ উঠেছিল!

প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল।

স্কুলে যেতে পারলো ইরফান।

রাত দশটা পর্যন্ত টানা বৃষ্টি চলল। বহু কসরত করে জলাবদ্ধ রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি ফিরল অক্ষর। আকাশ তখনো মেঘাছন্ন, চাঁদের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

এই তীব্র বৃষ্টির মধ্যেও অর্কিড ভিলার দিকে একটানা নজর রেখে যাচ্ছে আরিফ, কারণ বর্তমানে এটাই ওর কাজ।

।। ৪ ।।

আকাশের মস্ত চাঁদটার আলোতে অর্কিড ভিলাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো এক প্রাচীন দানব চুপচাপ আকাশের নীচে চুপচাপ বসে আছে।

অক্ষর, ইরফান আর আফ্রিতা দাঁড়িয়ে আছে অর্কিড ভিলা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সেই গলিটার সামনে।

আফ্রিতাকে দেখে আজও একটু অবাক হয়েছে অক্ষর। জিনসের প্যান্ট আর একটা সালোয়ার-কামিজ পরে আছে মেয়েটা, কাঁধে সেদিনের মতোই একটা ব্যাগ। বেশ উৎফুল্ল হয়ে আছে মেয়েটা, দেখে মনেই হচ্ছে না যে এক ভয়াবহ অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে ও।

"তো, আমরা এখন আবার পেছনে যাওয়ার সেই গলিতে ঢুকব, ইরফান লিড দ্য ওয়ে," বলে উঠল আফ্রিতা।

ইরফানের পেছন পেছন যেতে লাগল ওরা। রাতের বেলা গলিটাকে এতটা ভূতুড়ে লাগবে সেটা অক্ষরের ধারণাতেও ছিল না।

"দাঁড়াও," বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বলল আফ্রিতা, "কেউ আমাদের পিছে পিছে আসছে। ইরফান, এখান থেকে অর্কিড ভিলা দেখা যাচ্ছে?"

"কে আসছে? হ্যাঁ, ওইতো," হাত তুলে অর্কিড ভিলা দেখাল সে। সম্ভবত বাড়িটার বামপাশটা দেখা যাচ্ছে।

ভালো করে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিল আফ্রিতা, তারপর অক্ষরকে বলল, "অক্ষর সাহেব, অর্কিড ভিলার দিকে একবার তাকান আর ওই তিনতলার ওই খালি ফ্ল্যাটটার দরজার কথা মনে করুন। অল্প একটু হলেও চলবে, যা মনে আসে। শুধু মনে করুন, কুইক"

তাকিয়ে একবার ভেবে নিল অক্ষর। তারপর বলল, "হ্যাঁ হয়েছে!"

"এবার আপনারা দুজন চোখ বন্ধ করুন," বলল আফ্রিতা।

"কেন?" অবাক হয়ে বলল অক্ষর।

"আরে করুন তো!"

চোখ বুঝলো অক্ষর আর ইরফান।

নিজের ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা অক্ষরের কপালে স্পর্শ করাল আফ্রিতা, তারপর বলল, "চোখ খুলুন।"

চোখ খুলে বিরাট ধাক্কা খেল ওরা দুজন। কোথায় সেই চিপা গলি? ওরা এখন অন্ধকার একটা ঘরের মতো জায়গাতে এসে গেছে।

"আমরা কোথায়?" অক্ষরের কণ্ঠে বিস্ময়।

"আমরা অর্কিড ভিলার সেই বন্ধ ফ্ল্যাটটাতে, যেটা ভাড়া হয়েছিল না! আপনি এই ফ্ল্যাটের দরজার কথা একদম নিখুঁতভাবে মনে করেছেন অক্ষর সাহেব, তাই আমরা এখানে আসতে পেরেছি!" হাসল আফ্রিতা।

অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট গ্লাস বের করল আফ্রিতা। সেটা রাখল মাটিতে, তারপর ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে ওটা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাল্‌বের মতো জ্বলে উঠল সেটা।

এবার সব কিছু ভালোমতো দেখতে পেলো অক্ষর আর ইরফান! আসলেই ওই ফ্ল্যাটটার ভেতরে ওরা! অর্কিড ভিলার প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভেতরটা একই রকম। তাই কোনোদিন ওই বন্ধ ফ্ল্যাটটাতে না ঢুকলেও অক্ষর বুঝতে পারল যে ওরা ওখানেই রয়েছে।

মাটিতে জমে আছে পুরু ধুলার স্তর, বোঝাই যাচ্ছে দীর্ঘকাল এখানে কেউ আসেনি।

মাটিতে রাখা গ্লাসটার দিকে ভালো করে তাকাল ইরফান। গ্লাসটা থেকেই আলো আসছে, ওর ভেতরে আলোর কোনো উৎস নেই! একটা গ্লাস থেকে কী করে আলো আসে?

"আমরা এখানে এলাম কী করে?" থমথমে কণ্ঠে বলল অক্ষর।

"প্রাচীনকালে পারস্যের কিছু পণ্ডিত আবিষ্কার করেছিলেন এই পদ্ধতিটা, যেটা সূর্যের আলোতে কাজ করে না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মানবশরীরকে কণাতে রূপান্তরিত করে ফেলে স্থানান্তরের পদ্ধতি। বেশ অনেক সময় লেগেছে আমার এটা শিখতে। তবে বেশি দূর পর্যন্ত পারি না, এই ধরুন অর্ধ মাইলের মধ্যে আমার দৌড়ান্ত। প্রথমে অর্কিড ভিলা দেখে নিলাম, তারপর আপনাকে এই ফ্ল্যাটের স্মৃতিটা

মনে করতে বললাম। আপনার স্মৃতি থেকে যে এনার্জি জেনারেট করেছিল সেটাকে কাজে লাগিয়েই এখানে এসেছি! মানে বৈজ্ঞানিকভাবে বলার চেষ্টা করলাম আর কী... আচ্ছা শুনুন, এইবার আমাদের কাজ শুরু হবে। এই পুরো অর্কিড ভিলাটাতে অভিশাপ মুক্তকরণ, সমাধিটা শেষ করে দেওয়া। এখন আমি যা করব এসব নিয়ে আপনারা ভেবেন না। ঠিক আছে? এসব পরে বুঝিয়ে বলব।"

মাথা ঝাঁকাল অক্ষর আর ইরফান।

"সেই গুদ্রবোঙাটা কি আশেপাশেই আছে?" ভয়ে ভয়ে বলল অক্ষর।

একবার চোখ বন্ধ করল আফ্রিতা, তারপর চোখ খুলে বলল, "ভবনের ভেতরে নেই। ওটার ব্যবস্থা আগেই করে দিচ্ছি।"

ডানহাত আর বামহাত হাওয়াতে নাড়াল সে, পর পর তিনবার, তারপর বলল, "ইক্যালিবাস দউ ব্রু।"

সঙ্গে সঙ্গে হলদে রঙের একটা চমক যেন খেলে গেল পুরো বাড়ি জুড়ে, তারপর আবার সব আগের মতো।

"হয়ে গেছে," চশমাটা খুলল আফ্রিতা, "বাইরে থেকে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি আর ভেতরে ঢুকতে পারবে না। সমাধিটা শেষ করার পরে গুদ্রবোঙার ব্যবস্থা করা হবে।"

"মিস আফ্রিতা, আমাদের পিছে কে আসছিল?" প্রশ্ন করল অক্ষর।

"সেসব পরে হবে।"

***

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না আরিফের। একটু আগেই ওদের তিনজনকে গলিতে ঢুকতে দেখেছে সে। আর এখন গলির মধ্যে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না!

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে ওদের পিছে পিছে যাচ্ছিল সে। কিন্তু তাই বলে এতটা পিছেও ছিল না যে ওরা ওর বড়ো রাস্তাতে উঠে যাবে! আর ওরা বড়ো রাস্তাতে উঠবেই বা কেন? নাকি পেছনের কোনো গুপ্ত রাস্তা দিয়ে অর্কিড ভিলাতে ঢুকেছে ওরা? এমন রাস্তা আছে? থাকলে তো ও এতদিন বুঝতে পারত! পুরো বাড়িটার পিছে কম সময় নষ্ট করেনি সে।

***

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে অর্কিড ভিলার সেই ফ্ল্যাটটার ভেতরে।

"চান্দু উপস্থিত, এবার শিংয়ের পালা," নিজের মোবাইলটা বের করল আফ্রিতা, তারপর বলল, "ড্রুইডরা বিশ্বাস করত ছবির মধ্যে আত্মার একটা অংশ থাকে। ধরুন আপনি কিছু একটার ছবি আঁকলেন, সেটা জড় হোক বা জীব, তার আত্মার একটা একটা উপস্থিতি সেই ছবি মধ্যে থাকবেই। প্রাচীন ড্রুইড বিশ্বাস অনুযায়ী সব কিছুর মধ্যেই আত্মা থাকে, যা জীব হোক আর জড়। ক্যামেরাতে তোলা ছবিতেও এমনটা হয়।"

চুপ করে রইল অক্ষর আর ইরফান। নতুন কোনো ভেলকি দেখার অপেক্ষায় তারা।

মোবাইলে সূর্যের একটা ছবি দেখাল আফ্রিতা। তারপর বামহাতের বুড়ো

আঙুলটা দিয়ে সেই ছবিটা স্পর্শ করে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের ভেতর থেকে সূর্যের আলোর মতো একটা রশ্মি বেরিয়ে এল।

"এটা সূর্যের আলো, আত্মার আলো," বলে মোবাইলটা ছেড়ে দিল আফ্রিতা, হাওয়াতে ভেসে রইল সেটা আর সূর্যের আলোটা গিয়ে মিশল মাটির সেই জায়গাতে, যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল।

"শিং আর চান্দু উপস্থিত, পূর্ণ হয়েছে শিংবোঙার আত্মিক উপস্থিতি," নিজের ব্যাগ থেকে একটা পেনসিলের মতো জিনিস বের করল আফ্রিতা।

চাঁদ আর সূর্যের (!) আলো যে জায়গাতে পতিত হয়েছে সেই জায়গাতে একটা বৃত্ত আঁকল সে। লাল রঙের একটা বৃত্ত। তারপর ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা থলে বের করে সেটাকে উপুড় করে দিল সেখানে। সবুজাভ রঙের গুঁড়াতে ভরে গেল বৃত্তটা।

"অক্ষর সাহেব, সব শেষ, এবার আপনার পালা," অক্ষরের কাছে হেঁটে এল আফ্রিতা, "সমাধি ভাঙবেন এবার আপনি!"

"কী করতে হবে আমাকে?"

"আমরা দুজন আর এখান থেকে নড়ব না, আপনি একা একা হেঁটে যাবেন বৃত্তটার কাছে আর তারপর ওই সবুজ গুঁড়াগুলোর ওপর পা দেবেন! তাহলেই হবে!"

"বেশ," এগোতে লাগল অক্ষর।

"দাঁড়ান, অক্ষর সাহেব। আপনি ওই বৃত্তের সামনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সব কিছু বদলে যাবে! সব কিছুই, আর একটা কথা মনে রাখবেন।"

"কী কথা?"

"আপনার স্ত্রী আপনার বাড়িতে আছেন, এটা মনে রাখবেন!"

"মানে?"

"মানে কিছু না, তাড়াতাড়ি যান।"

হাঁটতে লাগল অক্ষর, পাঁচ-সাত হাত দূরেই সেই বৃত্তটা।

ওটার সামনে পৌছে গেল সে। তারপর পা টা তুলল।

কিন্তু এ কী দেখছে অক্ষর! ওই বৃত্তটার ওপর নগ্ন হয়ে পড়ে আছে ঐশী, তার পেটে মাঝখানে একটা গভীর ক্ষত, যেখানে পা দিতে যাচ্ছিল সে।

পেছন ফিরল সে, কোথায় আফ্রিতা আর ইরফান! আর কোথায় সেই অর্কিড ভিলার ফ্ল্যাটটা?

সে সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গায় এসে গেছে।

জায়গাটা অনেকটা বনের মতো। বনের মাঝখানে লম্বা একটা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য বামন, যাদের মাথাটা বিকৃত ধরনের! আফ্রিতার মুখে গুদ্রবোঙাদের যেমন বর্ণনা শুনেছিল ঠিক তেমনই দেখতে এরা।

ওর সামনেই সেই বৃত্তটার ওপর আহত অবস্থায় পড়ে আছে ঐশী। আরও সামনে, বেশ অনেকটা দূরে একটা বিরাট আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি। মূর্তিটা যেন ওই বামনগুলোরই প্রতিরূপ।

এ কোথায় এল অক্ষর?

হুট করে চোখ খুলল ঐশী।

"অক্ষর, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমাকে বাঁচাও," কাতরে উঠল সে।

এখন কী করবে অক্ষর?

"অক্ষর, প্লিজ।" হাতটা এগিয়ে দিল ঐশী। ওর দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু।

একটু ঝুঁকে ও হাতটা ধরতে গেল অক্ষর, ঠিক সেই মুহূর্তেই আফ্রিতার বলা কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। ঐশী তো বাড়িতে!

ওই বৃত্তের মাঝখানে যে পড়ে আছে সে ঐশী না! ওর মতো দেখতে কেউ!

চোখদুটো বন্ধ করল অক্ষর। ফাহাদ, সাহানা, আফতাব, মুন-মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর।

চোখ খুলল অক্ষর। পা রাখল ঐশীর বুকের ওপর!

ড্রিম.. একটা তীব্র বিস্ফোরণ হয়ে গেল। ভেঙে পড়তো লাগল সেই বিরাট মূর্তিটা।

"অক্ষর সাহেব, অক্ষর, সাহেব," আফ্রিতার কণ্ঠ শুনে বাস্তবে ফিরল অক্ষর। কোথায় সেই বন? সে আবার ফিরে এসেছে অর্কিড ভিলার সেই ফ্ল্যাটে। ওই বৃত্তটার মাঝখানের সবুজাভ গুঁড়াগুলোর ওপর পা দিয়ে রেখেছে সে।

"ওয়েলডান। সমাধি ভেঙে গেছে," বলল আফ্রিতা।

"স্যরি, আমি মনে একটু বেশিই দেরি করে ফেললাম।" কোনোমতে বলল অক্ষর।

"কই আঙ্কেল?" অবাক হয়ে বলল ইরফান। আপু বলার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনি গিয়ে পা দিলেন। কই দেরি হলো?

বিস্ফোরিত চোখে আফ্রিতার দিকে তাকাল অক্ষর।

"অক্ষর সাহেব, বলেছিলাম না, আপনি বৃত্তটার কাছে পৌছোলে অনেক কিছু বদলে যাবে? আপনি ভুল করলে কিন্তু আমরা সবাই মারা যেতাম!" মৃদু হাসল আফ্রিতা।

"ভগবান!"

"বিপদটার কথা আপনাকে আমি বলিনি আর বলিনি বলেই হয়তো আপনি কাজটা করতে পেরেছেন। মাঝে মাঝেই আমি এমন করি!"

***

অদ্ভুত একটা পুকুরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে ফাহাদ। সেই পুকুরের কোনো পানি নেই। আছে শুধুই কিছু মুণ্ডুহীন প্রেত। ওরা ফাহাদকে ধরে রেখেছে।

ওকে চিরকাল নিজেদের কাছে রাখতে চায় ওরা।

ও কী! পুকুরে পাড়ে ওটা কে! অক্ষর!

সত্যিই অক্ষর, নাকি কোনো মায়া? ফাহাদকে ইশারা করে ডাকছে সে।

নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে এগোতে লাগল ফাহাদ। অক্ষরের কাছে যেতে হবে ওকে।

পাড়ের কাছে পৌছে গেছে সে, হাত বাড়িয়ে দিল অক্ষর। টেনে তুলল ওকে।

তীব্র ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে ফাহাদের শরীর। সেখানেই শুয়ে পড়ল সে। ঘুমের অনেক প্রয়োজন তার।

হুট করে চোখ খুলল ঐশী।

"অক্ষর, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমাকে বাঁচাও," কাতরে উঠল সে।

এখন কী করবে অক্ষর?

"অক্ষর, প্লিজ।" হাতটা এগিয়ে দিল ঐশী। ওর দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু।

একটু ঝুঁকে ও হাতটা ধরতে গেল অক্ষর, ঠিক সেই মুহূর্তেই আফ্রিতার বলা কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। ঐশী তো বাড়িতে!

ওই বৃত্তের মাঝখানে যে পড়ে আছে সে ঐশী না! ওর মতো দেখতে কেউ!

চোখদুটো বন্ধ করল অক্ষর। ফাহাদ, সাহানা, আফতাব, মুন-মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর।

চোখ খুলল অক্ষর। পা রাখল ঐশীর বুকের ওপর!

দ্রিম.. একটা তীব্র বিস্ফোরণ হয়ে গেল। ভেঙে পড়তো লাগল সেই বিরাট মূর্তিটা।

"অক্ষর সাহেব, অক্ষর, সাহেব," আফ্রিতার কণ্ঠ শুনে বাস্তবে ফিরল অক্ষর। কোথায় সেই বন? সে আবার ফিরে এসেছে অর্কিড ভিলার সেই ফ্ল্যাটে। ওই বৃত্তটার মাঝখানের সবুজাভ গুঁড়াগুলোর ওপর পা দিয়ে রেখেছে সে।

"ওয়েলডান। সমাধি ভেঙে গেছে," বলল আফ্রিতা।

"স্যরি, আমি মনে একটু বেশিই দেরি করে ফেললাম।" কোনোমতে বলল অক্ষর।

"কই আঙ্কেল?" অবাক হয়ে বলল ইরফান। আপু বলার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনি গিয়ে পা দিলেন। কই দেরি হলো?

বিস্ফোরিত চোখে আফ্রিতার দিকে তাকাল অক্ষর।

"অক্ষর সাহেব, বলেছিলাম না, আপনি বৃত্তটার কাছে পৌছোলে অনেক কিছু বদলে যাবে? আপনি ভুল করলে কিন্তু আমরা সবাই মারা যেতাম!" মৃদু হাসল আফ্রিতা।

"ভগবান!"

"বিপদটার কথা আপনাকে আমি বলিনি আর বলিনি বলেই হয়তো আপনি কাজটা করতে পেরেছেন। মাঝে মাঝেই আমি এমন করি!"

***

অদ্ভুত একটা পুকুরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে ফাহাদ। সেই পুকুরের কোনো পানি নেই। আছে শুধুই কিছু মুণ্ডুহীন প্রেত। ওরা ফাহাদকে ধরে রেখেছে।

ওকে চিরকাল নিজেদের কাছে রাখতে চায় ওরা।

ও কী! পুকুরে পাড়ে ওটা কে! অক্ষর!

সত্যিই অক্ষর, নাকি কোনো মায়া? ফাহাদকে ইশারা করে ডাকছে সে।

নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে এগোতে লাগল ফাহাদ। অক্ষরের কাছে যেতে হবে ওকে।

পাড়ের কাছে পৌছে গেছে সে, হাত বাড়িয়ে দিল অক্ষর। টেনে তুলল ওকে।

তীব্র ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে ফাহাদের শরীর। সেখানেই শুয়ে পড়ল সে। ঘুমের অনেক প্রয়োজন তার।

"আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই বাড়ি এবং বাড়ির জমিতে আর গুদ্রবোঙার সমাধি নেই!" বলল আফ্রিতা।

"কিন্তু আপু, ওই গুদ্রবোঙাটা কোনো বাঁধা সৃষ্টি করল না কেন?" ইরফানের কণ্ঠে উত্তেজনা।

"যে সুরক্ষাবলয় সৃষ্টি করেছি আমি এই বাড়িতে, তাতে করে কোনো মধ্যম শ্রেণির গুদ্রবোঙার এই বাড়ি তো দূরের কথা এর আশেপাশেও আসার ক্ষমতা নেই। ও এখানেই আসতেই পারেনি। সবচেয়ে বিপদ ছিল অক্ষর সাহেবের কাজটাতে, কিন্তু উনি সেটা করতে পেরেছেন। তবে একজন আছেন যিনি এখন এই বাড়ির এদিক-সেদিক ঘুরছেন। তার পরিচয়টা জানতে হবে। উনিই আমাদেরকে গলির মধ্যে অনুসরণ করলেন!"

"কে?"

"তোমার গৃহশিক্ষক, আরিফ সাহেব।"

"আপু! আরিফ ভাইয়া নানান ভাবে খোঁজ নিয়েছে। নানানভাবে আমার মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করেছে। উনিই হয়তো..."

"না না, উনি ওই গুদ্রবোঙাটা হলে বাড়ির আশেপাশে আসতে পারতেন না। তবে সে যে পরিচয় উনি দিয়েছেন সেটাও তার আসল পরিচয় না। উনি অন্য কেউ!"

"মানে কী?" বেশ অনেকক্ষণ পর কথা বলল অক্ষর। চুপচাপ বসে ছিল সে।

"দেখছি, এখনই দেখছি, আমাদের কাজ প্রায় শেষ। এখন আর বাইরের কেউ এখানে এলেও সমস্যা নেই। ইরফান, আরিফ সাহেবের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি স্মৃতি তোমার। চোখ বন্ধ করে উনার কথা মনে করো তো।"

"ওমা আপু! উনাকেও এখানে আনা সম্ভব?"

"হুম, তুমি চোখ বন্ধ করে উনার কথা মনে করো।"

চোখ বন্ধ করল ইরফান আর ওর কপালের মাঝখানে নিজের ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা রাখলো আফ্রিতা।

মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে এসে গেল আরিফ। অক্ষরের ডানপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

"আ আ আ," তোতলাতে লাগল আরিফ, "এখানে কী করে? কোথায় এটা?"

"আপনি এখন অর্কিড ভিলার ভেতরে আরিফ সাহেব," শব্দ করে হেসে উঠল আফ্রিতা, "আমি আপনাকে এখানে এনেছি, ইরফানের সাহায্যে আর কী। এটাও আপনার ভণ্ডামি মনে হয়?"

"ক...কী আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আ আ আপনি, এটা কী করে সম্ভব?"

"সম্ভব, এখন বলুন আপনি আসলে কে?"

"আ...আমি আরিফ।"

"আপনি প্রথম দেখাতেই আমি আপনাকে রাজশাহি নিউমার্কেটের বিরাট একটা থিমপার্কের কথা বলেছিলাম। আসলে অমন কোনো থিমপার্ক রাজশাহি নিউমার্কেটে নেই! আপনি রাজশাহির হলে আপনার অবশ্যই এটা জানার কথা ছিল। আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনি মিথ্যা বলছেন। সত্য করে বলুন, আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?"

"তার আগে," একটু ধাতস্থ হয়েছে আরিফ, "আমাকে বোঝান এখানে কী হচ্ছে? আমি কী করে এখানে এলাম?"

"এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে যা আসলে কাউকে বোঝানো সম্ভব না। ভালোয় ভালোয় বলে দিন আপনি কে, নইলে আমি কিন্তু অন্য পদ্ধতিতেও আপনার পরিচয় বের করতে পারি, সেটা আপনার বোঝা উচিত। আপনাকে যখন রাস্তা থেকে এখানে আনতে পেরেছি।"

"আমার মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি!"

"তাই দেখছেন ভেবে নিন, পরিচয় দিন নিজের।"

"হুম," হাল ছাড়া ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা আইডি কার্ড বের করে আফ্রিতার সামনে মেলে ধরল আরিফ।

"ইন্সপেক্টর রিয়াজুল জুলিয়ান, ওয়াও! তা এখানে কেন?"

"আমি জানি না এসব আপনাকে কেন বলছি, তারপরেও এইমাত্র আমার সঙ্গে যা হয়েছে। যাই হোক শুনুন, গত কমাসে এই এলাকার পাশের কয়েকটি এলাকাতে মাদক ব্যাবসার আধিপত্য নিয়ে বেশ কতগুলো গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কিছু মানুষ মারা যায়। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নেটওয়ার্ক এতটাই শক্ত যে ওদের দলগুলোর ভেতরের কোনো খবরই আমরা জানতে পারিনি। যে দুয়েকজন ধরা পড়েছিল তাদের মুখ থেকেও তেমন কথা বের করা যায়নি। ঠিক তখনই আমাদের একজন সোর্স অর্কিড ভিলার দুর্ঘটনার কথা আমাদের জানায়, এটাও জানায় যে হুট করেই এই এলাকাতে ওই বাড়িটাকে নিয়ে গুজব উঠেছে। ওই ভদ্রলোককেও চিনি, অক্ষর উনার নাম। উনিও তো ভাড়াটিয়া ছিলেন। যাইহোক, আমরা সন্দেহ করি হয়তো ওইসব দলের নেতারা এই বাড়িটার নেগেটিভ রিউমারগুলোকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে আর এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। আমরা যদি তখনই বাড়ি তল্লাশি করতে আসতাম তবে ওই চক্রের খবর পেয়ে ভেগে যাওয়ার চান্স থাকত কারণ ওদের নেটওয়ার্ক অনেক শক্ত, তাই আমি আরিফ সেজে এই এলাকাতে থাকতে আসি। ওই বাড়ির দিকে নজর রাখতে থাকি।"

"আপনি যখন এলেন আর ওই বাড়ির ভূত তাড়ানোর কথা বলতে লাগলেন তখন আমার সন্দেহটা বেড়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম ওই চক্রগুলোই আপনাকে পাঠিয়েছে, যাতে অর্কিড ভিলাকে নিয়ে গুজবগুলো আরও দৃঢ় হয়। তাই আপনাদের ফলো করতাম।"

"আর আমাকে পড়ানোর ব্যাপারটা?" থমথমে গলাতে বলল ইরফান।

"আই অ্যাম স্যরি ইরফান। সুলতানের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে তোমার বাবার কাছে এলাকার প্রায় সব খবরই থাকে। তাই আমি তোমাকে পড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাই। আমি অনেক দুঃখিত! আমি ভাবতেও পারিনি যে এই মহিলা আসলেই,"

"এখন আমরা কী করব আপু?" আফ্রিতার দিকে ঘুরে গেল ইরফান।

"একটাই কাজ বাকি, ওই গুদ্রবোঙাটাকে এখানে আহ্বান করা তারপর যদি ও এখান থেকে চলে যেতে না চায় তবে..."

"কিন্তু এখন?"

"আরে সমস্যা নেই, ইন্সপেক্টর জুলিয়ান তো সব জানেনেই আর এখানে উনি যা

দেখবেন তা যদি বাইরে কাউকে বলেনও তবে কেউ উনার কথা বিশ্বাস করবে না।"

***

দুটো হাত ওপরে তুলে আবার নীচে নামাল আফ্রিতা, তারপর বলল, "আর নেই সুরক্ষাবলয়, এবার সেই গুদ্রবোঙাকে আহ্বান ন করা যাবে।

"ওকে এখানে আনার জন্যও কি আমাদের কারো ওর কথা ভাবতে হবে?" উঠে দাঁড়াল অক্ষর। ওই গুদ্রবোঙাটার কথা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে।

"না না, এই পদ্ধতি শুধু তাদের জন্য যাদের পার্থিব শরীর আছে। মানুষ, জীব-জন্তু এদের, কিন্তু প্রেত শক্তিদের সাধারণত পার্থিব কোনো শরীর থাকে না, এদের যে শরীর আমরা দেখি তা প্রকৃতপক্ষে এক ধোঁকা। গুদ্রবোঙা যেহেতু অর্ধদেবতা, ওরও পার্থিব শরীর নেই। ওকে অন্যভাবে আনতে হবে।"

"এখন কি আরও তেলেসমাতি হবে নাকি?" বলল জুলিয়ান, অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে।

"আপনার সবাই পিছে সরে যান," বলে এগিয়ে গেল আফ্রিতা, সেই বৃত্তটার কাছাকাছি। ওটার ভেতরের সবুজাভ গুঁড়াগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। কয়েক সেকেন্ড পরেই ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল সেখানে।

"লুক্তারাং, আবগে বোঙার বংশধর গুদ্রবোঙা, শিংবোঙার নামে তোমাকে আহ্বান করছি আমি!"

"লুক্তারাং, আবগে বোঙার বংশধর গুদ্রবোঙা, শিংবোঙার নামে তোমাকে আহ্বান করছি আমি!"

"লুক্তারাং, আবগে বোঙার বংশধর গুদ্রবোঙা, শিংবোঙার নামে তোমাকে আহ্বান করছি আমি!"

পরপর তিনবার বলল সে।

ধপ করে সেই গ্লাসের অপার্থিব আলোটা নিভে গেল, পর মুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল।

সবাই দেখতে পেল যে বৃত্তটার সে আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। মাথায় কোনো চুল নেই।

সেই লোকটা, যে আফ্রিতাকে প্রথম দিন অর্কিড ভিলা চিনিয়ে দিয়েছিল।

"আরে! এই রূপে ছিল ব্যাটা," অবাক হয়ে গেল আফ্রিতা, "আবার আমাকে বাড়ি চিনিয়ে মজাও নিতে চেয়েছে!"

"এই লোককে তো আমি দেখেছি মোড়ে!" বলল জুলিয়ান।

"আমিও মোড়েই দেখেছি!" মাথা নাড়ল ইরফান।

"তাহলে এই রূপেই তুমি ছিলে?" ডানহাতটা একবার উঁচু করে আবার নিচু করল আফ্রিতা।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হল কিম্ভূতকিমাকার এক বামনে! ছোট বাচ্চার শরীরে একটা দানবীয় মাথা। বড়োবড়ো দাঁত, কুতকুতে দুটো, এককথাতে বীভৎস।

"ওহ গড! এটা কী!" প্রায় লাফিয়ে উঠল জুলিয়ান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অক্ষর আর ইরফান।

"আবগে বোঙার বংশধর গুদ্রবোঙা, শিংবোঙার নামে এই বাড়ির সমাধি শেষ

করে দেওয়া হয়েছে, তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই এখানে। তুমি কি চলে যেতে চাও?" দানবটার দিকে তাকিয়ে বলল আফ্রিতা।

মাথা নাড়ল দানবটা। সে যাবে না।

"আর কোনো উপায় নেই," পিছে ঘুরল আফ্রিতা, "গুদ্রবোঙারা একবার যা বলে তাই করে। আত্মসম্মানের ব্যাপারে খুবই কঠোর ওরা। সমাধি রক্ষা করতে পারেনি এখন প্রাণ দেবে। ওকে বোঝানোর কিছু নেই।"

নিজের বামহাতটা সামনের দিকে এগিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনের শিখা উজ্জল হয়ে উঠল। গুদ্রবোঙাকে ঘিরে ফেলল আগুন।

এক নিমিষেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই অবদেবতা।

তারপর জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। ওখানে কোনো বৃত্ত নেই, কোনো সবুজাভ গুঁড়া নেই, নেই কোনো অপদেবতা।

আলো জ্বলা সেই গ্লাসটা হাতে তুলে আফ্রিতা।

"আমাদের কাজ শেষ! ইরফান জলদি একটু অর্কিড ভিলার গেটের কথা মনে করো তো," বলল সে।

***

সুলতানের দোকান থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা চারজন। আফ্রিতার হাতে এখনো গ্লাসটা রয়েছে, তবে এখন একটা সাধারণ গ্লাসের মতোই লাগছে ওটাকে।

"অভিজ্ঞতা একটা হল বটে! গুদ্রবোঙার সমাধি ভাঙলাম তাও শহরের বুকে! এর পর আবার এক গুদ্রবোঙাকে শেষও করলাম," ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলল আফ্রিতা।

"ভালো লাগছে, সাহানা আন্টি আর ফাহাদভাইয়ের দুর্দশার জন্য দায়ী শয়তানটাকে শিক্ষা দিতে পেরেছি," আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফাহাদ।

"আমি আসলেই এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যা দেখলাম এতক্ষণ," মাটিতে বসে পড়েছে জুলিয়ান।

"ইন্সপেক্টর সাহেব বুঝলেন, এই সুলতান লোকটাকে না আমার ভালো লাগে না। ওর দোকানটাও কিন্তু খুব বেশি পুরোনো নয়। তেমন বিক্রিও হয় না তারপরেও লোকটা দোকানটা টিকিয়ে রেখেছে। শুধু এর কথা ওকে আর তার কথা একে লাগানোর জন্য কেউ দোকান খুলে রাখে এই প্রথম দেখলাম," বলল আফ্রিতা।

"হুম..." হুট করে বদলে গেল জুলিয়ানের মুখভঙ্গি।

"আপু প্লিজ এরপরের কিছু কেসেও আমাকে নেবেন, যা মজা হল না," মিনতি ঝরে পড়ল ইরফানের কণ্ঠে।

"অক্ষর সাহেব ভুল করলে আসল মজাটা টের পেতে," ভেংচি কাটল আফ্রিতা।

***

চারদিন পর।

একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল আফ্রিতার নম্বরে।

"হ্যালো," ফোনটা ধরল সে।

"ইন্সপেক্টর জুলিয়ান বলছি, ইরফানের কাছ থেকে আপনার নম্বর পেয়েছি!"

"আরে ইন্সপেক্টর সাহেব। বলুন কী অবস্থা?"

"সুলতানকে গ্রেপ্তার করেছি। ওই অঞ্চলে মাদক ব্যাবসার একজন কেউকেটা ধরনের লোক সে। দোকানটা ছিল শুধুই দেখানো। আড়ালে আড়ালে ওই এলাকা এবং আশেপাশের এলাকার মাদক ব্যাবসার কাজে জড়িত ছিল লোকটা। ওর মাধ্যমে বহু বড়ো বড়ো চুক্তি হত, কিন্তু সে সবসময়ই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যেত। অমন নির্জন এলাকার এক মুদি দোকানদারকে আর কে সন্দেহ করবে? যেখানে মূল ব্যাবসা হত আশেপাশের এলাকাগুলোতে।"

"ওয়াও, কংগ্র্যাটস।"

"থ্যাংকস মিস আফ্রিতা।"

"কেন?"

"আপনি সেদিন ওই কথা না বললে আমি সুলতানকে সন্দেহই করতাম না। এতোদিন ওই এলাকাতে থাকলাম ওর প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আসেনি আমার।"

"আমি আর কী বললাম? শুধু বললাম ওকে আমার পছন্দ না।"

"উঁহু, আমার তা মনে হয় না। আপনি নিশ্চয়..."

"জাদু-টাদু করে? থ্যাংকস দিলেন না? নিলাম, ওয়েলকাম।"

"একদিন কফি-টফি?"

"দেখা যাবে।"

পরিশিষ্ট

সাত দিন পর

ঐশীকে নিয়ে ক্লিনিকের করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতেই মুনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অক্ষরের। কতদিন পর মেয়েটার মুখে হাসি দেখছে সে।

আজ দুপুরের দিকে ফাহাদের জ্ঞান ফিরেছে। সবার আগে ফোন করে অক্ষরকে জানিয়েছে মুন।

"আরে তোমরা," বলে উঠল মুন, "আহাদ সাহেব আর ইরফানকে রেখে এলাম। কিছু টেস্টের রেজাল্ট তুলতে যাচ্ছিলাম। তুলে একদম ডাক্তারের চেম্বারে সেগুলো দেখিয়েই ফিরব। উনারা আসতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আমিই এলাম। ডাক্তার কী বলেন আমি শুনতে চাই!"

"আপু ঐশী যাক আপনার সঙ্গে, আপনি রিসিটগুলো আমাকে দিন!"

"তুমি যাবে?"

"হুম, ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলছি, এই সময়ে ভাইয়ার পাশে থাকা দরকার আপনার।"

সন্ধ্যাবেলা আফ্রিতাকে ফোন করল অক্ষর।

কয়েকবার রিং হওয়ার পরে ফোনটা ধরল আফ্রিতা, "হ্যালো, বলুন অক্ষর সাহেব।"

"ফাহাদ ভাইয়ের জ্ঞান ফিরেছে!"

"খুব ভালো খবর তো।"

"রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি, উনি বলেছেন কিছুদিনের মধ্যেই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।"

"হুম ভালো লাগছে শুনে।"

"ডাক্তার আরও বলেছেন যেমন হুট করে কোমাতে গিয়েছিলেন ঠিক তেমন হুট করেই ফিরে এসেছেন উনি। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, এমনকি এক ঘণ্টা আগেও উনার তেমন কোন উন্নতি হয়েছিল না। আচ্ছা, কোনোভাবে ওই অভিশাপ..."

"বাদ দিন অক্ষর সাহেব, ওইসব ভুলে যান। উনার আর উনার স্ত্রীর পাশে থাকুন। সেটাই ভালো হবে।"

"ঠিকই বলেছেন, সেটাই ভালো হবে। আচ্ছা, আপনি কি জানতেন?"

"আমার মা ডাকছেন, পরে কথা হবে অক্ষর সাহেব," ফোনটা রেখে দিল আফ্রিতা।

মেসেঞ্জার দেখল ও, বেশ বড়ো একটা মেসেজ পাঠিয়েছে ইরফান। সেও সম্ভবত অক্ষরের মতো কিছুই বলবে। নাহ, এটাও দেখা যাবে না।

ক'দিন একটু আরামের দরকার ওর, তারপর হয়তো শুরু করবে নতুন কোনো আঁধারের সন্ধান।

হাতে কোনো কাজটাজ নেই আফ্রিতার। হ্যাঁ, এখন ওই উদ্ভট লোকটার মেসেজের রিপ্লাই দেওয়া যেতে পারে।

ছলা-কলা

"গেট দিয়েই ঢুকলাম আর কী!" হাসতে হাসতে বললাম আমি।
"কী বলছ জ্যানেট! গেটে তো তালা মারা ছিল," অবাক হয়ে গেল এলেন।
মোরাগ গ্রিয়ারের 'দ্য গেটস ওয়ার লকড' থেকে।

।। ১ ।।

It was one hundred degrees as we sat beneath a willow tree
Whose tears didn't care they just hung in the air
And refused to fall, to fall
I knew I'd made a horrible call
And now the state line felt like the Berlin wall
And there was no doubt about which side I was on
'Cause I built you a home in my heart
With rotten wood that decayed from the start...

সকাল সকাল বেশ মন দিয়ে গানটা শুনছিল আফ্রিতা। আজ বেশ ভোরে উঠেছে সে।

গত দেড় সপ্তাহে তেমন কোনো কেস আসেনি ওর কাছে। তাই বাড়িতে শুয়ে-বসেই দিন কাটছে। দুদিন অফিসেও যেতে হয়েছে মায়ের সঙ্গে। ব্যাপারটা বিরক্তিকর।

"আফ্রিতা, আজকে কি বাইরে যাচ্ছ কোথাও?" ঘরে ঢুকলেন মিসেস রায়হান।

"না, বাড়িতেই, কেন? আবার অফিসে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান? যেতে পারব না কিন্তু।"

"আরে না না," হাসলেন ওর মা, "তোমার পুষ্পিতা আপুকে মনে আছে? ও আজ দেখা করতে আসবে তোমার সঙ্গে।"

"কোন পুষ্পিতা আপু?"

"ওই যে তোমার বাবার বন্ধু, বাহার ভাইয়ের মেয়ে, বিদেশে ছিল!"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই আপু? আমার কাছে?"

"হুম আমাকে ফোন দিয়েছিল। তোমার নম্বর নাকি নেই ওর কাছে।"

"ফেসবুকে তো নক দিলেই পারতেন, ওহ, ফ্রেন্ডলিস্টে নেই সম্ভবত উনি আমার।"

"আসলে তোমার সঙ্গে তেমন কথা হয়নি নাকি, যাই হোক ও আসবে, থেকো বাসায়, আমি অফিস যাচ্ছি," বেরিয়ে গেলেন মিসেস. রায়হান।

বাহার আঙ্কেলকে বেশ ছোটোবেলা থেকেই চেনে আফ্রিতা। ওর বাবার বেশ কাছের বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে আসতেন বাড়িতে। পুষ্পিতা তাঁর

একমাত্র মেয়ে। দীর্ঘদিন বিদেশে ছিল মেয়েটা। তারপর সম্ভবত দুই বছর আগে দেশে ফিরেছে।

উচ্চবিত্ত সমাজের বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো কেমন রহস্যময় লাগে আফ্রিতার কাছে। এখানে খুব একটা প্রয়োজন না হলে কেউ কারও কথা মনে করতে চায় না। পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে এত বেশি মানুষ আসে যে সবাইকে মনে রাখাও সম্ভব হয় না।

কমাস আগেও ওদের বাড়ির একটা অনুষ্ঠানে বাবার সঙ্গে এসেছিল পুষ্পিতা। তখনও কথা হয়নি আফ্রিতার সঙ্গে। চেহারাটাও ঠিকঠাক মনে নেই ওর।

***

"চা তো বেশ ভালো হয়েছে," চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল পুষ্পিতা।

"আমিই করলাম, সত্যিই ভালো লেগেছে আপনার?" হাসল আফ্রিতা।

"ওয়াও, তুমি দেখি বেশ ভালো চা বানাও!"

"মেলাদিন পর করলাম। বুয়া আন্টির আজ শরীর খারাপ তো তাই আসেননি।"

আফ্রিতাদের বাড়ির ড্রইং রুমে বসে আছে পুষ্পিতা। এক নজরে বেশ সুন্দরী বলা যায় মেয়েটাকে, চেহারাতে একটা ধারালো ভাব আছে, গায়ের রং ফর্সা আর শ্যামলার মাঝামাঝি। বয়স ত্রিশের ঘরে হবে। ওর চেহারার সবচেয়ে ভালো দিকটা হল একটা পরিমিতবোধ। যেন মেয়েটা ঠিক ততটাই সুন্দরী যতটা একজনের হওয়া উচিত, একটুও বেশিও না, কমও না। কালো রঙের সালোয়ার, কামিজে বেশ মানিয়েছে ওকে।

"তোমাদের বাড়িতে কমাস আগেই এসেছিলাম আমি," আশেপাশে তাকাতে তাকাতে বলল পুষ্পিতা, "ড্রইং রুমটা বেশ বদলে গেছে।"

"মায়ের শখ, উনি আসলে ঘরগুলোর সাজসজ্জা পরিবর্তন করতে খুব পছন্দ করেন, প্রতিমাসেই এমনটা করে থাকেন উনি। যাই হোক, আঙ্কেল কেমন আছেন?"

"বাবা," চিন্তার রেখা ফুটে উঠল পুষ্পিতার মুখে, "একটু অসুস্থ, গত কবছর ধরেই। মাও মারা গেছেন। এই জন্যই তো বিদেশ থেকে একেবারেই চলে আসতে হল। ব্যাবসার হাল বলতে গেলে এখন আমিই ধরে আছি। আন্টি কেমন আছেন? উনি মনে হয় অফিসে, ফোনেই শুধু কথা হলো!"

"আম্মু ভালোই আছেন, হ্যাঁ অফিসেই গেছেন। উনিও চান আমি নিয়মিত অফিসে যাই।"

"অফিস যাও না? তবে? কী করছ আজকাল?"

"ভার্সিটির পড়া শেষ করে বসেই আছি বলতে পারেন। নিজের কিছু শখের কাজ করছি। উদ্ভট কাজই বলতে পারেন!"

"আঁধারের সন্ধান?"

"আপনি জানেন?" অবাক হল আফ্রিতা।

"আরে হ্যাঁ, তোমাকে ফেসবুকে ফলো করি তো নিয়মিত। তোমার পেজেও লাইক দেওয়া আছে। অনেক পপুলার তুমি! যে রেডিও শো-গুলোতে মাঝে মাঝে আসো, সেগুলোও শোনার চেষ্টা করি।"

"একটা শ্রেণির মানুষের কাছে আমি পপুলার, ওদের বাদ দিয়ে বাকিদের

কাছে আমার কথাগুলো শুধুই পাগলের প্রলাপ। আর আমার কাজ... যাই হোক আপনার আইডি বলুন, রিকুয়েস্ট পাঠাই।"

"পুষ্পিতা খান, বাংলায়। বাপরে এত বিখ্যাত মানুষ আমাকে রিকুয়েস্ট দিচ্ছে।"

"পাঠিয়েছি," ফোন থেকে মাথা তুলল আফ্রিতা, "ভালো লাগল আপনি আমার কাজ-টাজের খবর রাখেন শুনে। যদিও এগুলোর বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।"

"দেখো আফ্রিতা, গত সপ্তাহের আগেও আমি তোমাকে ফলো করতাম কিংবা ওই শো-গুলো শুনতাম শুধুমাত্র আমার অতিপ্রাকৃত গল্প শুনতে ভালো লাগে বলে। কিন্তু এই রবিবার থেকে, ব্যাপারটা তোমাকে বলতেই এসেছি। এগুলো আজকাল মানুষকে বলতেও কেমন লাগে। সবাই হাসে!"

"বলুন।"

"তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, মাইন্ড করবে না তো?"

"না, আমি কিছুতেই মাইন্ড করি না।"

"অনেকেই বলে তোমার অতিপ্রাকৃত অনেক ক্ষমতা আছে, ব্যাপারটা কি সত্য? এই প্রশ্নটা করে আমি তোমার কাজকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছি, আমি জানি। কিন্তু তারপরেও।"

"আরে ব্যাপার না," হাত নাড়ল আফ্রিতা, "আচ্ছা ধরুন আপনাকে টাইম মেশিনে করে, আজ থেকে এক দেড়শো বছর আগে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ছোট্ট একটা চারকোনা যন্ত্র হাতে নিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা নিজের বন্ধুকে বার্তা পাঠাচ্ছেন, তো তখনকার মানুষ এটাকে কী বলবে?"

"কী?"

"অতিপ্রাকৃত ঘটনা, আর আপনার কপালে জুটবে জাদুকরি, ডাইনি এইসব অপবাদ! আসলে হাজার বছর আগে এমন অনেক কিছু ছিল যা এই যুগে চিন্তা করা অসম্ভব, আবার এই যুগে এমন অনেক কিছুই আছে যা হাজার বছর আগে ছিল অসম্ভব। ব্যাপারটা আসলে এমন যে, বিজ্ঞান আপনার কাজকে কোন চোখে দেখে? যেটাকে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাই অতিপ্রাকৃত। ওই হিসাবে আমি বলব অতিপ্রাকৃত বলে আসলে কিছুই নেই। আমি যেসব কাজ করি সেগুলোর ব্যাখ্যা হয়তো হাজার বছর আগে ছিল, নয়তো হাজার বছর পর বিজ্ঞান দেবে।"

"অনেক সুন্দর করে কথা বলো তুমি দেখছি, বেশ ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর! ইউ নো বাবা মাঝে মাঝে বলতেন আঙ্কেল এসব নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। উনার কাছ থেকেই কি এসব?"

"না... উনার বই পত্রগুলো একটু-আধটু সাহায্য করেছে, তবে এইটুকু ছাড়া উনার আর কোনো অবদান নেই," বেশ ঠান্ডা গলাতে কথাগুলো বলল আফ্রিতা, "যাই হোক আপনি কী যেন বলবেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, গত কয়েকটা দিন আমার সঙ্গে অদ্ভুত কিছু ব্যাপারটা ঘটেছে। ব্যাপারগুলো অতিপ্রাকৃত ঘটনা কিনা এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তাই কাউকে বলিনি, তোমাকেই প্রথম বলছি। এইগুলো মানে... বলছিলাম কী একটু গোপন.. কিছু মনে করো না, ওই যে মাঝে মাঝে রেডিওশো-তে নিজের অভিজ্ঞতা বলো না তুমি?"

"সমস্যা নেই, গোপনই থাকবে। কেউ আপত্তি করলে তাদের ঘটনা বলি না।"

"আচ্ছা শুরু করা যাক।"

***

ঘটনা ১ – বাড়ি না অফিস?

রবিবারের ঘটনা।

প্রতিদিনের মতো সকাল দশটার দিকে অফিসে যাচ্ছিলাম। ড্রইংরুমে এসে দেখি বাবা পাশের বাড়ির এক আঙ্কেলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। ইদানীং এসব খুব পছন্দ করেন উনি।

এই সময়ে বেশ অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম যে বাবা আমার দিকে চোখ বড়ো বড় করে তাকিয়ে আছেন।

"কী মা, অফিসে যাচ্ছো?" বললেন আঙ্কেল।

"হ্যাঁ, আঙ্কেল, আপনি কেমন আছেন?" বললাম আমি।

"এইতো ভালো, তুমি ভালো তো? অফিস কেমন চলে?"

"এই আছি, চলছে মোটামুটি।"

এর পর বাবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এবার খেয়াল করলাম বাবার চোখে সেই ভয়ের ভাবটা আর নেই, সেখানে ভর করেছে এক অদ্ভুত বিস্ময়। যাই হোক আমি ব্যাপারটাকে গুরত্ব দিইনি।

গাড়ি ড্রাইভ করে অফিসে এলাম। সাধারণত আমি নিজেই গাড়ি চালাই। বাসার অন্য গাড়িগুলোর জন্য দুজন ড্রাইভার আছে। বাবার হুটহাট বের হওয়ার ইচ্ছা হলে ওরা নিয়ে যায়।

অফিসে এলাম, নিজের চেম্বারে বসলাম। বেলা তিনটা পর্যন্ত কাজ করলাম, এর-ওর কাজ দেখলাম, ফাইল দেখলাম।

সব কিছু অন্য দিনগুলোর মতোই যাচ্ছিল।

সাড়ে তিনটার দিকে হুট করে বাবা আমার চেম্বারে প্রবেশ করলেন। একটু অবাক হয়ে গেলাম, বাবা সাধারণত অফিসে আসেন না বহুদিন। একটু ভয়ও পেয়ে গেলাম, কী সমস্যা হল কে জানে?

"কী হয়েছে বাবা?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"অফিসে যাবি না মা," বললেন বাবা।

"আরে আমি তো..." বলতে বলতেই চারপাশের পরিবর্তনটা খেয়াল করলাম। কোথায় অফিস? আমি তো আমার ঘরে! চুপচাপ ল্যাপটপ নিয়ে বিছানাতে বসে আছি!

"কী রে মা? যাবি না? তোর শরীর খারাপ?"

"একটু পর," গম্ভীর কণ্ঠে বললাম আমি।

বাবা চলে গেলেন। আমার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছিলই না, দেয়াল ঘড়িতে কেবল এগারোটা বাজে! কিন্তু এই না আমি অফিসে ছিলাম?

অদ্ভুত ব্যাপার! তবে কি আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছিল? কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল শরীরটা ঠিক তেমনই ক্লান্ত লাগছিল, যেমনটা অফিস করলে হয়!

কী হলো তবে ব্যাপারটা?

নিজের মানসিক সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন জাগতে লাগল। বাবাকে কিছু বললাম না, এমনিতেই উনি বেশ অসুস্থ।

অফিসে ফোন করলাম, ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু ফাইলের ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। আমার সেক্রেটারি মিতার উত্তর শুনেই বুঝতে পারলাম যে আমি আসলেই অফিসে যাইনি!

"ম্যাডাম, কি আসবেন না আজ?" অবশেষে প্রশ্ন করল সে।

"দেখি, আপনাকে জানাচ্ছি, বাসায় একটু সমস্যা হচ্ছে," বলে ফোনটা রেখে দিলাম।

সেদিন আর অফিসে গেলাম না।

***

"সেদিন আর কোনো সমস্যা হয়েছিল?" একটা বিস্কুটে কামড় বসাল আফ্রিতা।

"নাহ! তবে সারাদিন অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।"

"আচ্ছা সেই রাতে আপনার ঘুম হয়েছিল?"

"এই প্রশ্ন কেন?" চমকে উঠল পুষ্পিতা।

"উত্তর দিন, কারণ আছে বলেই করেছি।"

"কী বলব আফ্রিতা," গলাতে একটা থমথমে ভাব এসে গেছে পুষ্পিতার, "আমার ইনসমনিয়া আছে, স্লিপিং পিলেও কাজ হয় না। কিন্তু সেই রাত থেকে কেন যেন বিছানাতে শুয়ে পড়লেই আমার ঘুম চলে আসছে। এর সঙ্গে কি ঘটনাটার কোনো যোগসাজশ আছে?"

"সম্ভবত.. ব্যাপারটা এখানেই শেষ?"

"না আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে গত কয়েক দিনে!"

"বলুন তবে।"

***

ঘটনা ২ – ফ্যাক্টরি? আন্দোলন?

পরের দিনের ঘটনা। বেশ সকাল সকাল অফিসে পৌঁছে গেলাম।

বুকের ভেতরটা এক অজানা আশঙ্কাতে কাঁপছিল!

কিন্তু ধীরে ধীরে কাজে ডুবে গেলাম। বেলা বারোটায় একটা মিটিং ছিল, সেটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সকালে গিয়ে আর কী।

মিটিংটা বেশ ভালোই হল। সব ক্লায়েন্টই আমাদের কাজে মোটামুটি খুশি। আসলে আমি এইসব ব্যাপারে বেশ কেয়ারফুল থাকি। ক্লায়েন্টরা যদি খুশি থাকে তবে আর প্রফিটের অভাব হবে না, তাই একটু বেশি সময় লাগুক, টাকা লাগুক, উনাদের খুশি রাখতে চাই সবসময়।

মিটিং শেষ হতে যাবে ঠিক সেইসময়ে আমাদের ম্যানেজার ধীরেনকাকুর মোবাইলে একটা কল এল। উনি বেশ পুরোনো লোক। বাবার সময় থেকেই উনি ম্যানেজার, তাই উনাকে আমি কাকুই ডাকি। মিটিং রুমে সবারই ফোন ধরা

নিষেধ। তাই বাইরে চলে গেলেন তিনি।

আমিও মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম।

তখনই বেশ থমথমে মুখে রুমে প্রবেশ করলেন উনি।

"ম্যাডাম একটু বাইরে আসুন, কথা আছে," আমার দিকে তাকিয়ে বললেন উনি।

"কী হয়েছে কাকু?" বের হয়ে বললাম আমি।

"খবর খুব একটা ভালো না মা, ফ্যাক্টরিতে সমস্যা শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে!" সবার সামনে আমাকে ম্যাডাম ডাকলেও, অন্যসময়ে মা বলেই ডাকেন উনি।

"কী বলেন, ওদের সঙ্গে কদিন আগেই আলোচনা হল?"

"আজ আবার ঝামেলা করছে কিছু লোক।"

"কী চায় ওরা?"

"ওরা চায় যে তুমি স্বয়ং গিয়ে ওদের কথা দাও যে ওরা যে দাবিগুলো করেছিল সেগুলো তুমি মেনে নিয়েছ।"

"নিয়েছিই তো! সেদিনই না আপনি গিয়ে বলে এলেন?"

"তা তো বটেই, তবে এখন ওরা বলছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে গিয়ে নিজে বলতে হবে!"

ক্লায়েন্টদের বেশ ভালো কিছু অর্ডার হাতে ছিল, কিছু অর্ডার ডেলিভারি দেওয়াও বাকি, সবমিলিয়ে এই সময়ে ওদের কাজ বন্ধ করে দেওয়াতে বেশ আপসেট হয়ে গেলাম আমি।

ধীরেনকাকুসহ আরও কয়েকজন নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দিলাম ফ্যাক্টরিতে।

ফ্যাক্টরিতে আর তেমন কোনো ঝামেলা হল না। আমি গিয়ে ওদের বোঝাতেই ওরা রাজি হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজও শুরু হল।

মূলত এখান থেকেই আমার খটকাটা শুরু।

এত সহজে তো কাজ হবার কথা না! আগেও এই নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি, এরা তো এত সহজে মানে না।

সব কিছু ঠিকঠাক হতে হতে দুপুর তিনটা বেজে গেল।

যাই হোক, সবাই মিলে বেরিয়ে আসব তখনই দেখলাম ফ্যাক্টরির প্রধান গেট দিয়ে ঢুকছে মিতা, আমার সেক্রেটারি!

"মিতা, তুমি এখানে?" অবাক হয়ে বললাম আমি।

"ম্যাডাম, আপনাকে ডাকতে এলাম, মিটিং এ যাবেন না?" হাসল সে।

মিটিং!

যা ভেবেছি তাই! আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম আমি আমার অফিস রুমে বসে আছি! দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটাতে কেবল সাড়ে এগারোটা বাজে!

মিটিং হয়ইনি! ফ্যাক্টরির আন্দোলন তো দূরের কথা।

***

"তার পর?" আফ্রিতার মুখে রহস্যময় হাসি।

"এর পর আর কী, মিটিংয়ে যাওয়ার আগে ধীরেনকাকুকে ডেকে জিজ্ঞাসা

করলাম ফ্যাক্টরির কী অবস্থা? উনি বললেন পুরোদমে কাজ চলছে। আসলে ওদের দাবি দাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকবার বসা হয়েছিল, তাই সমস্যা হয়নি আর।"

"দিনের শেষে পৃথিবীর কোনো মালিকপক্ষই শ্রমিকদের দাবি পুরো পূরণ করে না।"

"দেখো আমরা কিন্তু চেষ্টা করি ওদের সর্বোচ্চ সুবিধাটা দিতে।"

"নামমাত্র মূল্য শ্রম কিনে তারপর যে সুবিধা দেওয়া হয়... যাই হোক তারপর?"

"নামমাত্র মূল্য.. কী বলো..."

"বাদ দিন.. এটা গোটা পৃথিবীরই সমস্যা। তারপর কী হল?"

"আমি মিটিং শেষ করে বাড়ি চলে এলাম। এর পরের দুটো দিন আর অফিসে যাইনি। বাড়িতেই ছিলাম।"

"ওই দুদিন কোনো সমস্যা হয়েছিল?"

"না, বাড়িতেই বসে ছিলাম, বলতে গেলে দুটো দিন ঘুমিয়েই কাটিয়েছি!"

"আচ্ছা আঙ্কেল, এর আগের দিন সকালে আপনার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন না? এমনটা আর হয়েছে?"

"না আর হয়নি।"

"হুম..."

"কী মনে হয় তোমার?"

"সমস্যা তো একটা আছেই, কিন্তু পুরোপুরি না শুনে কিছু ঠিক করা যায় না।"

"কোনো প্রকার ব্ল্যাক ম্যাজিক জাতীয় কিছু? জানো একজন মাঝে মাঝেই বলে আমাকে দেখে নেবে, আমার অনেক বন্ধুদের সামনেও বলে।"

"কে?"

"সামির, আমার প্রাক্তন!"

"আমার মনে হয় না ব্যাপারটা কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিকের কারণে হচ্ছে, যাই হোক আর ঘটনা আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

***

ঘটনা ৩ - রাস্তা?

দুদিন বাসায় থাকলাম। তেমন কিছুই হল না।

মনের জোর ফিরে আসতে লাগল। হয়তো সব কিছুই আমার কল্পনা ছিল।

ফেসবুকে একটা ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে সামিরের অ্যাকাউন্টও দেখেছি এর মধ্যে। চাকরি-বাকরি নিয়ে বেশ ব্যস্ত মনে হল ওকে। মাঝে মাঝে কবিতাও লেখে।

বাবা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অফিসে কেন যাচ্ছি না। উনাকে বললাম অফিসে তেমন কোনো কাজ নেই, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। সত্য বলতে আসলেই ওই মিটিংটার পর কাজের চাপ একটু কমে গেছিল, তাই এই সপ্তাহে না গেলেও তেমন কোনো সমস্যা হত না।

তৃতীয় দিন সকাল সাড়ে দশটায় উঠলাম ঘুম থেকে। ছাদে উঠে বাবার ফুলের টবগুলো দেখলাম। বেশ সুন্দর ওগুলো, বাবার তো ফুলের খুব শখ। সঙ্গে রয়েছে

বেশ কিছু বনসাই, ওগুলোও বেশ সুন্দর।

নীচে নামলাম, নাস্তা করলাম। কিছুক্ষণ নেট ব্রাউজ করলাম, তারপর আবার ঘুম। উঠতে উঠতে দুপুর আড়াইটা বেজে গেল।

ঘুমটা ভাঙল আনিতার ফোনে।

আনিতা আমার খুব কাছের বান্ধবী, বেস্ট ফ্রেন্ড ঠিক না। কিন্তু তারপরেও ওর সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কলেজ থেকে চিনি মেয়েটাকে। খুবই মিশুক, সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল ও মানুষের মনের অবস্থা খুব ভালো বোঝে আর সে অনুযায়ীই কথা বলে। সেজন্য প্রথম পরিচয়ের কদিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে ভাব জমে গেছিল আমার। বর্তমানে একটা মোবাইল ফোন কোম্পানিতে আছে ও।

তো আনিতা বলল ও কদিনের ছুটি নিয়েছে। আমরা একটু ঘোরাঘুরি করলে কেমন হয়?

ফাঁকা দিন পেলে মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে ঘুরি। মুভি দেখি, শপিং করি এইসব আর কী। ব্যস্ত কর্পোরেট জীবনে এই বা কম কী?

ফোন পেয়ে প্রথমে একটু চিন্তাতে পড়ে গেলাম। বের হব? যদি কোনো সমস্যা হয়?

কিন্তু আনিতা জানাল যে ও নিজেই আমার বাড়িতে আসছে। অনেকদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি ওর, তাই একটু দেখা করবে। এর পর আমাকে নিয়ে বের হবে।

কী আর করা?

সম্ভবত চারটার দিকে ও বাড়িতে এল।

আমাদের বের হতে হতে পাঁচটা বেজে গেল। আমার গাড়িটা নিয়েই বের হলাম।

মুভি দেখলাম, শপিং করলাম, কিছু গল্পের বই-টই কিনলাম। গল্পের বই আমি তেমন পড়ি না। তবে আনিতা বেশ ভালোই পড়ে।

আমার একটা খুব বাজে অভ্যাস আছে। ধরো কেউ আমার সামনে কিছু কিনছে, সেই জিনিসটা আমিও কিনে ফেলি! তা সেটা যতোই অপ্রয়োজনীয় জিনিসই হোক না কেন!

একবারের ঘটনা শোনো, মার্কেটে আমার সামনে ক্রিকেট ব্যাট কিনছিল একটা অল্পবয়সি ছেলে। আমার মনে হল, একটা ব্যাট কিনলে কেমন হয়? কিনে ফেললাম!

এখন বাড়িতে আর ক্রিকেট খেলবে কে? ব্যাটটা ছাদে পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে বিড়াল-টিড়াল এসে বাবার টবগুলোর ক্ষতি করতে চাইলে উনি ওটা দিয়ে তাড়া দেন।

তাও তো একটা কাজে লাগছে!

কিন্তু অকাজেরও যে কত জিনিস কিনেছি! ইয়ত্তা নেই।

কেনাকাটা শেষে একটা রেস্টুরেন্টে দুজন মিলে পাস্তা আর নাচোস খেলাম। রাত সাড়ে নটার মতো বেজে গেল এসব করতে করতে।

রেস্টুরেন্টটার বেশ কাছেই আনিতার বাড়ি। ওকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেলাম, রেডিওতে 'দ্য স্মিথস'র একটা গান বাজছিল। খুব প্রিয় ব্যান্ড আমার।

সত্য কথা বলতে কী, সেই ভয়ের ব্যাপারটা একদমই মুছে গেছিল আমার মন থেকে।

সোয়া দশটার মধ্যে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। এর পরেই ভুলটা করলাম।

মেইন রোডের বামপাশে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। ওই রাস্তাটা দিয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এলাকাতে পৌছে যাওয়া যায়। ওই রাস্তার এলাকাটাও আবাসিক এলাকাই, রাস্তাতে মানুষজনও থাকে বেশ রাতের বেলাতে।

তাই কোনোকিছু না ভেবেই ওদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করলাম, রাস্তাঘাটে লোকজন একেবারেই নেই। এমনকি আশেপাশের বাড়িগুলোরও কোনোটাতে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না!

তখনও তেমন কিছু ভাবিনি, আজকাল ঢাকা শহরে অনেক এলাকার মানুষই খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

'ড্রিমলাইট কফিশপ' দেখতে পেলাম। ওটা একদম এই রাস্তার শেষে। ওখান থেকে ডানপাশে গেলেই আবার মেইন রোড।

কফিশপটাও বন্ধ। ওটাকে অবশ্য রাত নটার পর কখনোই খোলা দেখিনি।

ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। এর পরেই বড়ো ধরনের একটা হোঁচট খেলাম। কোথায় মেইন রোড? আমার তো মনে হচ্ছে সেই পুরোনো শর্টকাট রাস্তাটাতেই ফিরে এসেছি আমি!

গাড়ি চালিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই ড্রিমলাইট কফিশপ!

কী হল ব্যাপারটা? মনকে যতটা সম্ভবত বোঝানোর চেষ্টা করলাম। হয়তো আমি ডানদিকে ওই রাস্তা দিয়ে মেইন রোডে ওঠার সময় মনের অজান্তেই কোনো অন্য রাস্তাতে ঢুকে পড়েছি তাই এখানে আবার ফিরত এসেছি।

আবার ডানে গাড়ি ঘোরালাম।

কিন্তু আবার সেই পুরোনো এলাকা! আর আবার এসে পৌঁছলাম সেই ড্রিমলাইট কফিশপে।

এইবার ভয় না পেয়ে উপায় নেই! আশেপাশে কাউকে যে জিজ্ঞাসা করব সে উপায়ও নেই! পুরো রাস্তা ফাঁকা।

ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করলাম। বাবাকে ফোন দিয়ে ড্রাইভারকে পাঠাতে বলি, ও ড্রিমলাইট কফিশপ চেনে।

কিন্তু ফোনে 'নো নেটওয়ার্ক' দেখাচ্ছে!

ফোন অফ করে আবার অন করলাম! একই অবস্থা। সিম খুলে লাগালাম, তারপরেও নো নেটওয়ার্ক!

আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি যে আমার সঙ্গে আসলে কী হচ্ছে।

হুট করে মাথায় একটা বুদ্ধি আসল। ড্রিমলাইট কফিশপ থেকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলে কেমন হয়? যে মেইনরোড দিয়ে এখানে এসেছিলাম সেখানেই আবার উঠব, তারপর ওখান দিয়ে বাড়ি যাব।

ঘুরিয়ে নিলাম গাড়ি।

প্রায় দশ মিনিট ধরে গাড়ি চালানোর পরেও আমি সেই রাস্তার দেখা পেলাম না, যেখান দিয়ে আমি ঢুকেছিলাম।

বরঞ্চ কোথায় এসে পৌঁছোলাম? সেই ড্রিমলাইট কফিশপের সামনে!

কিন্তু আমি তো গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, উলটো পথে এখানে এলাম কী করে?

রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এতক্ষণে হয়তো বাবা চিন্তিত হয়ে ফোনও দিয়েছেন! আর মোবাইল বন্ধ পেয়ে উনি অনেক দুশ্চিন্তা করেন।

ফোনে তখনও কোনো নেটওয়ার্ক নেই। বুকের ভেতরটা যেন কেউ ক্রমাগত হাতুড়িপেটা করে চলছিল।

ঠিক তখনই কে যে জানালার কাচে নক করল।

তাকিয়ে দেখলাম একজন লোক,ভালো করে খেয়াল করে বুঝলাম উনি একজন ট্রাফিক পুলিশ।

জানালা নামালাম।

"ম্যাডাম, কোনো সমস্যা?" জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

"আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি," কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম আমি।

"কোথায় যাবেন আপনি?"

আমাদের এলাকার নাম বললাম।

"ওহ? ওখানে তো সোজা গেলেই হবে, এইখানে কেউ রাস্তা হারায়?" মৃদু হাসলেন উনি।

আশেপাশে তাকালাম। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই, কোথায় সেই শর্টকাট? কোথায় সেই নির্জন এলাকা? কোথায় ড্রিমলাইট কফিশপ?

আমি তখনও মেইন রোডেই দাঁড়িয়ে আছি।

মোবাইলটা বের করলাম। দিব্যি নেটওয়ার্ক পাচ্ছে, আর ঘড়িতে বেজে আছে দশটা পঁচিশ।

যাই হোক, উনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেইন রোড ধরেই বাড়ি ফিরে এলাম। শর্টকাটে যাওয়ার সাহস আর ছিল না!

***

"সেদিন রাতে কোনো অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন?" মোবাইল দেখতে দেখতে বলল আফ্রিতা।

"নাহ, এই কদিনে বলতে গেলে তেমন কোনো স্বপ্নই দেখিনি। বেশ ভালো ঘুম হয়েছে।"

"হুম, ব্যাপারটা বেশ ভয়েরই!"

"সেটাই, কাউকে বলতেও পারছি না, ওরা হয়তো হাসবে। বিশ্বাস তো দূরের কথা। বাবাকে বলব? উনি আবার এসব নিয়ে চিন্তা শুরু করবেন। এজন্যই তোমার কাছে আসা।"

"সেটাই, তারপর?"

"তারপর আবার একদিন বাড়িতে ছিলাম। তার পরের দিন একটু শপিংয়ে গেছিলাম, ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছিল। আর বাবাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছিলাম পরশু। একটা জিনিস খেয়াল করেছি সঙ্গে কেউ থাকলে কিছু হয় না।"

"হুম."

"চিন্তা করে দেখো, কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছি! সময়ের হিসাবও বদলে যাচ্ছে! এগুলো কী করে হচ্ছে? আমার নিজেরই নিজেকে পাগল মনে হয় মাঝে মাঝে। আচ্ছা আমার কি আসলেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটছে?"

"না, তেমন কিছু না। তবে আপনার ওপর কোনো কালো জাদু বা প্রেতশক্তির প্রভাব নেই।"

"কী করে বুঝলে?"

"একজন মানুষকে দেখেই অনেক কিছু বোঝা যায়।"

"তাহলে এসব কেন হচ্ছে?"

"সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। সমস্যা অন্য কোনো জায়গাতেও থাকতে পারে। যাই হোক, এর পর? আর কিছু ঘটেছে?"

"কাল আবার একটা ঘটনা ঘটেছে। তুমি কি জানো যে আমার মা চার বছর আগে মারা গেছেন?"

"হুম বললেন একটু আগে। তবে আগে জানতাম না। স্যরি।"

"ব্যাপার না, আমরা কেই বা কার কতটা খবর রাখি? যাই হোক, তখন আমি কিছুদিনের জন্য দেশে এসেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যাতে ভুগছিলেন মা, বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাও করানো হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর বাঁচলেন না।"

"হুম, খুব খারাপ লাগছে শুনে।"

"উনি মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। যাইহোক শোনো কালকের ঘটনাটা..."

***

ঘটনা ৪ – মা?

কালকে সারাটাদিন বাড়িতেই ছিলাম। 'রিক অ্যান্ড মর্টি'র প্রথম সিজনটা দেখে শেষ করলাম। বেশ কিছুদিন ধরেই ল্যাপটপে ছিল, কিন্তু দেখা হয়েছিল না। ভালোই লাগল।

বাবার সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথা-টথা বললাম। উনি আজকাল বলতে গেলে সারাটা দিনই ছাদে থাকেন, আর ঘরে থাকলে টিভি দেখেন। পুরোনো টিভি শোগুলো খুব প্রিয় উনার। বেছে বেছে ওগুলোই দেখেন।

উনি বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন অফিসে যাচ্ছি না। বললাম শরীরটা ভালো নেই।

অফিস থেকে বেশ কয়েকটা ফোন এল, তেমন কোন কাজও ছিল না সেখানে। আর আমি বলেই রেখেছিলাম যে এই সপ্তাহে আমার একটু সমস্যা, যেতে পারব না। তাই ধীরেনকাকুই সব সামাল দিচ্ছিলেন।

বিকাল চারটার দিকে ছাদে গেলাম। বাবা তখন দোতলাতে ঘুমাচ্ছিলেন।

আমাদের ছাদটা বেশ সুন্দর। তুমি যদি কখনও যাও বুঝতে পারবে। বাবার টবগুলোতেও নানান রঙের ফুল বনসাইগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে। বাবার

যে সংগ্রহ বাপরে বাপ!

সম্ভবত পুরো বাংলাদেশে এত বনসাই আর কারোই নেই। একবার তো একটা পত্রিকা থেকে সাংবাদিক এসে উনার সাক্ষাৎকারও নিয়ে গেছিল। ওই গাছগুলোই আজকাল বাবার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস বলতে পারো।

আসলে সারাটাদিন আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয় আমাকে ঘিরে ছিল। মানে বোঝোই তো, কখন আবার ওই জিনিসটা...

ছাদে বেশ অনেকক্ষণই রইলাম।

ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টের পুরোনো ছবিগুলো দেখছিলাম আর কী। স্মৃতিকাতরতা আসলেই অদ্ভুত জিনিস।

এই ধরো এখন আমি দুবছর আগের জিনিস দেখে বলছি, "ওহ, দুবছর আগে সময় কতোটা ভালো ছিল!" আবার দুবছর পর ধরো এখনকার জিনিস দেখে বলব, "আহ! ওই সময়টা কতটা ভালো ছিল।"

আসলে ব্যাপারটাই এমন। আমরা সবসময় আগের অবস্থাকে ভালো বলতে পছন্দ করি।

পুরোনো ছবিগুলো দেখতে দেখতে অনেকটাই হারিয়ে গেছিলাম, কখন যে সন্ধ্যা হয়ে এল বুঝতেই পারিনি।

ঠিক তখনই পরিচিত এক নারীকণ্ঠে আমার নাম শুনতে পেলাম, "পুষ্পিতা!"

মাথা তুলে অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য দেখতে পেলাম। ছাদের দেয়াল ঘেঁষে আমার মা দাঁড়িয়ে আছেন! আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছেন তিনি।

"অ্যাই পুষ্পি, ওখানে কী করিস? আয় এখানে আয়! কতদিন তোকে কোলে নিই না," আবার বলে উঠলেন তিনি।

মা আমার নামটাকে ছোট্ট করে 'পুষ্পি' বলে ডাকতেন। চোখে তখন প্রায় পানি এসে গেছে আমার। কতদিন আমার মাকে দেখি না।

উঠে দাঁড়াতে যাব তখন ব্যাপারটা এসে মাথায় ধাক্কা মারল! মায়ের অ্যাক্রোফোবিয়া ছিল। ছাদের প্রাচীর ঘেষে দাঁড়ানো তো দূরে কথা, বারান্দার গ্রিলের কাছেই যেতেন না উনি।

আর মা তো মারা গেছেন! তাহলে কে দাঁড়িয়ে আছে ওটা?

"আয় না মা, কাছে আয় না, তোকে কোলে নিতে খুব ইচ্ছা করছে," কাতর কণ্ঠে বলে উঠল মায়ের মতো দেখতে সেই জিনিসটা।

ঠিক এভাবেই মা আমার সঙ্গে কথা বলতেন, ওটার কণ্ঠটাও মায়ের মতো। কিন্তু ওটা মা না! আমি জানি!

গত কয়েকদিনের ঘটনা থেকে আমি বুঝেছি যে ওটা মা হতে পারে না!

এক ছুটে ছাদের দরজার কাছে চলে এলাম। নীচে নামার আগে একবার ঘুরে তাকালাম।

নাহ, প্রাচীরের ওখানে কেউ নেই।

"অ্যাই পুষ্পি, এদিকে তাকা," ছাদের ঠিক বামদিকটা, মানে যেদিকে বনসাইগুলো রাখা থাকে সেদিক থেকে শব্দ এলো।

তাকিয়ে দেখলাম ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা! মুখে ফুটে উঠেছে কুটিল হাসি।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নীচে নামলাম। তারপর দারোয়ানচাচাকে নিয়ে

আবার ছাদে উঠে এলাম।

নাহ কেউ নেই!

উনি বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন যে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। উনাকে আর সব খুলে বললাম না। শুধু বললাম এমনিই একটু ভয় পেয়েছি।

"সন্ধ্যাবেলা ছাদে আইতে হয় না মা, জোয়ান মাইয়া ছাওয়াল! খারাপ জিনিসের নজর পড়ে," বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লেন উনি।

উনাকে বলে একটা বেশ বড়ো তালা লাগিয়ে দিলাম সিঁড়িঘরের দরজাতে।

আমি জানি, যে আমার সঙ্গে এইরকম করছে সেই অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে এই তালা কোনো বাধাই নয়।

***

"এই তবে শেষ ঘটনা?" পুষ্পিতার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আফ্রিতা।

"হ্যাঁ, কালকের ঘটনা। দোতলা বাড়ি আমাদের, ছাদ খুব বেশি উঁচু না। বাড়ির সামনে একটা বাগানও রয়েছে। কিন্তু যে দুই জায়গাতে ওই জিনিসটাকে দেখা গেছে দুই জায়গার নীচটাই অনেকটা জংলামতো। এবং দুই জায়গাতেই কাঁটাগাছের বেশ ঝোপ রয়েছে। যদি পড়ে যেতাম, মারা না গেলেও..."

"তার মানে আপনি মনে করেন যে ওই জিনিসটা আপনাকে প্রাচীরের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে নীচে ফেলে দেওয়ার মতলবে ছিল?"

"ঠিক তাই! তোমার কী মনে হয়?"

"আপনাদের বাসায় যেতে হবে। আজ কি আপনার কোনো কাজ আছে?"

"আজই যেতে হবে?"

"এগুলো ব্যাপারে দেরি করা ভালো না।"

"খুব বড়ো সমস্যা কি?" পুষ্পিতার গলাটা কাঁপছে।

"দেখুন এই সমস্যাগুলোকে কখনোই ছোটো বা বড়ো বলে অভিহিত করা যায় না। কম শক্তিশালী হোক বা বেশি, কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি যদি মানুষের ক্ষতি করতে চায় তবে সেটাকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। আপনার কথা শুনে যা বুঝলাম ওটা আপনার ক্ষতিই করতে চায়। কিন্তু আপনার ওপর ওটার কোনো প্রভাবের চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে।"

***

গাড়ির ভেতর বেশ থমথমে একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। পেছনের সিটে চুপচাপ বসে আছে আফ্রিতা আর পুষ্পিতা।

ড্রাইভার শুধু গাড়ি ছাড়ার আগে একবার পুষ্পিতার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বাড়িতে?"

মাথা নেড়েছিল সে। তারপর আর কেউ কোনো কথাই বলেনি। আর এজন্য আফ্রিতাও বেশ কিছুটা দায়ী। গাড়িতে উঠেই ফেসবুকের নোটিফিকেশন চেক করতে শুরু করেছিল সে। তাই সম্ভবত পুষ্পিতা আর কিছু বলেনি।

"আচ্ছা, আপনি বিদেশ কেন গেছিলেন?" ফোনটা ব্যাগে ঢুকাল আফ্রিতা।

"মাস্টার্স করতে, গ্র্যাজুয়েশনে রেজাল্ট বেশ ভালো এসেছিল। একটু চেষ্টা করতেই কানাডার একটা মোটামুটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম।

তাই চলে গেলাম আর কী।"

"ওখানেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল?"

"অনেকটাই, মাস্টার্স শেষের পর একটা মোটামুটি চাকরিও জুটে গেছিল, স্থায়ী হওয়ারও প্রক্রিয়া চলছিল। তার মধ্যেই মা..."

"আচ্ছা, একটা কথা বলতাম, কিছু মনে করবেন না তো?"

"না না, বলো।"

"আপনার মায়ের সঙ্গে কি আপনার মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল? শেষের দিকে?"

"এটা কি আন্দাজে বললে তুমি? নাকি কারো কাছ থেকে শুনেছ? ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে রিলেটেড অনেকেই জানে।" ভ্রূ কুঁচকে গেল পুষ্পিতার।

"আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি তা আপনার সঙ্গে যা হচ্ছে তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর জন্যই। আর আপনার ব্যাপারে কারো সঙ্গেই কথা হয়নি। মা এক-দুবার বলেছিলেন, তবে তেমন না।"

"আসলে মার সঙ্গে আমার দূরত্ব ছোটোবেলা থেকেই ছিল কিছুটা। আসলে আমার মা-বাবার বিয়ের প্রায় সাত-আটবছর পর আমার জন্ম হয়েছিল। তো আমাদের দেশে এইক্ষেত্রে যা হয়, ওই বছরগুলোকে মাকে নানান কথা শুনতে হয়েছিল নানান জনের কাছে। আমার জন্মের পর মা একটু বদলে যান, বেশ রক্ষণশীল হয়ে পড়েন।

ছোটোবেলা থেকেই গান শিখতাম, ছবি আঁকতাম। এগুলোর কোনো কিছুতেই উনার মত ছিল না। কিন্তু বাবা সবসময়ই বেশ উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। উনার কারণেই আমি মূলত বেশ স্বাধীন একটা জীবন পেয়েছিলাম। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর মা একটা নতুন সমস্যা শুরু করলেন। নানানভাবে বিয়ের কথা বলতে লাগলেন, ভার্সিটির ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারেই নাকি মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে হয়, জানোই তো।"

"হুম, এগুলো এদেশে সব মেয়েকেই শুনতে হোক। সবমিলিয়ে আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার মানসিক দূরত্বটা আর কাটেনি?"

"নাহ!"

"এই কারণেই কি আপনি বিদেশে স্থায়ী হতে চাইতেন?"

"না, বাবা তো এখানে আছেন। আমি উনাদের একমাত্র সন্তান। আমার এখানেই থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সামির.."

"আপনার প্রাক্তন?"

"হ্যাঁ, দুমুখো সাপ ছিল ছেলেটা, বেশ বাজেভাবে চিট করেছিল আমার সঙ্গে। উফফ, মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। তাই ভেবেছিলাম দেশই ছেড়ে দেব। অনেকেই তো করে এমনটা।"

"হুম।"

"জানো, সামির এখনও আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, ফেসবুকে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে মেসেজ দেয়, নতুন নতুন নম্বর থেকে ফোন করে। শুরুতে বলতো আমাকে ফিরে পেতে চায় ও। হাহা!"

"তারপর?"

"তারপর আর কী, আমি বলে দিলাম কোনোভাবেই সেটা সম্ভব না! এখন সবাইকে বলে ও নাকি আমাকে দেখে নেবে!"

"দেখুন আপু, আপনার ওপর কোনো কালোজাদুর প্রভাব নেই। তবে একটা ব্যাপার সম্ভবত আমি বুঝতে পেরেছি!"

"কী?"

"আপনি যত ছোট্ট করে শেষের ঘটনাটা শেষ করেছেন আর যত তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। তা শুনেই আমি বুঝে গেছিলাম যে আপনার মায়ের প্রতি আপনার খুব একটা মায়া আর অবশিষ্ট নেই। স্যরি টু সে।"

"ইটস ওকে, মে বি ইটস ট্রু।"

"আর সম্ভবত এই কারণেই আপনিই বেঁচে গেছেন!"

"হোয়াট!"

"পরে বুঝিয়ে বলব," আবার মোবাইলে ডুবে গেল আফ্রিতা।

***

পুষ্পিতাদের বাড়িটা বেশ পুরোনো একটা দোতলা বাড়ি, বেশ অনেকটাই উঁচু।

বাড়ির সামনে একটা বেশ সুন্দর বাগান। সবই নানান রকমের ফুলের গাছ। নিম আর শিমুল গাছও দেখা যাচ্ছে কয়েকটা।

"এই বাগানটাও বাবার নিজের হাতেই বানানো। উনি শিমুল গাছও বেশ পছন্দ করেন। সম্ভবত ছোটোবেলাতে রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' গল্পটা পড়ে উনার এমন শখ হয়েছিল। তবে আজকাল এখানে খুব কম আসেন উনি, আলাদা মালি রাখা আছে এখানকার জন্য," মৃদু হাসল পুষ্পিতা।

বাগানের ঠিক মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়াল আফ্রিতা।

"কী হল?" বলল পুষ্পিতা।

কোনো উত্তর না দিয়ে বাগানের ঠিক মাঝখানের ট্যাপকলটার দিকে এগিয়ে গেল আফ্রিতা। ওটাতে একটা বড়পাইপ লাগানো, বাগানের গাছগুলো পানি দেওয়ার জন্য।

পাইপটা খুলে মুঠো ভরে পানি নিল আফ্রিতা। তারপর নাকের কাছে এনে শুঁকল।

"হুম, এই বাড়ির আলো, বাতাস আর পানিতে কোনো প্রেতশক্তির প্রভাব নেই!" পুষ্পিতার দিকে তাকিয়ে বলল আফ্রিতা, "কিন্তু তারপরেও এই বাড়িতে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির আনাগোনা আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে।"

একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা একতলার গেটটা খুলে দিল।

"ইতি ফুফু, বাবা কোথায়?" জিজ্ঞাসা করল পুষ্পিতা।

"উনি ছাদে ছিলেন এখন দোতলাতে, নাস্তা খেয়ে টিভি দেখছেন," বলে আফ্রিতার দিকে তাকাল মহিলা। অচেনা মানুষরা প্রথম দেখাতে বেশ অবাক হয়েই দেখে ওকে। কারণ স্বাভাবিক বাঙালি মেয়েদের চাইতে একটু বেশিই লম্বা সে।

"এটা রায়হান আঙ্কেলের মেয়ে, মনে আছে? ওই যে আসতেন?" ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল পুষ্পিতা।

"হ্যাঁ, ওই যে বেশ লম্বা ভদ্রলোক, ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দাবা খেলতে

আসতেন উনি!"

"আসসালামু আলাইকুম," মহিলার দিকে তাকাল আফ্রিতা।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমাকে খুব ছোটোবেলায় একবার দেখেছিলাম মা।"

"তাই? কবে?"

"ক্লিনিকে, সেবার ভাই বেশ অসুস্থ ছিলেন। তোমাকে নিয়ে উনাকে দেখতে এসেছিলেন তোমার বাবা!"

"আমার আসলে মনে নেই!"

"মনে থাকারও কথা না, তুমি অনেক ছোটো ছিলে। যাও ভেতরে যাও।"

নীচতলার বসার ঘরে গেল ওরা।

"উনি ইতি ফুফু, বাবার দুঃসম্পর্কের বোন। বিয়ে টিয়ে হয়নি, দীর্ঘকাল আমাদের বাড়িতে আছেন। উনিই বলতে গেলে ঘর সংসার সামলে রেখেছেন," সোফাতে বসল পুষ্পিতা।

"আপনি উনাকে সন্দেহ করছেন, তাই না?"

"ত...ত... তুমি কী করে বুঝলে?" চমকে উঠল পুষ্পিতা।

"আপনার চোখ, উনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। আসলে আপনি উনাকে মোটেও শ্রদ্ধা করেন না।"

"না না!"

"এমনই ব্যাপারটা।"

"হুম," আফ্রিতার দিকে তাকাল পুষ্পিতা, "সন্দেহ করাটা কি খুব অযৌক্তিক? উনি এখানে দীর্ঘকাল আছে, এখন কোনোভাবে আমাকে সরাতে পারলেই।"

"উনি আসলে এমন কিছুই করছেন না!"

"তাই?"

"হ্যাঁ, উনার মধ্যে তেমন কোনো প্রভাব দেখতে পাইনি আমি।"

"আচ্ছা, তুমি কি এসব দেখেই বুঝতে পারো?"

"হ্যাঁ!"

"কী করে?"

"সেটা বোঝানো যাবে না।"

"আচ্ছা, তুমি একটা কথা বললে না? বাড়িতে কোনো পিশাচের প্রভাব নেই, তারপরেও এখানে কোনো পিশাচশক্তির আনাগোনা আছে? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না!"

"আসলে যখন কোনো পিশাচশক্তির প্রভাব কোনো বাড়ি বা এলাকার ওপর থাকে তখন ওই বাড়ি বা এলাকার বাইরে ওর কোনো ক্ষমতা থাকে না। ওই অঞ্চলে যারা আসে তারাই ওর কোপে পড়ে, ওই অঞ্চলের বাইরে গেলে সে আর কিছুই করতে পারে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের ওপর প্রভাব থাকে, তবে ওই ব্যক্তি বা পরিবার পৃথিবীর যেখানেই যাক না কেন, ওই পিশাচও তাদের সঙ্গে চলে যায়!"

"তার মানে বলতে চাইছ,"

"হ্যাঁ, এখানকার কোনো ব্যক্তির ওপরেই পিশাচটার প্রভাব।"

"কিন্তু সে এখানে এসেছে কেন? কালো জাদু?"

"না, কালো জাদুর কোনো চিহ্ন নেই বাড়িতে.. অন্য কোন কারণে.. আর যদি আমার ধারণা ঠিক হয় মানে যে পিশাচের কথা আমি ভাবছি সেটাই যদি হয়, তবে কালোজাদুর কোন সম্ভাবনাই নেই।"

"কেন?"

"কালোজাদুতে কী করা হয়? আহ্বান করে ডেকে আনা কিংবা বশে থাকা কোন পিশাচকে মানুষের ক্ষতি করতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পিশাচকে আহ্বান বা বশ করা যায় না!"

***

দোতলার বামপাশের একটা ঘরে বসে আছেন বাহার উদ্দিন খান। ভদ্রলোককে বেশ কয়েকবার দেখেছে আফ্রিতা। তবে তেমন ভালোভাবে কথা হয়নি।

উনার বয়স সত্তরের ঘরে হবে, কিন্তু সেই অনুযায়ী শরীরটা এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ রয়েছে।

বর্তমানে উনার ওপরেই চোখদুটো আটকে আছে আফ্রিতার। ওর দৃষ্টিতে মিশে আছে বিস্ময়।

"বাবা, এই যে আফ্রিতা, রায়হান আঙ্কেলের মেয়ে," ঘরে ঢুকল পুষ্পিতা।

"এসো মা, এসো," উঠে দাঁড়ালেন বাহার সাহেব, "তোমাকে আমার বাড়িতে দেখবো সেটা কল্পনাও করিনি!"

পুষ্পিতার নজর তখন আফ্রিতার দিকে। হতভম্বের মতো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। যেন ঘোরে চলে গেছে।

"আফ্রিতা," বলে উঠল সে।

"হুঁ!"

"আফ্রিতা!"

"হুঁ!"

"অ্যাই আফ্রিতা," আফ্রিতার কাঁধ ধরে ঝাঁকি মারল সে।

"ওহ! আঙ্কেল, আপনাকে দেখতে এলাম আর কী," সামলে নিল আফ্রিতা। "আপু একটু বাইরে আসুন তো আমার মোবাইলটা চার্জ দিতে হবে! আঙ্কেল আমরা আসছি.." এই বলে পুষ্পিতাকে প্রায় টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল ও।

"হল কী?" অবাক হয়ে গেছে পুষ্পিতা।

"আস্তে আপু আস্তে, আপনাদের বাড়িতে এমন কোনো ঘর আছে যেটা পুরোপুরি ফাঁকা, একদম কিছুই নেই?" গলার আওয়াজ বেশ নামিয়ে বলল আফ্রিতা।

"উমম, হ্যাঁ একটা ঘর আছে, ওটা আগে গোডাউন ছিল। তবে পুরোপুরি ফাঁকা তো নয়, কয়েকটা পুরোনো হাঁড়ি-পাতিল আছে, দোতলাতেই ঘরটা।"

"এক্ষুনি গিয়ে আপনার কাজ হবে সবার আগে ওই ঘর থেকে যা আছে সব সরিয়ে অন্য কোথাও রেখে আসা। আর আপনারা চা খান, না কফি?"

"চাই খাই!"

"এখন চা করে আনলে আঙ্কেল খাবেন?"

"হ্যাঁ, বাবা চায়ের খুব ভক্ত।"

"আঙ্কেলের চায়ের কাপটা যেন আমাদের চাইতে আলাদা হয়... আমাদের দুটো কাপ একরকম রাখবেন? ঠিক আছে?"

"বাবার এমনিতেই একটা আলাদা কাপ আছে।"

"বেশ, আমাদের দুজনের কাপ যেন এক হয়, ঠিক আছে?"

"হুম... কিন্তু কেন?"

"পরে বুঝিয়ে বলছি। আপনি এখন গিয়ে ওই ঘরটা ফাঁকা করবেন আর চা বানাবেন আপু, ইউ গট টুয়েন্টি মিনিটস! এইটুকু সময় আঙ্কেলের সঙ্গে আমি কথা বলব।"

"আমি আসার পরই না হলে..."

"দেরি হয়ে যাবে, এইসব ব্যাপারে দেরি করা ঠিক না, আমি যা বলছি তাই করুন। আর এমনিও আপনি থাকলে সমস্যা হতে পারে।"

"তবে কী, ওহ গড!" চমকে উঠল পুষ্পিতা।

"হুঁ," মাথা নাড়ল আফ্রিতা।

***

"কেমন আছেন আঙ্কেল?" বাহারের বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটায় বসল আফ্রিতা।

"এই তো মা, তুমি?" একটু অস্বস্তিতে ভুগছিলেন বাহার, আফ্রিতা কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

"ভালো আছি আঙ্কেল, শোনেন আমার হাতে বেশি সময় নেই! আপনার সাহায্য দরকার।"

"কী ধরনের সাহায্য?" অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে বাহারের।

"আমার বাবার পুরোনো বন্ধু আপনি, উনি কিছু বিশেষ বিষয় নিয়ে মেতে থাকতেন মনে আছে? আপনার সঙ্গে যেহেতু এখনও আমাদের পরিবারের যোগাযোগ আছে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন আমার ব্যাপারে।"

"হ্যাঁ শুনেছি, তোমার মা বলেছেন। তুমি নাকি জায়গায় জায়গায় গিয়ে ওইসব জিনিস তাড়াও!"

"ব্যাপারটা তেমন না, আবার অন্যভাবে ভাবলে তেমনই।"

"তোমার বাবা বেঁচে থাকলে কি উনি এসব পছন্দ করতেন?"

"না করতেন না। উনি গুপ্তবিদ্যাকে গুপ্তই রাখার পক্ষে ছিলেন। আমি তেমন নই। আমার বিদ্যা যদি মানুষের উপকারে না লাগে তবে... যাই হোক আঙ্কেল সেরকম একটা সমস্যা আপনাদের সঙ্গে হয়েছে। আমি আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করব দয়া করে উত্তর দেবেন।"

"কী সমস্যা?" আঁতকে উঠলেন বাহার।

"সেসব সংগত কারণেই বলা যাবে না।"

"এজন্যই পুষ্পিতাকে কদিন ধরে বেশ চিন্তিত দেখছি!"

"কারণ সমস্যাটা তার সঙ্গেই হচ্ছে... আপনি আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, কারণ উত্তর আমি দিতে পারব না। যাই হোক, কদিন আগে সকালে আপনি এক বন্ধুর সঙ্গে বসার ঘরে বসে ছিলেন, ঠিক এই সময়ে পুষ্পিতা আপু আসেন আর আপনি উনার দিকে অবাক নজরে তাকিয়েছিলেন। ব্যাপারটা এতটাই অদ্ভুত ছিল যে আপু এখনও সেটা মনে রেখেছেন। আশা করি আপনারও মনে আছে!"

"হুম!" গম্ভীর হয়ে গেল বাহারের মুখ।

"কী দেখেছিলেন?"

"দেখো মা, আমার বয়স হয়েছে, এখন মাঝে মাঝেই ভুল দেখতেও পারি।"

"আঙ্কেল আপনি ভুল দেখেননি! দয়া করে খুলে বলুন," প্রায় ধমকে উঠল আফ্রিতা।

"হুম," একটু হচকচিয়ে গেলেন বাহার, "আমি পুরাতন টিভি-শোগুলো দেখছি আজকাল। সেদিনের আগে রাতে আমি পুরাতন একটা হরর শো, কী যেন নাম? ওহ, গুজবাম্পস দেখছিলাম। ওই পর্বটার নাম ছিল 'ইউ ক্যান্ট স্কেয়ার মি'। মাড মন্সটার মানে কাদার দানব নিয়ে পর্বটা। দুটো ছেলে তাদের সহপাঠী মেয়েকে ভয় দেখানোর কাদার দানব সাজে, কিন্তু সত্যিকারের দানবটা অনেক আগে থেকেই ওদের দেখছিল। মজার ছিল পর্বটা। সেদিন যখন পুষ্পিতা আমার সামনে এলো, কী দেখলাম জানো?"

"কী?"

"সেই কাদার দানবটা হেঁটে আসছে! প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম। তারপরেই ও যখন কথা বলে উঠল তখনই দেখলাম পুষ্পিতা দাঁড়িয়ে আছে! আমি ধরেই নিয়েছি ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিভ্রম!"

"সংকেত," আপনমনেই বলে উঠল আফ্রিতা।

"কীসের সংকেত?"

"পরে আঙ্কেল, পরে। আর একটা প্রশ্ন আছে, ওই দিনের আগে কি কোনো বিড়াল বা কুকুর জাতীয় প্রাণীকে আঘাত করেছিলেন আপনি?"

"তুমি কী করে জানলে?" প্রায় হাঁ হয়ে এল বাহারের মুখ।

"আঙ্কেল বেশি সময় নেই, বলে ফেলুন।"

"হ্যাঁ, ওর ঠিক আগের দিন দুপুরবেলা ছাদে পায়চারি করছিলাম। হুট করে দেখলাম একটা হুমদো বিড়াল আমার বনসাইগুলোর ওখানে মলত্যাগ করছে।মাথা ঠিক ছিল না, ছাদে পুষ্পিতার কিনে আনা একটা ব্যাট পড়ে থাকে সবসময়, ওটা তুলে নিয়ে দিলাম তাড়া। প্রস্তুত ছিল না বিড়ালটা, তাই একদম ছাদের প্রাচীরের দিকে দৌড় দেয় সে, তারপর ওটার ওপর দিয়েই লাফ দেয়।"

"তারপর?"

"আমার বাড়ির পেছনদিকে পড়ে ওটা, ওই দিকটা কাঁটাঝোপে পরিপূর্ণ। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ অদ্ভুত একটা আর্তনাদ করল বেড়ালটা, কেমন যেন অশুভ একটা ডাক। আমি প্রায় দৌড়ে নীচে নামলাম। আসলে ওটাকে নীচে ফেলে দেওয়ার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি শুধু ওটাকে তাড়াতে চাইছিলাম!"

"তারপর?"

"কাঁটাগাছের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছিল ওটার দেহ আর পড়েওছিল বেশ শক্ত জায়গায় ওপরে। বহুকালের পুরোনো কিছু ইটের খোয়া রয়ে গেছে তো সেখানে তাই জায়গাটা অমন। সবমিলিয়ে প্রায় মরমর অবস্থা বিড়ালটার। আমি অনেক কষ্ট করে ওটাকে তুলে সামনের বাগানে নিয়ে আসি। আর দুই-তিন মিনিট পরেই ওটা মারা যায়!"

"হুম!"

"তারপর আমি আর মালি মিলে ওটাকে বাগানেই কবর দিয়ে দিই।"

"পুষ্পিতা আপু জানেন না, তাই না?"

"নাহ, ওকে জানাইনি। পশু-পাখি খুব ভালোবাসে ও, শুনলে রাগারাগি করত আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও বেশ অপরাধবোধে ভুগছিলাম তাই জানাইনি!"

"যাক এবার সব বুঝলাম।"

"কী হয়েছে? ওই বিড়ালটার মৃত্যুর কারণেই কী?"

"পরে বলব।"

এই সময়ে একটা ট্রে-তে তিন কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে ঢুকল পুষ্পিতা।

"দিন আপু, আমার হাতে দিন," বলে ট্রেটা নিজের হাতে তুলে নিল আফ্রিতা। তিন কাপ চা, দুটো কাপ নীল রঙের আর আকারে ছোটো। আর একটা কাপ লাল রঙের ওটা আকারে বড়ো। ওটাই বাহারের কাপ।

পুষ্পিতা বসল বিছানার সামনে রাখা আর একটা চেয়ারে।

দুই সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থেকে তারপর নিজের বাম হাতের বুড়ো আঙুলটা সেই কাপে ছোঁয়াল আফ্রিতা। ব্যাপারটা এতই তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে বাকি দুজন খেয়ালই করল না।

সেটা বাহারের হাতে তুলে দিয়ে বাকি দুটো কাপের একটা কাপ পুষ্পিতার হাতে দিয়ে একটা সে নিল।

চুপচাপ চা খেয়ে যেতে লাগল ওরা। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে পরিবেশ।

হুট করে চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে দিলেন বাহার। উনার ভাবভঙ্গি পুরো বদলে গেছে, চোখের কেমন শূন্য দৃষ্টি।

"কী হল বাবা? শরীর খারাপ করছে?" প্রায় লাফিয়ে উঠল পুষ্পিতা।

"আপু," পুষ্পিতাকে হাত ধরে বসিয়ে দিল আফ্রিতা, "উনার আত্মাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন উনার শরীরটা আমার নির্দেশ মান্য করবে। উনার অবস্থা অনেকটা জিন্দা লাশ কিংবা জম্বির মতো!"

"কীহ! ওহ গড! এটা কেন করলে? আমার বাবার যদি কিছু হয়ে যায়?" চিৎকার করতে লাগল পুষ্পিতা।

"আপু, আমার ওপর ভরসা রাখুন, উনার কিছু হবে না। উনার ভালোর জন্যই এটা করা হয়েছে।"

"এতে উনার কী ভালো হবে শুনি?"

"আমি বলেছিলাম না যে ওই জিনিসটা প্রভাব এই বাড়ির কোনো মানুষের ওপর রয়েছে? সেই মানুষটা আসলে উনি!"

"হোয়াট!" মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল পুষ্পিতা।

***

একটু ধাতস্থ হয়েছে পুষ্পিতা। বাহার বিছানায় বসে আছেন, শূন্য দৃষ্টি তাঁর চোখে, পলক পড়ছে না।

"এই সব কিছু জন্য যে অতিপ্রাকৃত শক্তিটা দায়ী সেটা হল একটা 'ছলাবা'," বলতে লাগল আফ্রিতা, "এরা মানুষের সঙ্গে ছল করে, মানুষের স্মৃতি পড়তে পারে

আর সেখান থেকে এমন সব জিনিসপত্র মানুষের সামনে তুলে ধরে যাতে করে মানুষ ভুল করে। এজন্যই এদের নাম ছলাবা। এরা সাধারণত মানুষের ওপর ভর করে না, কিছু বিশেষ কারণ ছাড়া। আপনার বাবা সেরকমই একটা কাজ করে ফেলেছেন। ছলাবা মানুষের ওপর ভর করে তার দেহ আর আত্মার গন্ধ শুঁকে।”

“আত্মার গন্ধ?”

“আত্মারও গন্ধ আছে, বেশিরভাগ প্রেতশক্তিই এই জিনিসটা বুঝতে পারে। আপনার বাবার আত্মা ঘুমিয়ে গেছে, এখন শুধু উনার দেহের গন্ধ শুঁকে ছলাবা আসতে পারবে না। ও যাতে না আসতে পারে সেজন্যই এই কাজটা করলাম। এখন আপনাকে সব খুলে বলতে পারি।”

“বাবার ওপর ভর করেছে, তাহলে আমাকে কেন জ্বালাচ্ছিল?”

“এখানেই অন্য অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলোর সঙ্গে ছলাবার পার্থক্য, এরা যদি মানুষের ওপর ভর করে তাহলে ওই মানুষটাকে কিছুই করে না। হ্যাঁ, নিজের কাজ শুরু করার আগে একটা সংকেত দেয় সে ওই মানুষটাকে। এরা নিজের ছলা-কলা দেখানোর জন্য বেছে নেয়, যার ওপর ভর করেছে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে। যেমন আপনি!”

“এটা আসলে কী? কোনো প্রেত? অতৃপ্ত আত্মা?”

“আসলে কেউ বলে এরা অতৃপ্ত আত্মা, কেউ বলে এরা দুষ্ট জিন আবার কেউ বলে এরা অপদেবতা। কিন্তু আসলে যে এরা কী সেটা বুঝে ওঠা এখনও সম্ভব হয়নি। কারণ এরা কখনোই মানুষের বশে আসে না। যে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মানুষ বশ করতে পারে না সেটা যে আসলে কী তা বুঝে ওঠা অসম্ভব! তবে হ্যাঁ, ছলাবাকে নিয়ে বেশ কিছু কাহিনি প্রচলিত আছে। সেগুলো শুনবেন? একজন মানুষের আত্মাকে ঘুম পাড়ালে ঠিক আধাঘণ্টার আগে তার শরীরকে কোথাও নিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। কারণ হঠাৎ করে সেই আত্মার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আধাঘণ্টা পর আর সেই সম্ভাবনা থাকে না। এর পর যতটা সময় দরকার আত্মাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। সেই সময়টা ছলাবার গল্প বলি? কেমন?”

“কী আর বলব,, এখন তো তোমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায়ও নেই!”

“সেটাই, শোনেন ছলাবা কী এবং সে কোথা থেকে এসেছে এই নিয়ে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত কিংবদন্তিটি হল আমেরিকার শোশোনে গোত্রের কাহিনিটা। এরা বলে বহুকাল আগে এক বুড়ি থাকত একটি গ্রামের বাইরে। অনেক জ্ঞানী ছিল সেই বুড়ি। ছোট্ট এক ঝুপড়িতে বাস করত সে। কোনো পথিক যদি পথ হারিয়ে তাঁর কাছে আসত তবে সে ওই পথিককে খাইয়ে-দাইয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে দিত। পুরো এলাকার এমন কোনো রাস্তা ছিল না যে চিনত না। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, বুড়ি কখনোই কাউকে নিজের ঝুপড়িতে ঢুকতে দিত না। মানুষের সঙ্গে সে বাইরেই কথা বলত, বাইরেই তাদের খেতে দিত। তো একদিন হল কী, এক গোত্রের সর্দারের ছেলেটা হারিয়ে গেল। সব জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে এক সময়ে সর্দারের লোকেরা সেই বুড়ির ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এখন ব্যাপার হল ওই অঞ্চলের অনেকেই মনে করত যে বুড়িটা একটা ডাইনি, সে ছোট বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে। সর্দার আর তার লোকেরা বুড়ির ঝুপড়িতে ঢুকতে চাইল। কিন্তু বুড়ি কোনোভাবেই তাদের ঢুকতে দেবে না,

সে শুধুই বলে যেতে লাগল, 'আমার ঘরে ঢুকো না, আমাকে কিছুটা সময় দাও, আমি জানিয়ে দিচ্ছি বাচ্চাটা কোথায়!' এই কথা শুনে সর্দারের আরও বিশ্বাস হয়ে গেল যে বুড়িটাই ওই বাচ্চাটাকে লুকিয়ে রেখেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছুরিটা বসিয়ে দিল বুড়ির বুকের মাঝখানে। তীব্র এক আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বুড়ি। ওরা সবাই বুড়ির ঝুপড়িতে ঢুকল। কিন্তু সেখানে তেমন কিছুই নেই, এক জায়গাতে শুধু কিছু পুরোনো জামাকাপড়, আর ঝুপড়ির মাঝখানে একটা ছোট্ট জায়গাতে উনুন জ্বলছে! ওরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল প্রচণ্ড রক্তপাতে বুড়ি মারা গেছে! নিজের গ্রামে ফিরে সর্দার কী দেখল জানেন?"

"কী?"

"ওর ছেলেটা গ্রামে চলে এসেছে! আসলে একটু দূরের একটা গ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গেছিল সে। সেদিন রাত থেকেই শুরু হল অদ্ভুত সব ঘটনা। সেই গ্রাম আর আশেপাশে গ্রামের লোকেরা হুট করেই হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা হারিয়ে ফেলতে লাগল। কেউ কেউ বাড়ি মনে করে পুকুর আর নদীর ঝাঁপিয়ে প্রাণ দিল, কেউ স্ত্রী মনে করে বাইসনকে জড়িয়ে ধরে আহত হতে লাগল। একটা সময়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে পুরো এলাকাটাতে কেউ বাড়ি থেকে বের হলে আর সঠিক পথের সন্ধান পেত না। অবশেষে সবাই মিলে এক ওঝার কাছে গেল। ওঝা জানাল যে ওই বুড়িটাকে অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে সেজন্যই ওর আত্মা প্রতিশোধ নিচ্ছে। যে বুড়ি বেঁচে থাকতে মানুষদের সঠিক রাস্তা দেখাত সে বুড়িই মরে গিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। সে আরও বলে, ওই বুড়ির আত্মার কোনো মৃত্যু নেই! শোশোনেরা এই অভিশপ্ত আত্মাকে বলে 'লিবঙ্গুকা'। এখনও ওরা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে একটা বিশেষ মন্ত্র পড়ে বের হয়, যাতে লিবঙ্গুকা ওদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে। কেমন লাগছে শুনতে?"

"কেমন আবার লাগবে? আমার বাবার এই অবস্থা," বিরক্ত হয়ে বলল পুষ্পিতা।

"গোটা পৃথিবীর নানান দেশেই ছলাবার উপদ্রবের কথা শোনা যায়। এদের উপদ্রব প্রধানত হাইওয়েতে হয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই শোনেন না হুট করেই গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটছে? অনেকগুলোই ছলাবার কারণে হয়। ছলাবা কিন্তু নিজের শক্তি দিয়ে কোনো দৃশ্য তৈরি করতে পারে না, আপনার মন থেকেই কিছু দৃশ্য এনে বারংবার আপনার চোখের সামনে তুলে ধরতে থাকে। সময় যতটা যেতে থাকে ছলাবা ঠিক ততটাই মনের গভীরতম অন্ধকার কোণগুলোতে ঢুকে যায় আর সেখানকার দৃশ্যগুলো তুলে আনে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে... ছল করে... কোন দৃশ্য যে ছলাবা কখন দেখাবে সেটা বোঝা মুশকিল, তবে ওর উদ্দেশ্য একটাই, ক্ষতি করা। আমাদের দেশেও নানান রাস্তাতে এমন ঘটনা ঘটেছে জানেন। ২০০5 দুর্ঘটনা কবলিত এক ট্রাক ড্রাইভার মারা যাওয়ার আগে বেশ অদ্ভুত কথা বলেছিল পুলিশকে। প্রায় ফাঁকা রাস্তাতেই কোনো কারণ ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসকে ধাক্কা দিয়েছিল ট্রাকটি। গুরুতর আহত ড্রাইভার বলেছিল যে হুট করেই সে দেখতে পেয়েছিল যে সে তার গ্রামের রাস্তাতে ট্রাক চালাচ্ছে আর সামনে একটা পুকুর! ট্রাক যাতে পুকুরে না পড়ে সেজন্য নাকি সে ঘুরিয়েছিল! ওর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, সবাই ভেবেছিল ও মদ খেয়ে আছে।"

"হুম!"

"কোনো মানুষকে খুব বেশি অপছন্দ করলে ছলাবা শুরুতেই তাকে এমন কিছু দৃশ্য দেখায় যেগুলোতে সে ভয় পাবে। সেই হিসাবে আপনাকে সে খুব বেশি অপছন্দ করেছিল বলা যায় না, হাহা! ছলাবার কারণে সবচেয়ে কুখ্যাত রাস্তা হলো ভারতের ঝাড়খণ্ডের ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৩, ২০১০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো লোক ওই রাস্তাতে দুর্ঘটনাতে মারা গেছে। নিখোঁজও হয়েছে প্রচুর। বিশেষ করে ওই রাস্তাতে ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আর একটি রাস্তা আছে, ওটা এতটাই ভয়াবহ যে রাজ্য সরকার ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে! হিন্দিতে ওরা ছলাবাকে বলে 'ছালাওয়া'।"

"আর কিছু? আচ্ছা বাবা কী করে এটার পাল্লাতে পড়লেন?"

"হুম, ছলাবা প্রায় সারাটা দিনই মানুষকে ভয় দেখাতে পারে, বাইরে থাকতে পারে। শুধুমাত্র ভোর রাত থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত সে আর প্রকৃতিতে থাকতে পারে না। ওই সময়ে সে করে কী, কোনো বিড়াল বা কুকুরের শরীরে আশ্রয় নেয়। ওই বিড়াল বা কুকুর যেখানেই থাকুক না কেন, ভোররাতে ছলাবা তার শরীরে গিয়ে ঢুকে যায় আর সূর্য উঠলে আবার বেরিয়ে আসে। এতে করে ওই কুকুর বা বিড়ালের কোনো ক্ষতি হয় না। আপনাকে বলেছিলাম না যে ছলাবা কখনও কারও ওপর ভর করে না। সে রাস্তাতে থাকে আর মানুষদের সঙ্গে ছলা-কলা করে, কিন্তু কেউ যদি সেই প্রাণীটাকে মেরে ফেলে যার শরীরে ছলাবা আশ্রয় নিত, তবে সেই লোকের ওপর ছলাবা ভর করে। আপনার বাবা কদিন আগেই তাঁর প্রিয় গাছগুলোকে নষ্ট করার জন্য একটি বিড়ালকে তাড়া করেন, টাল সামলাতে পেরে ছাদ থেকে পড়ে যায় বিড়ালটি! এবং মারা যায়। সম্ভবত ওই বিড়ালের শরীরেই এই ছলাবাটি থাকত।"

"ওহ গড!"

"তারপরের দিন সে মানুষটিকে একটি সংকেত দেয়, তার আগমনি বার্তা অনেকটা।"

"কী ধরনের সংকেত?"

"বলেইছি যে ছলাবা যার ওপরে ভর করে তার সঙ্গে ছল করে না। বরং তার প্রিয় একটি মানুষকে নিজের শিকার বানায়। সেই প্রিয় মানুষটি যখন ছলাবা আসার পর প্রথমবার সেই মানুষটির সামনে আসে তখন ছলাবা সেই প্রিয় মানুষটির রূপ বদলে দেয়! ওই একবারই যে লোকের ওপর ও ভর সে ভয় পায়! মনে আছে আপনার বাবা আপনার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন?"

"আরে হ্যাঁ! ওভাবে তো বাবা আমার দিকে আগে কখনো তাকাননি!"

"এই যে যার ওপর ভর করে আর যাকে ভয় দেখায় তারা দুজন এক জায়গাতে এলেই সেই জায়গাতে ছলাবার শক্তি সবচেয়ে বেশি থাকে, সেজন্য ওখানে ওকে নিয়ে কথা বলাটা নিরাপদ না। এজন্যই আপনাকে চা করতে পাঠিয়েছিলাম।"

"কিন্তু এখন তো আবার আমি আর বাবা একসঙ্গে!"

"উনার আত্মা ঘুমন্ত... এই সময়ে ছলাবা কিছু করতে পারবে না! আমাদের কথাও শুনতে পারবে না, কারণ যার ওপরে সে ভর করেছে তার আত্মার নাগালই সে পাচ্ছে না।"

"এখন? তবে কী করব?"

"আঙ্কেল বসে আছেন না? উনার শরীর থেকে উনার শার্টটা খুলে নিন, ও বাকি কাজ করছি। এখনও প্রায় আট-দশ মিনিট বাকি আধাঘণ্টা হতে।"

***

"হুম, এখন করা যায়," মোবাইলে সময় দেখল আফ্রিতা, "আপনি এক কাজ করুন, উনার শার্টটাকে উনার মাথার ওপর মেলে ধরুন।"

"কেন?"

"ধরুন তো!"

খয়েরি রঙয়ের শার্টটাকে বাবার মাথার ওপর ধরল পুষ্পিতা।

সেদিকে একদৃষ্টিতে চাইল আফ্রিতা, তারপর বলল, "অকটেসসা ইখানা।"

বাহারের শরীর থেকে হঠাৎ অদ্ভুত একটা লালচে আলো বেরিয়ে গিয়ে গিয়ে প্রবেশ করল শার্টটাতে।

"কী হল এসব?" অবাক হয়ে পুষ্পিতা।

"ছেড়ে দিন শার্টটা!"

"ওমা, ছাড়লে তো উনার মুখের ওপর পড়বে!"

"ছাড়ুন তো!"

শার্টটা ছেড়ে দিল পুষ্পিতা আর ওকে অবাক করে দিয়ে ওখানেই ভেসে রইল সেটা! যেন কোনো অদৃশ্য মানুষ ওটাকে ওইভাবে তুলে ধরে আছে।

"এমা! এসব কী?" পুষ্পিতার গলা কাঁপছে।

"উনার শরীরের গন্ধ তো ছিল শার্টটাতে, এবার আত্মার গন্ধও প্রবেশ করল। আপনাদের সেই ঘরটা পুরো ফাঁকা করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ," কোনোমতে মাথা নাড়ল পুষ্পিতা।

"চলুন, নিয়ে চলুন আমাকে। আঙ্কেল এখানেই থাকুক।"

"শার্টটা?"

"ওটাও আমাদের সঙ্গেই যাবে।"

এগোতে লাগল পুষ্পিতা, তার পিছে পিছে আফ্রিতা। আর ওদের পিছে পিছে সেই শার্টটা হাওয়ায় ভেসে ভেসে যেতে লাগল।

***

ঘরটা আকারে বেশ বড়ো। তবে খুব পুরোনো। এখানে-সেখানে মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে, বোঝাই যায় এখানে দীর্ঘকাল কেউ থাকেনি।

ঘরটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল আফ্রিতা, সেই শার্টটাও ঘরের একপাশে বাতাসে ভেসে রয়েছে।

"আপু আপনি বাইরে যান," ঠান্ডা গলাতে বলল আফ্রিতা।

"কেন?" একটু অবাক হলো পুষ্পিতা।

"আমি এখন সেই ছলাবাটাকে আহবান করব, আপনার থাকাটা ঠিক হবে না, আমি ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি। আর একটা কথা মনে রাখবেন।"

"কী?"

"এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি বের না হই, তবে বুঝে নেবেন যে খারাপ কিছু

হয়েছে। তখন তাড়াহুড়ো করে দরজা ভাঙতে যাবেন না, উপযুক্ত কাউকে ডেকে আনবেন, এমন কাউকে যে এসব পারে। কারণ ছলাবা ঘরের মধ্যেই থাকবে!"

"কিন্তু তুমি কেন বাইরে আসবে না?"

"আসব না কখন বললাম? বললাম যে না-ও আসতে পারি। অনেক কিছুই হতে পারে। যান আপনি এখন," প্রায় আদেশের সুরে বলল আফ্রিতা।

ঘরের বাইরে চলে গেল পুষ্পিতা।

দরজা লাগিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আফ্রিতা। তারপর ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট লোহার তালা আর চাবি বের করল। লোহার তালা ভেঙে ছলাবা কখনও বের হতে পারে না, তাই এই তালাতে কোনো শক্তি প্রয়োগ করার দরকার নেই। তালাটা লাগিয়ে চাবিটা ব্যাগে তুলে রাখল ও।

তারপর ঘুরে দাঁড়াল, সেই ভেসে থাকা শার্টটার দিকে।

"আন্তি লু মিজা," চোখ বন্ধ করে বলল আফ্রিতা। তারপর তিনবার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা ওঠা-নামা করল।

ধুপ করে বেশ আস্তে একটা শব্দ হল, তারপর ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতে লাগল আফ্রিতার। পুরো ঘরের তাপমাত্রা হুট করে নেমে গেছে।

চোখ খুলল আফ্রিতা, সেই শার্টটা ঝুলে আছে, তবে ওটার দুইপাশটা কেমন যেন নেমে গেছে। কোনো মানুষের মাথার ওপর একটা শার্ট দিলে যেমন করে ঝুলে পড়ে ঠিক তেমন।

আত্মা আর শরীরের গন্ধ চিনতে পেরে ওই শার্টটাকেই বাহার মনে করেছে ছলাবা। ছলাবার কোন আকৃতি নেই, নেই কোনো চেহারা।

ধাতস্থ হতে এখন বেশ কিছুটা সময় লাগবে ওর।

চিন্তা করতে লাগল আফ্রিতা। ছলাবাকে কখনোই শেষ করা যায় না! যে রাস্তাগুলোতে এদের প্রভাব থাকে সে রাস্তাগুলোকেও কোনোভাবেই এদের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। আর যদি কোনোভাবেই কোনো মানুষের ওপর এটা ভর করে তবে সেই মানুষটার প্রিয় মানুষকে না মেরে ফেলে ছলাবা যায় না।

আর যদি এর মধ্যে অন্য কেউ ছলাবাকে তাড়ানোর চেষ্টা করে তবে ছলাবা সেই মানুষকেই মেরে ফেলে!

এইসব কথা পুষ্পিতাকে বলেনি সে। নিজেও খুব একটা ভাবেনি, আসলে কেসের শুরুতে কখনোই সে এসব ভাবে না। কিন্তু এখন ভাবতে হচ্ছে।

কী করবে সে?

ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা লাল আলো বেরিয়ে এল সেই শার্টটা থেকে।

এত তাড়াতাড়ি! অসম্ভব!

কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই আলো গ্রাস করে ফেলল আফ্রিতাকে।

***

খুব ধীরে ধীরে বাবার ঘরে ঢুকল পিচ্চি আফ্রিতা।

পুরো ঘরটা কেমন যেন আধো-অন্ধকার হয়ে আছে। বাবার গলা শুনতে পাচ্ছে সে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন তিনি।

আর একটু এগিয়ে গেল আফ্রিতা। দেয়ালে একটা বিশাল আয়নার মতো কী

যেন, সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা। আয়নাতে উনার প্রতিবিম্ব নেই, বরং ওখানে ফুটে উঠেছে একটা বিকট আকৃতির মাথা!

বিন্দুমাত্র চুল নেই সেই মাথাতে। চোখের জায়গাতে দুটো শূন্য কোটর। শুধু মুখ নাড়ছে জিনিসটা, কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু ওর বাবা বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছেন সেটার দিকে।

তবে কি উনি কথা শুনতে পাচ্ছেন?

আর একটু এগিয়ে গেল আফ্রিতা।

এ কী! সেই অদ্ভুত মাথাটা কেমন যেন ক্রূর চোখ ওর দিকে তাকাল, তারপর মিলিয়ে গেল। আয়নাটায় ভর করল নিঃসীম আঁধার।

ওর দিকে ঘুরে তাকালেন বাবা। ভয় লাগছে আফ্রিতার! বাবা কি ওকে বকবে এখন?

"আফ্রো, তুমি এখানে কী করো?" মুচকি হেসে ওর ছোট্ট শরীরটাকে কোলে তুলে নিলেন বাবা।

"বাবা, ওটা কে?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল সে।

"ওটা? তুমি বুঝবে না মা!"

গাড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে স্কুলের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আফ্রিতা।

বামপাশে দাঁড়ানো মেয়েগুলোর মধ্যে একজন হুট করেই ডেকে উঠল, "জিরাফ!" ওর সঙ্গে সঙ্গে বাকিরাও কোরাসে বলে যেতে লাগল, "জিরাফ! জিরাফ!জিরাফ!"

অনেক বেশি লম্বা আফ্রিতা। মোটে ক্লাস ফাইভে পড়ে সে, কিন্তু এখনই অনেকেই ওকে ক্লাস নাইন-টেনের মেয়ে বলে ভুল করে।

আমাদের দেশের একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার হলো কেউ একটু আলাদা হলেই সেটা নিয়ে সবাই মজা করতে থাকে। এতে করে মানুষটা কষ্ট পেলেও কারওরই কিছু যায় আসে না।

গেটের সামনেও কতগুলো মেয়ে সমানে, "জিরাফ, জিরাফ" বলে চলেছে।

আফ্রিতার এগুলো গা-সওয়া হয়ে গেছে।

হুট করেই ওর নজর পড়ল গেটের একদম সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোকের দিকে। লোকটা বাদামওয়ালা, কিন্তু ওর কাছ থেকে কেউ বাদাম কিনছেই না। আশেপাশে আরও কয়েকজন বাদামওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার কাছেই অনেক ভিড়।

শুধু ওই লোকটার কাছেই কেউ যাচ্ছে না, যেন কেউ ওকে দেখতেই পাচ্ছে না।

আফ্রিতারও আজ বাদাম খেতে ইচ্ছা করছে। সে ওই লোকটার দিকেই এগিয়ে গেল, অন্য লোকগুলোর কাছে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে। সেখানে গেলেও ওরা খ্যাপাবে।

লোকটা বেশ অদ্ভুত। চেহারাটাও বেশ মার্জিত রকমের। দেখে মনেই হয় না যে সে বাদাম বেচে।

"পাঁচ টাকার বাদাম দিন তো আঙ্কেল," বলল আফ্রিতা।

"আমি জানি তুমি সবার চেয়ে আলাদা, তুমি আলাদাই থেকো," ওর দিকে

তাকিয়েই বাদাম মাপতে লাগল লোকটা।

"কী?"

"তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে," আফ্রিতার হাতে প্যাকেটটা তুলে দিল সে। ওর হাত থেকে টাকা না নিয়েই হনহন করে হেঁটে চলে গেল লোকটা।

আফ্রিতার কেন যেন মনে হচ্ছে আর কোনোদিনই ও এই লোকটাকে স্কুলের সামনে দেখতে পাবে না!

***

পা টিপে টিপে বাবার ঘরে ঢুকল আফ্রিতা।

আজ সকালবেলাতেই বাবা একটা অদ্ভুত রকমের সিন্দুক নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। সবাইকে বারবার মানা করে দিয়েছেন যেন কোনোভাবেই কেউ সিন্দুকটা না খোলে।

এমনিতেই বাবা না থাকলে উনার ঘরে ঢোকে না। এমন উদ্ভট জিনিসপত্র বাবা মাঝে মাঝেই আনেন। তবে এর আগে কখনও এত আগ্রহ জন্মায়নি আফ্রিতার।

কদিন পরেই ওর এস.এস.সি পরীক্ষা। সম্ভবত এই কারণেই পৃথিবীর সব কিছুতেই আগ্রহ খুঁজে পাচ্ছে ও।

দুপুর হতে চলেছে। বাবা অফিসে, একটু আগে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ির কাজের লোকেরাও এই সময়ে বাবার ঘরের আশেপাশে থাকে না। আর বাবা না থাকলে মা অন্য ঘরেই ঘুমান।

এদিক-ওদিক তাকাতেই সিন্দুকটা দেখতে পেল আফ্রিতা। বিছানার ডানপাশে রাখা হয়েছে ওটা।

এই ঘরটার জানালাগুলো সবসময়ই লাগানো থাকে, এজন্য আলো না জ্বাললে কিছু বোঝা যায় না।

সুইট টিপে আলো জ্বালল আফ্রিতা। তারপর এগিয়ে গেল সিন্দুকটার দিকে। আশ্চর্য! ওটাতে কোনো তালা নেই!

কোনোকিছু না ভেবেই ওটার ডালাটা খুলে ফেলল সে।

সিন্দুকের মধ্যে যেটা শুয়ে আছে সেটা অনেকটা মানুষের মতো হলেও আসলে মানুষ না! পাঁচ-সাত বছর বয়সি বাচ্চার দেহের মতোই ওর শরীরটা, কিন্তু অস্বাভাবিকতাটা অন্যখানে, গলাটা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে সেখানে দুটো মাথা আর পা দুটোর সামনে পায়ের পাতার জায়গাতে আরও দুটো মাথা! চারটে মাথাই ছোটোবাচ্চার!

আর প্রতিটা মাথাই এক দৃষ্টিতে আফ্রিতার দিকে তাকিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে চলেছে।

তীব্র আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেল সে।

ধম করে ডালাটা বন্ধ করে দিল ও। তারপর কীভাবে যে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এসেছে তা সে নিজেও জানে না।

জ্ঞান ফেরার পর ও নিজেকে খুঁজে পেল একটা ক্লিনিকে। মা ওর পাশে বসে ছিলেন। জ্ঞান ফিরতেই আফ্রিতাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

বাবা চুপচাপ বসে ছিলেন ওর পায়ের কাছে। উনার চোখের দৃষ্টিই বলে

দিচ্ছিল যে উনি ভালোভাবেই জানেন যে আফ্রিতা কী দেখে ভয় পেয়েছে!

"কেমন আছিস মা?" বলে উঠল মিসেস রায়হান।

"এইতো মা!" অনেক কষ্টে বলল আফ্রিতা।

"বিকালবেলা তোর ঘরে গিয়ে দেখলাম তুই মেঝেতে পড়ে আছিস, ভাগ্যিস ততক্ষণে তোর বাবা চলে এসেছিলেন! কী হয়েছিল মা? কিছু দেখে ভয় পেয়েছ?"

"আহ্," বলে উঠলেন রায়হান সাহেব, "ওর কেবল জ্ঞান ফিরেছে, এখনই ডিসটার্ব কোরো না। ডাক্তারকে ডেকে আনছি আমি!"

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন যে তেমন কোনো সমস্যা নেই। উনি ধারণা করছিলেন যে পরীক্ষার কারণে সম্ভবত অত্যধিক মানসিক চাপে ছিল আফ্রিতা, তাই এমনটা হয়েছে।

পরের দিনই ক্লিনিক থেকে বাড়িতে চলে এসেছিল ও।

এর পর আর ও কোনোদিনই বাবার ঘরে ঢোকেনি।

কিন্তু বদ্ধ একটা সিন্দুকের ভেতরে কোনো প্রকার অক্সিজেন ছাড়া মানুষের মতো দেখতে ওই প্রাণীটা কী করে বেঁচেছিল? ওর দিকে তাকিয়ে [illegible] ওছিল!

***

"এইসব কী আফ্রিতা?" কাগজের দলাটা তুলে নিয়ে হুংকার দিলেন প্রফেসর আসলাম।

"আমি কিছু জানি না স্যার," কোনোমতে বলল আফ্রিতা।

"আজকে ক্লাস টেস্টে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি তার মধ্যে একটা উত্তর এখানে লেখা আর এটা পেলাম তোমার পায়ের কাছে! তারপরেও বলছ তুমি কিছু জানো না?"

পুরো ক্লাস তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ভার্সিটিতে আফ্রিতার বন্ধুবান্ধব বলতে গেলে তেমন নেইই। তাই ওর প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি খুব কমই আছে শ্রেণিকক্ষটার মধ্যে।

আফ্রিতার ক্লাস টেস্টের খাতাটা টেনে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন প্রফেসর আসলাম। প্রচণ্ড বদরাগি মানুষ তিনি।

"স্যার... অন্য কেউ ফেলেছে, আমি ফেলিনি," প্রায় কেঁদে ফেলল আফ্রিতা।

"সেক্ষেত্রেও দোষটা তোমারই, পায়ের কাছে দেখে বসা উচিত ছিল!"

"স্যার!"

"আর কোনো কথা নয়, ক্লাস থেকে বের হয়ে যাও, এই সেমিস্টারে আর আমার ক্লাস করতে আসবে না, কোনো ক্লাস টেস্টও দেওয়ার দরকার নাই। ফাইনাল পরীক্ষাতে এই সাবজেক্টে না বসলেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ তোমাকে আমি পাশ করাব না!"

"স্যার প্লিজ!"

"যতদিন আমি ক্লাস নেব, তোমার এই সাবজেক্টে পাশ করা হবে না," আফ্রিতার রোলটা খাতাতে তুলতে তুলতে বললেন প্রফেসর আসলাম।

কিছুক্ষণ পর ক্যান্টিনে।

একটা টেবিলে বসে কাঁদছে আফ্রিতা। এমন আগে কখনোই এমন হয়নি

আফ্রিতার।

"তোর পায়ের কাছে দেখে বসা উচিত ছিল," মিনমিন করে বলল অনীক।

"আরে ধুর, আমরা কজন পায়ের কাছটা দেখে বসি?" খেঁকিয়ে উঠল সীমা, "আর স্যারেরও যেমন বুদ্ধি! কেউ নকল করে সেটা আবার নিজের পায়ের কাছে ফেলবে নাকি?"

"স্যার কিন্তু যা বলেন তাই করেন।"

"তুই থামত অনীক, আফ্রিতা, তুই কালই স্যারের সঙ্গে দেখা কর!"

মাথা নাড়ল আফ্রিতা।

কিন্তু পরের দিন থেকে সে আর প্রফেসর আসলামের ক্লাসে এল না। পুরো সেমিস্টারেই ওই ক্লাসটা এড়িয়ে যেতো সে। ফাইনাল পরীক্ষাতেও ওইদিন অনুপস্থিত রইল।

প্রায় আটমাস পর জুনিয়র ব্যাচের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে সাবজেক্টটা পাশ করল সে। কোনো এক অজানা কারণে প্রফেসর আসলাম ওই ক্লাসটা আর নিতেন না ওই ব্যাচ থেকে। ফ্লোরা ম্যাম নিতে শুরু করলেন, আফ্রিতাকে বেশ পছন্দ করতেন তিনি, তাই পাশ করতে তেমন কোনো সমস্যা হল না।

***

"তো এটাই তোমার মতামত?" আফ্রিতার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিসেস রায়হান।

"হ্যাঁ মা, আমার পড়াশোনা শেষ হোক তারপর আমি এসব বুঝব। এখন তুমিই একটু কষ্ট করে সামলে নাও। আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেব, বাবার ইচ্ছাও পূরণ করব। তবে এখন নয়!"

"তুমি যা বলো," মাথা নাড়লেন মিসেস. রায়হান, "আমি তোমার বাবাকে বারবার মানা করেছিলাম, ওইসব উদ্ভট জিনিসের চর্চা না করতে!"

"মা, তুমি কি নিশ্চিত, বাবার মৃত্যু ওইসব কারণেই হয়েছে? এমনও তো হতে পারে উনি আসলে ভেতরে ভেতরে কোনো রোগে ভুগছিলেন?"

"না রে মা, আমি জানতাম ওর মৃত্যু এভাবেই হবে! এইসব জিনিস যারা চর্চা করে তাদের এভাবেই মরতে হয়!"

চুপ করে রইল আফ্রিতা।

তিনদিন হল রায়হান সাহেবের মৃত্যুর। তিনদিন আগে দুপুরবেলা খুব হন্ত-দন্ত হয়ে অফিস থেকে ফেরেন তিনি। তারপর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ওই ঘরটাতে ঢুকে যান। মিসেস. রায়হানকে বলে দেন যেন উনাকে বিরক্ত না করা হয়।

বেলা বারোটার দিকে ভার্সিটি থেকে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল আফ্রিতা, বিকালবেলা মায়ের চিৎকারের শব্দে ঘুম ভাঙে ওর।

দৌড়ে গিয়ে দেখে ওর মা সেই ঘরটার দরজায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

"আফ্রিতারে, তোর বাবা আর নেই!" ওকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস. রায়হান।

বিকালবেলা চা দিতে গিয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় উনার

মৃতদেহ আবিষ্কার করেন মিসেস. রায়হান। উনার চোখদুটো ছিল খোলা, যেন ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে ভয়াবহ একটা কিছু দেখতেন তিনি।

এরপর?

এরপর আর কী?

বাড়িতে একগাদা লোকের আগমন, মৃতদেহ দাফন।

রাতেরবেলা অনেকটা গম্ভীর হয়েই মায়ের পাশে ঘুমাতে গিয়েছিল আফ্রিতা। কারণ নিজের ঘরের ড্রয়ারে সন্ধ্যাবেলা একটা চিঠি পেয়েছিল, চিঠিটা ওর বাবার লেখা!

ওই চিঠির কথা মাকে কখনোই বলবে না সে।

***

ধীরে ধীরে অন্ধকার সেই গুহাটা ফুটে উঠছে আফ্রিতার চোখের সামনে। সেই বেদিটা, বেদির সামনে বসে থাকা সেই ছেলেটা, দেয়ালের সেই মশালটা আর পেছনের সেই জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখে ও।

সব কিছু একদম বাস্তব মনে হচ্ছে ওর কাছে।

ধীরে ধীরে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

'বুওওওম' তীব্র একটা শব্দে কানে যেন তালা লেগে গেল আফ্রিতার।

***

অনেক কষ্টে চোখ খুলল আফ্রিতা। কোথায় সে? কয়েক মুহূর্ত কিছুই মনে করতে পারল না ও।

ওহ হ্যাঁ, সে এখন পুষ্পিতাদের বাড়ির সেই ঘরে।

মাটিতে বসে আছে আফ্রিতা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে আছে। কিছু দূরে পড়ে আছে ওর চশমাটা।

এতক্ষণ তবে সেই ছলাবাটার শক্তির প্রভাবের মধ্যে ছিল সে? তবে বাস্তবে ফিরল কী করে? ওকে না মেরে ফেলে তো ছলাবাটার থামার কথা না!

ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ল সামনে। মেঝেতে পড়ে আছে বাহারের শার্টটা। সবুজাভ ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটা।

উঠে দাঁড়াল আফ্রিতা, পুরো শরীর ব্যথা করছে ওর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে শার্টটার দিকে, তারপর চোখদুটো বন্ধ করল!

অদ্ভুত ব্যাপার! শেষ হয়ে যাচ্ছে ছলাবা! কিন্তু এ কী করে সম্ভব?

আবার চোখদুটো বন্ধ করে হাত দুটো সেই সবুজাভ ধোঁয়ার ওপর হাত দিল সে। আসলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ওটা।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল আফ্রিতা। মোটে সাত-আট মিনিট কেটেছে। এর মধ্যে কত কী দেখিয়ে ফেলল ছলাবা!

কিন্তু ওটার হুট করে হল কী?

যাই হোক, এখন এসব ভাবার সময় না। চাবি দিয়ে দরজাটা খুলল সে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পিতা।

"কী হল আফ্রিতা?" দৌড়ে এল সে।

হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা সেই শার্টটা দেখাল আফ্রিতা। তখনও ওটা দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

"কী হয়েছে ওটার?" পুষ্পিতার কণ্ঠে বিস্ময়।

"শেষ হয়ে যাচ্ছে ওটা!"

***

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বাহারের কপালে ছুঁইয়ে চোখটা বন্ধ করল আফ্রিতা।

চোখ মেলে চাইলেন বাহার।

"কী হয়েছে মা, তোমরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?" আফ্রিতা আর পুষ্পিতাকে দেখে বললেন তিনি। যেন কিছুই হয়নি।

"কিছু না আঙ্কেল, আপনি টিভি দেখুন, আমি যাচ্ছি," হাসল আফ্রিতা।

"তোমার চেহারা এমন ফ্যাকাশে লাগছে কেন মা?"

"এমনিই! পুষ্পিতা আপু একটু নীচে আসুন।"

নীচতলাতে নেমে এল ওরা দুজন।

"ওটা আর ফিরবে না তো?" আস্তে করে বলল পুষ্পিতা।

"নাহ, আঙ্কেলকে সব খুলে বলার দরকার নেই, শুধু বলবেন অবলা প্রাণীদের উপর যেন আর হাত না তোলেন।"

"আচ্ছা।"

"আমি এখন বাড়ি যাব, শরীরটা ভালো লাগছে না।"

"ড্রাইভারকে বলি? তোমাকে রেখে আসুক?"

"সেটাই ভালো হয় আপু।"

***

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মতো বাজে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আফ্রিতা।

পুষ্পিতাদের বাসা থেকে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। একদম সাড়ে ছটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। এখন বেশ ভালো লাগছে, তবে কিছুটা দুর্বলতা থেকে গেছে।

আফ্রিতার হাতে একটা চিঠি। ওর বাবার লেখা সেই চিঠিটা। এটা ব্যাপারে কখনোই কাউকে বলেনি সে।

চিঠিটা খুলল সে।

***

আফ্রো,

এই চিঠিটা যখন তুমি পড়বে তখন হয়তো আমি বেঁচে থাকব না।

সারাটা জীবন যে অদ্ভুত শক্তির সাধনা আমি করেছি সে ব্যাপারে তোমার মা বা তোমাকে কখনোই খুলে বলা হয়নি। হ্যাঁ, তুমি এক-দুইবার দূর্ঘটনাবশত কিছু জিনিস দেখে ফেলেছ। তবে সেগুলো সামান্যই। এই জগৎ অনেক বেশি অন্ধকার।

আর এই অন্ধকারের জন্যই হয়তো আজ আমাকে জীবন দিতে হবে।

আমার সব বইগুলো আমার ঘরে রইল। পারলে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলো। অন্ধকারের এই জগৎ যা দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ে নেয়।

ইতি,

তোমার বাবা।

সেদিনের পর থেকে নিজের ঘর বদলে বাবার ওই ঘরটাতেই থাকা শুরু করে আফ্রিতা।

মনের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। বাবার কথা শোনেনি সে, নিজেও শুরু করেছে আঁধারের সন্ধান। তবে যতটুকু সম্ভব মানুষের ভালো করার জন্যই।

নিজেকে পুষ্পিতাদের বাসার ওই ছলাবার কাছে কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে ওর। আজ ওর অনেক স্মৃতিই তুলে এনেছিল ওটা। বাবার ঘরের অন্ধকার রহস্য, স্কুলে দেখা সেই অদ্ভুত লোকটা, স্কুল আর ভার্সিটির স্মৃতি, বাবার মৃত্যু- সব কিছু।

কিন্তু ছলাবা শেষ হল কী করে?

একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করেছে আফ্রিতা।

শেষ দৃশ্যটার আগের সব দৃশ্যই একেবারেই ওর সামনে এসেছে। কিন্তু স্বপ্নের সেই গুহাটা ধীরে ধীরে ওর সামনে আসছিল! কেন?

কোনো প্রোগামকে রান করা যদি কম্পিউটারের জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তবে সেই প্রোগ্রামটা কম্পিউটার থেমে থেমে রান করে। সবকিছু ধীর হয়ে যায়!

তবে কি ওই দৃশ্যটা তুলে আনতেও ছলাবাটার কষ্ট হচ্ছিল?

সেই বাচ্চাটা, আর বেদির পেছনের জমাট বাঁধা অন্ধকার।

হ্যাঁ! ওই জমাট বাঁধা অন্ধকারের কাছাকাছি আসতেই সেই শব্দটা হল আর সব ছলের প্রভাব শেষ হয়ে গেল।

কী আছে ওই অন্ধকারের পিছে? যাকে তুলে ধরতে গিয়েই শেষ হয়ে গেল ছলাবাটা?

পরিশিষ্ট
চারদিন পর

"বিড়াল মারল বাবা আর বিপদে পড়লাম আমি!" পুষ্পিতার গলাতে উত্তেজনা।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," একটা ফুচকা মুখে পুরে দিল আফ্রিতা, "উফফ, এখানকার ফুচকা অনেক ঝাল! ফেসবুকে যা দেখেছিলাম তেমন কিছুই না!"

পুষ্পিতাদের বাড়ির কাছে একটা বেশ বড়ো ফুচকার দোকানে বসে আছে ওরা দুজন। বেশ কদিন ধরেই বেশ নাম ছড়াচ্ছে দোকানটার। ফুডি গ্রুপগুলোতে বিশাল বিশাল ভালো রিভিউ।

"হুম, ফুচকাগুলো আসলেই আহামরি কিছু না!" একটা ফুচকা তুলে নিল পুষ্পিতা।

"বুঝালেন আপু, এইসব গ্রুপের অ্যাডমিনদের ফ্রি খাওয়ানো আর কমিশন দিয়েই ফুড বিজনেসের বারোটা বাজাচ্ছে কিছু ব্যবসায়ী।"

"তা যা বলেছ, যাই হোক তুমি আসার পর আর কোনো সমস্যা হয়নি। একটা সত্য কথা বলি?"

"কী কথা?"

"আমার না একটু সন্দেহ ছিল। মানে আমি ভাবছিলাম ওটা আবার ফিরবে। তাই দুদিন একটু ভয়ে ছিলাম। অফিসে গেছিলাম না।"

"আরে না না, ওটা শেষ পুরো। আর ফিরবে না। আঙ্কেল ভালো আছেন?"

"হ্যাঁ, উনি তো জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি নাকি উনাকে কীসব বলেছো। আমার কাছে বিস্তারিত জানতে চাইছিলেন।"

"বললেন?"

"কাটছাঁট করে আর কী, আর কাল থেকে অফিসে যাচ্ছি, তাই অত সময় আমার আছে নাকি?" চোখ টিপল পুষ্পিতা।

"এই ফুচকা নাকি ঢাকা শহরের সেরা ফুচকা," আর একটা ফুচকা মুখে পুরে দিল আফ্রিতা।

"আচ্ছা আফ্রিতা, তুমি ওটাকে শেষ করলে কী করে?"

"উফফ, ঝাল। আপু আমি ওটাকে শেষ করিনি আর ওটা কী করে শেষ হয়েছে তা আমি জানি না।"

"এ আবার কেমন কথা?"

"আমি আর জীবনেও এই ফুচকার দোকানে আসব না। আর শোনেন, আপনি মানুষকে অনেক সন্দেহ করেন। এই অভ্যাসটা ছেড়ে দিন। আপনার জন্যই ব্যাপারটা ভালো হবে।"

এক দৃষ্টিতে আফ্রিতা দিকে চেয়ে রইল পুষ্পিতা। আফ্রিতার সেদিকে মন নেই, সে একটার পর একটা ফুচকা খেয়ে যাচ্ছে আর ফুডি গ্রুপের অ্যাডমিনদের গালি দিচ্ছে।

আত্মহনন

“কিছু ঘর থাকে, যেগুলো কখনও খোলা উচিত না। কারণ ওই ঘরগুলো মানুষের জন্য নয়, অন্য জগতের প্রাণীদের জন্য।”

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ‘দ্য কর্পস দ্যাট রোজ’ থেকে।

বাড়িতে ঢুকেই ডাইনিং টেবিল থেকে জগটা তুলে উপুড় করে পানি খেল আফ্রিতা। বাইরে কড়া রোদের সঙ্গে ভ্যাপসা গরম।

“আফ্রিতা! কতবার মানা করেছি এভাবে পানি খাবে না,” আঁতকে উঠলেন মিসেস. রায়হান।

“আরে,” হেসে উঠল আফ্রিতা, “ভুলেই গেছিলাম, আজ শুক্রবার। তুমি বাড়িতে আছ।”

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। খুব ক্লান্ত লাগছে। ফেসবুকে বেশ কয়েকটা মেসেজ এসেছে। কেসের কোনো মেসেজ এখন আর দেখবে না। একটা মেসেজ ইরফানের, সেটাও দেখা যাবে না। ওই উদ্ভট লোকটাও মেসেজ দিয়েছে, হ্যাঁ এটা দেখা যায়। হাতে আজ কোনো কাজ নেই।

“শোনো আফ্রিতা, একটা কথা বলতাম,” একটু অস্বস্তিবোধ করছেন মিসেস. রায়হান।

“হ্যাঁ বলো!”

“তোমার ঘর থেকে না কেমন একটা অদ্ভুত গর্জনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল একটু আগে!”

“কী! দাঁড়াও আমি, আসছি,” উঠে গেল আফ্রিতা।

ঘরের দরজাতে তালাটা ঠিকঠাক মতো মেরে দিয়ে আবার ডাইনিং এ ফিরে এল আফ্রিতা।

মিসেস. রায়হান তখনও বসে।

“আফ্রিতা, কীসের আওয়াজ ছিল?” বললেন তিনি।

“আরে তেমন কিছু না,” হাত নাড়ল আফ্রিতা, “আর হবে না।”

“দেখো আফ্রিতা, ওই ঘরটা অভিশপ্ত। তুমি কি জানো তোমার বাবা বাড়ি না থাকলে ওই ঘরে আমি যেতাম না? এমনকি একবার ওকে বলেওছিলাম যে ওই ঘরে আমি রাতে ঘুমাব না। কিন্তু ওর তো ওই ঘর ছাড়া চলত না... ওই সময়ে ওই ঘর থেকে...”

“এইরকম আওয়াজ পাওয়া যেত?”

“হ্যাঁ। তবে আমি যখন ওর সঙ্গে যেতাম তখন কিছুই দেখতাম বা শুনতাম না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সেও তোমার মতো সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিতো।”

“মা...” মিসেস. রায়হানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল আফ্রিতা, “সব কিছু সবার জন্য না।”

"তুমি বাইরে বের হলে ঘরে তালা মেরে রেখে যাও কেন?"

"আবার বলছি সবকিছু সবার জন্য না!"

"আমার অবাক লাগে যখন ভাবি তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর তুমি ওই ঘরেই থাকতে শুরু করলে! যে ঘরে তুমি আগে ঢুকতে না!"

"মা এইসব নিয়ে এখন কথা বলতে চাচ্ছি না আমি।"

"আচ্ছা, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

"ওই ঘর সংক্রান্ত কোনো বিষয় হলে দেব না।"

"না তেমন কিছুই না, এই যে ভূত-প্রেতের পেছনে ঘুরে বেড়াও, তোমার ভয় লাগে না?"

"প্রথম দিকে খুব লাগত এখন আর লাগে না। তবে হ্যাঁ, একবার এতই ভয় পেয়েছিলাম মা! শুরুর দিককার ঘটনা। শুনবে নাকি? ওই কেসে যাওয়ার সময় তোমাকে বলেছিলাম যে এক বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছি, হাহা!"

"কী! না জানি এমন আরও কত মিথ্যা বলেছো। হুম শুনতে পারি, তুমি এই প্রথম আমাকে এইসব শোনাতে চাইলে! বেশি ভয়ের না তো? রাতে একা ঘুমাই।"

"এই ঘটনাটা বলাই যায়," মৃদু হাসল আফ্রিতা, "তেমন ভয়ের না, আবার ভয়েরও!"

১ : ইলা

তখন সবে এসব শুরু করেছি। নিজে যেচে পড়ে দুটো-একটা কেসও সলভ্ করেছি বলতে পারো। খুবই মামুলি কেস ওগুলো। মানে এখনও ওগুলোর কথা মনে পড়লে হাসি পায়। যাই হোক, ওগুলোর কথা বাদই দেই।

ফেসবুক পেজটাও চালু করেছি। সারাদিন অপেক্ষায় থাকতাম একটা মেসেজের জন্য। কেউ তো একটা সমস্যা পাঠাক।

সত্য বলতে কী মেসেজ ভালোই আসত। তবে সমস্যা কেউ পাঠাত না। বেশিরভাগই রিডিকিউল করত, যে ভূত-প্রেতের নামে আমি দেশে ভণ্ডামি শুরু করেছি, কিছু ছেলে মেসেজ পাঠাত আমি ডেটিং করতে আগ্রহী নাকি, আর কিছু মেসেজ? ওগুলোর তো উচ্চারণও করা যায় না, হাহাহা।

তো একদিন হুট করেই ইলা নামের একটা মেয়ের মেসেজ চোখে পড়ল।

ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওদের মেসে নাকি একটা অদ্ভুত ঘর আছে।

ব্যাপারটা তখন আমার জন্য মেঘ না চাইতেই তুফান। এই প্রথম কেউ আমার সঙ্গে কেসের ব্যাপারে দেখা করতে চাইল।

খুবই আনন্দে মেয়েটাকে রিপ্লাই দিয়ে দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললাম।

পরেরদিন একটা ফাস্টফুডের দোকানে দেখা করলাম।

ইলা মেয়েটা দেখতে মোটামুটি। এই ধরো বিশ-একুশ বছর বয়স হবে। তবে দেখতে একদমই পিচ্চি লাগে। এই মেয়ে যে ভার্সিটিতে পড়ে সেটা প্রথমে দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না। বড়োজোর কলেজ পড়ুয়া মেয়ে মনে হতে পারে।

তবে মেয়েটা বেশ সুন্দর করে কথা বলতে পারে। ও যা বলল তার সারমর্ম হল-

ওদের মেসের চার তলাতে একটা ঘর আছে, যেখানে কেউ থাকে না। কেন থাকে না? কারণ ওই ঘরে এর আগে যারাই থেকেছে সবাই রহস্যময়ভাবে মারা গেছে। ইলা নিজেও চারতলাতেই থাকে।

যে মেয়েই ওই ঘরে তার ঠিক পরের দিনই নাকি ওই মেয়ের মৃতদেহ নীচের ড্রেনে পাওয়া গেছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় মেয়েগুলো জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল প্রতিটা ক্ষেত্রেই দরজা ভেতর থেকে লাগানো ছিল আর ওই ঘরের জানালাতে গ্রিল আছে।

"আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, ছাদে উঠে আত্মহত্যা করেছে?" বললাম আমি।

"না আপু! বললাম না ভেতর থেকে দরজা বন্ধ?"

"হুম, বিষয়টা রহস্যময়, তা কতদিন থেকে এমন হচ্ছে?"

"মেসের ম্যানেজার অভিজিৎদা বলে যে প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক পাঁচ বছর আগে, মেয়েটা কলেজ পড়ুয়া ছিল। পড়াশোনা নিয়ে প্রচুর ডিপ্রেশনে থাকত। ও এই ঘরে সাত থেকে আটদিন ছিল, তারপরেই ওর লাশ পাওয়া গেছিল। এই মেয়েটা একটু আলাদা আপু!"

"মানে?"

"এই একটা ক্ষেত্রেই মেয়েটা একদিনের বেশি থাকতে পেরেছিল। এরপরে যতগুলো মৃত্যু হয়েছে সবাই প্রথম রাতেই মারা গেছে! এরপরেও আরও দুজন মারা গেছে ওই ঘরে।"

"এর পরেও ওই ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছিল? এত দুর্নাম থাকা একটা ঘর?"

"না, এর পর আর একবারই ভাড়া দেওয়া হয়েছিল আর সেই মেয়েটা প্রথম রাতেই মারা যাওয়ার পর আর ভাড়া দেয়নি।"

"তাহলে তিন নম্বর জন মারা গেল কী করে?"

"এইসব ক্ষেত্রে যা হয়! ওই আপু সাহস দেখিয়ে রাত কাটাতে গেছিল।"

"ঘরটা না বন্ধ থাকে?"

"হ্যাঁ। প্রথম দুটো কেসের পর মালিকপক্ষকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। কিন্তু পোস্টমর্টেমে প্রমাণ হয় যে সবাই লাফিয়েই আত্মহত্যা করেছিল তাই আর কিছু হয়নি। অদিতি আপু ঢুকেছিল অভিজিৎদাকে ম্যানেজ করে। টাকা দিয়ে সবই সম্ভব।"

"হুম! তা এর পরের মৃত্যুগুলোর জন্য মালিকদের কেউ কিছু বলেনি? আর ওরাই বা অভিজিৎকে রাখছে কেন? যেখানে বলাই যায় তৃতীয় মৃত্যুর জন্য সেও দায়ী!"

"মালিকপক্ষ খুবই প্রভাবশালী আপু। আর অভিজিৎদা! ওরে বাপরে! তিলকে তাল বানানোর বিরাট ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে সে। মালিকের সামনে সে স্বীকারই করে না যে সে আপুকে চাবি দিয়েছিল। এখন মালিকপক্ষ ধরে নেয় যে ওর ঘরে ঢোকার ব্যাপারটাও অতিপ্রাকৃত! তবে হ্যাঁ, অনেক মেয়েই ইনিয়ে-বিনিয়ে

একবার মালিকের কানে তুলেছিল যে অভিজিৎদা এমন করে। সে অভিযোগও ধোপে টেকেনি। অভিজিৎ নাকি ওদের অনেক পুরোনো লোক। সোজাসুজি বলে দেওয়া হয়েছে যে যাদের সমস্যা তারা মেসে না থাকতে চাইলে চলে যেতে পারে, কিন্তু অভিজিৎ বহাল থাকবেই। শেষ মৃত্যুটা তিনমাস আগের। আমার খুব ক্লোজ ছিলেন। অদিতি আপু," চোখের কোণে পানি ছল-ছল করে উঠল ইলার।

"স্যরি টু হিয়ার।"

"আপু মেসে নতুন এসেছিলেন। আমার ভার্সিটির বড়োআপু। বিশেষ কিছু কারণে হল ছাড়তে হয় উনাকে। তো আমার কথা শুনেই মূলত এই মেসে আসেন উনি। আপু খুবই প্রাণবন্ত একটা মানুষ ছিলেন। গান গাইতেন, সাইকেল চালাতেন, ঘুরতেন-ফিরতেন। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন ভূতুড়ে জায়গাতে থাকার রেকর্ডও আপুর আছে। সেই আপু যখন শুনলেন ওই ঘরের কাহিনি..."

"উনি থাকতে গেছিলেন?"

"হ্যাঁ, জানেন আপু? এখনও আমার মনে আছে, আমি ভয় পাচ্ছিলাম। বারবার উনাকে মানা করছিলাম। উনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার কথা আর বলেছিলেন, 'দেখিস ইলা, পরের সকালে এসে আমি তোর ঘুম ভাঙাব। আমার কিছু হবে না।' পরের দিন একইভাবে উনার লাশ পাওয়া গেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন লাফিয়ে আত্মহত্যা।"

"হুম, ব্যাপারটা অনেক রহস্যময়। আচ্ছা ঘরটা কাউকে দেখানো হয়নি?"

"স্থানীয় মসজিদের ইমামকে দেখানোর জন্য বলা হয়েছিল নাকি। কিন্তু বদনামের ভয়ে মালিকপক্ষ কাউকে ডাকেনি।"

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে পরেরদিন আমি ইলাদের মেসে যাবো আর ওই ঘরটাতে থাকবো। ইলাকে সেটাই বললাম।

"আপু, ওই ঘরে না থেকে কিছু করা যায় না?" ভয়ে ভয়ে বলল মেয়েটা।

"ঘরে না থেকে কী করব?" হাসলাম আমি।

"মানে দূর থেকে জাদুটাদু!"

"আরে ধুর, আমি জাদুকর নাকি? থাকব দেখব তারপর না বুঝব যে কী সমস্যা!"

"দেখুন, অদিতি আপুর মৃত্যুর জন্য আমারও কিছুটা দায় আছে বলে আমি মনে করি.. উনাকে ওই ঘরের কাহিনি আমিই বলেছিলাম, এখন যদি আবার!"

"অমন কিছুই হবে না," জোর দিয়ে বললাম আমি, "কাল সন্ধ্যাতে দেখা হচ্ছে।"

২ : ব্লু-হ্যাভেন ছাত্রীনিবাস আর অভিজিৎ

ব্লু-হ্যাভেন ছাত্রীনিবাস দেখেই বুঝতে পারলাম যে এখানে থাকাটা বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার। মানে অতিরিক্ত রকমের বিলাসবহুল এই সাততলা মেসটা। লিফটও রয়েছে।

রিসেপশনে বেশ বড়ো করে লেখা একটা পোস্টার লাগানো রয়েছে-

সিঙ্গেল রুম-৭৫০০

ডাবল রুম-১০০০০(দুইজন থাকলে প্রতিজনের ৫০০০ করে)

অ্যাটাচড বাথরুমওয়ালা রুম- ১৩০০০

ইলা আগেই বলেছিল যে এখানে থাকা বেশিরভাগ মেয়েই ঢাকার বাইরের অভিজাত পরিবারগুলোথেকে আসা। তাই সাধারণত অন্যান্য মেসগুলো মতো এখানে আড্ডা-টাড্ডা খুব একটা হয় না। সবাই নিজের আভিজাত্য নিয়েই একটু আলাদা থাকে।

সন্ধ্যা হতে চলেছে।

ম্যানেজার অভিজিৎদা একটা লোক বটে। প্রায় পনেরো মিনিটে নানান কথা বলে আমাকে বুঝিয়ে ফেললেন যে উনি একজন উচ্চপর্যায়ের লোক।

মন্ত্রী, মিনিস্টার, আমলা, এলাকার মাস্তান সবার সঙ্গেই উনার নাকি খাতির। চাইলে উনি অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু মেসের মেয়েদের নিরাপত্তা কথা চিন্তা করে এখানে পড়ে আছেন।

"অভিজিৎদা আপনি তো সেই মাপের লোক," বেশ মোলায়েম ভাবেই বললাম আমি, "আমি আজ রাতটা থাকলে তো কোনো সমস্য হবে না?"

"আরে কী যে বলেন আপা," সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল ব্যাটা, "থাকেন, এই ইলা আপার তো রুমমেট বাড়ি গেছে, উনার রুমেই থেকে যান। আর আপা, আপনার গলাটা যা সুন্দর, একবার ভাইয়া বলেন না!"

"অভিজিৎ ভাইয়া, থ্যাংক্স, কিন্তু আমার কিছু কথা ছিল যে!"

"কী কথা?" ভ্রূ কুঁচকাল অভিজিৎ।

"আসলে উনি ওই ঘরটাতে থাকতে চান," মিনমিনিয়ে বলল ইলা।

"কোন ঘর?"

"ওই যে বন্ধ ঘরটা!"

"কী!" চোখ কপালে উঠল অভিজিতের, "আপা, ওই ঘরের কাহিনি।"

"আমি জানি অভিজিৎ ভাইয়া," আবার বলে উঠলাম, "কিন্তু আমি না একা থাকতেই পছন্দ করি। কারো সঙ্গে একটা রুম শেয়ার করে থাকতে আমার ভালো লাগে না।"

"জানেন?" মুখে কেমন একটা বিচ্ছিরি হাসি ফুটে উঠল শালার, "ও তার মানে আপনিও ওই অদিতি আপুর মতো? ওই রুমে থাকতে চান? আপা ওই রুমে ভূত আছে! আমার কথা শুনেন।"

"আরে দাদা, ভূত বলে কিছু আছে নাকি?"

"আপা, প্রতিটা মেয়ের লাশ তো প্রতিদিন সকালে আমিই আগে দেখেছি। ভাইরে ভাই! ওরা লাফ দেয় কোথা থেকে? জানালা বন্ধ। ছাদে উঠে কী করে? যেখানে ছাদও তালা মারা। পোস্টমর্টের করা ডাক্তার সঙ্গেও কথা হইসে, প্রতিটা মেয়েই নাকি রাত দুইটা থেকে তিনটার মাঝখানে মারা গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার!"

"রাত দুটা থেকে তিনটা?" ভ্রূ কুঁচকে গেল আমার। এইসব তো ইলা আমাকে বলেছিল না।

"হ্যাঁ, আফা! ওই অদিতি আপু তো আমার চোখের সামনেই পৌনে বারোটার দিকে চাবি নিয়ে গেল।"

"বুঝলেন অভিজিৎ দা, একটা কথা বলি। আমি এখন গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ব। চট্টগ্রাম থেকে এলাম তো! বারোটার মধ্যে উঠে আবার ইলার রুমে চলে যাব। ইলার তো সামনে পরীক্ষা এমনেই ও রাত জেগে পড়বে। কিন্তু একটু ঘুমের দরকার আমার!"

"বারোটাতে উঠবেন কী করে?"

"অ্যালার্ম দিয়ে রাখব।"

"উমম ইতস্তত করছে অভিজিৎ, আমি তাইলে বারোটার দিকে গিয়ে খোঁজ নিব!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম।" এই বলে ব্যাগ থেকে একটা এক হাজার টাকার নোট বের করে দিলাম।

"আরে আপা! এইসব কী," হাসিতে ভরে গেল অভিজিতের মুখটা।

"আরে থাকতে দিলেন তো আপনি, তাই ভাড়াটা আপনাকে দিলাম! যাই তবে? আপনি চাবি রেডি রাখেন, কিছু কেনাকাটা করেই আসছি।"

মেস থেকে বেরিয়ে গেলাম আমরা।

কয়েক প্যাকেট চিপস কিনলাম আর এক প্যাকেট বেনসন।

"আপু স্মোক করেন?" একটু অবাক হল ইলা।

"না না, এগুলো অভিজিতের জন্য," মুচকি হাসলাম আমি।

"বাপরে ওকে কত্ত ঘুষ দিচ্ছেন!"

"এটা একটা বিশেষ কারণে দিচ্ছি, যাই হোক, শোনো, মেয়েগুলো দুটো থেকে তিনটার মধ্যে মারা গেছে, এটা আমাকে বলোনি কেন?"

"আসলে আমিও জানতাম না আপু।"

"হুম।"

৩ : ঘরে

রিসেপশনে ফিরে অভিজিতের হাতে সিগারেটের প্যাকেটটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে গলে গেল লোকটা। আমাদের সামনেই একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে ফেলল।

"উফফ, আপা, কতদিন বেনসন খাই না, আপনার দয়ার শরীর," সুখটান দিতে দিতে বলল ব্যাটা।

"চাবিটা অভিজিৎ ভাইয়া?"

একটা চাবি বের করে আমার হাতে দিল অভিজিৎ।

"থ্যাংকু ভাইয়া!"

"আমি কিন্তু বারোটার দিকে গিয়ে আবার ঘর লক করে দিয়ে আসব।"

"হ্যাঁ অবশ্যই!"

লিফটে উঠে গেলাম আমি আর ইলা।

চারতলাতে একটা কমনরুম আছে মেয়েদের। সেখানে কয়েকটা মেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম। কারো মধ্যেই আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখলাম না। তবে যেহেতু নতুন মুখ, তাই তাকাচ্ছিল প্রায় সবাই।

"এটা কে ইলা?" অবশেষে একটা মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

"আমার কাজিন, ঢাকাতে এসেছে, আজ এখানেই থাকবে," উত্তর দিল সে।

কমনরুম থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। ওখানে বেশি থাকাটা উচিত নয়। থাকলে আরও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা।

কমনরুম থেকে একটু এগিয়ে হাতের ডানের একটা ঘর দেখাল ইলা, রুম নম্বর ৪১৭।

"এটাই আমার রুম," বলল সে।

"আর ওই ঘরটা?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"আসুন," এগোতে লাগল সে।

একটা করিডোর ধরে বেশ কিছুটা এগোনোর পর একদম শেষে একটা একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ইলা। রুম নম্বর ৪২৮।

"এটাই সেই ঘর," বলল সে।

"এখনই ঢোকা যাবে?"

"হুম," আশেপাশে তাকাল ইলা, "গ্রীষ্মের ছুটি চলছে তো, তাই মেসে খুব কম মেয়ে আছে। যারা আছেন তাদেরও বেশিরভাগই জব করেন। এই দিকে অমন কেউ থাকেন না। তাই এই ব্লকটা একদমই ফাঁকা। কেউ দেখবে না।"

তালাটা খুললাম আমি। তারপর প্রবেশ করলাম রুম নম্বর ৪২৮-এ।

তখনও কোনো গন্ধ চিনতে শিখিনি। তবে কেমন একটা অদ্ভুত প্রভাব অনুভব করতে লাগলাম ঘরটাতে ঢোকার পর।

ঘরে একটা বিছানা। আমার কপাল ভালো যে বেশ সুন্দর একটা তোশক ওখানে রয়েছে।

"তোশকটা?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"অদিতি আপুর," উনার বাড়ির লোক এসেছিল। ওরা সব নিয়ে গেলেও এটা সম্ভবত ভুলে রেখে গেছে।

ভালোই হয়েছে আমার জন্য। বিছানার পাশে একটা টেবিল, কোনো ফ্যান নেই ঘরে। বিছানার পাশেই একটা জানালা। জানালাটা বন্ধ। ওটার গ্রিল ধরে টান দিলাম। বেশ মজবুত, কোনো মেয়ের পক্ষে ওটাকে ভাঙা প্রায় অসম্ভব।

"তোমার কাছে এক্সট্রা টেবিলফ্যান হবে?" বললাম আমি।

"আমার রুমমেট তো নেই, ওর ফ্যানটা নিয়েন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ!"

"কিন্তু আপু, বারোটার দিকে তো অভিজিৎদা আসবেন।"

"আসবে না। ভোরের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না," মৃদু হাসলাম আমি।

"কেন?" অবাক হল সে।

"সিগারেট।"

"ওতে কিছু মিশিয়েছেন নাকি?"

"না, ওতে একটা ছোট্ট স্পেল করে দিয়েছি।"

"বুঝলাম না আপু!"

"তুমি বুঝবে না।"

তখন বেশি স্পেলও শিখিনি। কিন্তু খাবার-দাবারের মাধ্যমে মানুষকে ঘুম

পাড়ানোর স্পেলটা বেশ ভালো করেই আয়ত্ত করেছিলাম।

কারণ এইসব ব্যাপারে সবসময়ই কিছু মানুষ বাধা দেয়।

আজকাল আর ওই পুরোনো টেকনিক ব্যবহার করি না। তবে সেদিন এটা বেশ কাজে দিয়েছিল।

এর পর ইলার ঘরে গেলাম।

ইলা মেয়েটা বেশ গোছানো। ঘরটাও বেশ বড়ো। দুজনের থাকার ঘর আরকি। একটা বিছানা ফাঁকা।

দেয়ালে বেশ কয়েকটা পেইন্টিং দেখলাম। মেসের ঘরে কেউ এগুলো রাখে, সেই প্রথম দেখা। চিপসদুটো নিয়ে বসলাম আমরা।

"আচ্ছা, ইলা, এই যে তিনটা মেয়ে মারা গেল, এরা যে চারতলা থেকেই পড়েছে এর কোনো নিশ্চয়তা আছে?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"ওদেরকে ঘর থেকে বের হতে কেউ দেখেনি। আর দরজার ভেতর থেকে লাগানো ছিল, আগেই বলেছি আপু।"

"হুম!"

"পড়ে যাওয়ার শব্দ কেউ শুনেছে কি?"

"না, একটা অদ্ভুত ব্যাপার আপু। জানেন অদিতি আপু মারা যাওয়ার পর পাশের রুমে আপু একবার বলেছিলেন, 'একটা মানুষ পড়ে গেল আর আমিই শুনতে পেলাম না।' "

চিন্তাতে পড়ে গেলাম আমি।

কারণ ভেতরে ভেতরে আমার একটা সন্দেহ ছিল যে, আসলে ব্যাপারটা পিছে হয়তো কোনো মানুষের হাত আছে।

অদিতির মৃত্যুর কথা তুললেই ইলা কেমন যেন গুটিয়ে যাচ্ছিল। ওর চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম অস্বস্তি।

তাই আর কথা না তুলে নানান ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলাম। ওর ক্যাম্পাস, পরিবার, প্রেম এগুলো নিয়ে বেশ দিলখোলা আলাপই করল মেয়েটা। আমারও ভালোই লাগছিল।

ঘরেই রান্না করত ইলা। কথা ফাঁকে-ফাঁকে রান্নাটাও চড়িয়ে দিল ও। মেয়েটা ভালোই রান্না করে।

সাড়ে দশটা দিকে ওর রান্না করা খিচুড়ি আর মুরগির মাংস বেশ মজা করেই খেলাম। বিশ্রাম নিতে নিতে ফেসবুক দেখতে দেখতেই বারোটা বেজে গেল। ওই ঘরে যাওয়ার পালা।

৪ : রাত

সোয়া বারোটার দিকে তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। ইলা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। এত রাতে এই ঘরে আশেপাশে কেউ তেমন একটা আসে না।

ইলাকে দরজা বাহির থেকে তালা লাগিয়ে দিতে বললাম। তাই করল ও। আমার খাবার জন্য একটা পানির বোতল আর গ্লাসও দিয়ে গেল।

ইলার রুমমেটের টেবিল ফ্যানটা বেশ ভালো। ছোটো হলেও হাওয়া ভালোই পাওয়া যায়। ওটাকে টেবিলের ওপর রেখে বিছানাতে বসলাম।

পুরো ঘরে কেমন যেন একটা ঘুমোট পরিবেশ। এমনটা হয়েই থাকে। অনেকদিন কেউ থাকেনি তো।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে আর একবার জানালাটা পরীক্ষা করলাম। বেশ শক্তভাবে আটকে দেওয়া আছে ওটা।

প্রায় পনেরো মিনিট বিছানাতে চুপচাপ বসে রইলাম। সত্য বলতে কী গন্ধ আর বায়ু চিনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

প্রচণ্ড ঘুম আসছিল। সারাটাদিন তো কম দৌড়-ঝাঁপ হয়নি।

কিন্তু তারপরেও, আমার কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।

ভাবলাম, নতুন পরিবেশ, তাই এমন হচ্ছে। যদিও এর আগে নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে অনেক দেরিই হয়েছে আমার। আসলে কেন যেন তখন খুব বেশি ভাবতে ইচ্ছা করছিল না।

বিছানার ওপর শুয়ে পড়লাম, তোশকটা বেশ নরম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও বুঝতে পারিনি।

ঘুমটা ভাঙল একটা অদ্ভুত শব্দে। কেমন যেন ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শব্দটা। পাশেই পড়ে ছিল মোবাইলটা, দেখলাম দুটো বাজে।

প্রথমেই বুঝে উঠতে সময় লাগল, আমি কোথায়? কী করছি?

সব কিছু বুঝে ওঠার পরেই নজর পড়ল জানালার দিকে। জানালাটা খোলা! কোনো গ্রিল নেই ওখানে।

পুরো ঘরটা আধিভৌতিক নীলচে আলোতে ভরে রয়েছে, কিন্তু সেটার কোনো উৎস নেই। সেই আলোতেই দেখতে পেলাম একদম ঘরের মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে স্লিপিং স্যুটের মতো একটা পোশাক, অনেকটা জাপানি কিমানোর মতো।

মুখটা দেখা যাচ্ছে না, মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। কাঁধের দুপাশ দিয়ে ওর দিঘল কালো চুল প্রায় মেঝেতে ঠেকেছে।

বুঝতে পারলাম যে আমার সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আর যাই হোক, মানুষ হতে পারে না।

মনের অজান্তেই দৃষ্টি চলে গেল দরজার দিকে, আর তখনই আর একটা ধাক্কা খেলাম।

কোথায় দরজা?

ওখানে শুধুই দেয়াল! আশেপাশে ভালো করে তাকালাম। ঘরটার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেয়ালগুলো কেমন যেন বিবর্ণ, এখানে-ওখানে চটা ওঠা।

আবার সেই ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শব্দ।

মেয়েটি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। দশ-বারো বছরের বালিকার মুখ, বেশ লাবণ্য রয়েছে। চোখদুটোও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। কেমন যেন একটা শূন্য দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে ও।

দাঁত বের করে হেসে উঠল মেয়েটা।

যে শব্দটাকে আমি ঝিঁঝি পোকার ডাক মনে করছিলাম সেটা আসলে ওই

মেয়েটার হাসির শব্দ!

একদম হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী যে করব সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তখনই মেয়েটা শরীর থেকে কিমানোর মতো জিনিসটা খুলে ফেলল। পুরো নগ্ন সে।

বীভৎস এক দৃশ্য!

দশ-বারো বছরের একটা নগ্ন মেয়ের মধ্যে বীভৎসতা আবার কী করে আসে? এই প্রশ্ন জাগছে তো?

মেয়েটার বুকে স্তনের জায়গাতে দুটো বড়ো বড় চোখ আর ওগুলোর নীচে পেটের কাছে একটা ভয়ংকর মুখ! এবড়ো থেবড়ো দাঁতে সেই মুখটা ভর্তি।

আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটাও হাসছে আর ওর পেটের সেই মুখটাও হাসছে।

চিৎকার করে উঠতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। আসলে এত ভয়ংকর কোন জিনিস এর আগে আমি দেখিনি!

কিন্তু ভয়ের আরও অনেক কিছুই বাকি ছিল।

হুট করেই আমার মাথাতে একটা অদ্ভুত চিন্তা এল। কেন যেন মনে হতে লাগল যে এই মেয়েটার হাত থেকে আমি কোনো মতেই বাঁচব না! এমন একটা পিশাচের হাতে জান দেব? এর চেয়ে তো জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাই ভালো। ভালো হয়েছে যে জানালাটা খুলে গেছে!

বারবার ঘুরে ফিরে এটাই মনে হতে লাগল।

ঠিক তখনই আমার দিকে ছুটে এল মেয়েটা, আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। এই প্রথম খেয়াল করলাম যে ওর আসলে চারটি পা। দুটো সামনে আর দুটো পেছনে।

সামনের দুটো পা দিয়ে একবার এগিয়ে আসে পেছনের দুটো দিয়ে আবার পিছিয়ে যায়। এভাবেই বেশ কয়েকবার সে আমার খাটের সামনে এল আর গেল।

আমার তখন ক্রমাগতই কেবল মনে হচ্ছে, আত্মহত্যা করতে হবে। এছাড়া বাঁচার আর কোনো উপায় নেই।

এক লাফে আমার বিছানাতে উঠে পড়ল সেই পিশাচি। আমি সরে গেলাম জানালার পাশে। তখনই আমার চোখ গেল বাইরে। কোথায় আমার সেই পরিচিত শহর?

বাইরে শুধুই একটা ধূসর প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদের মতো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে বটে, তবে সেটার আলোও ঘরের আলোটার মতোই নীল।

এ কোথায় এসেছি আমি?

প্রায় লাফিয়ে বিছানার মাঝখানে চলে এলাম। মেয়েটা তখনও হেসেই যাচ্ছে, সেই ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো একটানা হাসি।

কোনোমতে নিজেকে ধাতস্থ করতে চেষ্টা করলাম। বিড়বিড় করে ছোটখাটো কয়েকটা স্পেলও চালানোর চেষ্টা করলাম ওটার ওপরে, কিন্তু কিছুই হল না। সে হেসেই চলল।

আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে ওটা আসলে কী জিনিস! তখন এমনিতেও খুব কম জিনিসই চিনতাম।

হুট করেই মেয়েটার হাসির ধরন পালটে গেল। ওর আসল মুখটা বন্ধ হয়ে

গেল, কিন্তু পেটের কাছের মুখটা ক্রমাগত হাসতেই লাগল। মেয়েটার মুখে কেমন যেন একটা গম্ভীরতা এসে ভর করেছে।

আকস্মিকভাবেই ফুলতে শুরু করল ওর শরীর। ঠিক একটা বেলুনের মতো।

মেয়েটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যেন শরীরের পরিবর্তন কিছুই টের পাচ্ছে না ও।

ফুলতে ফুলতে একটা সময়ে বিকট শব্দ করে ফেটে গেল শরীরটা। পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল এবড়ো-খেবড়ো মাংস। খানিকটা এসে পড়ল আমার বিছানাতেও।

ভয়ে প্রায় জমে গেলাম আমি।

সব কিছু চুপচাপ। নিজের নিশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পারছি আমি। পুরো ঘরে ভর করে আছে এক মহাজাগতিক নিঃস্তব্ধতা।

দেয়ালে, মেঝেতে সবখানে ছ্যাবরা-ছ্যাবরা মাংস আর রক্ত কেমন যেন একটা উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। গা গুলিয়ে বমি এল আমার।

টিক টিক টিক... অদ্ভুত একটা শব্দ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! ওই শব্দের তালে তালে পুরো ঘর জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাংস, রক্তগুলো নড়তে শুরু করল, চলতে শুরু করল!

আমার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে মেঝের মাঝখানে জড়ো হতে শুরু করল ওগুলো।

মাংসের একটা ছোট্ট বলের মতো জিনিস তৈরি হয়ে গেল নিমেষেই। তারপর ওই বলটা বড়ো হতে শুরু করল।

মোটামুটি ফুটবলের আকারে যখন ওটা চলে এল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে পুরো বলটার গায়ে অজস্র চোখ আর মুখ! প্রতিটা মুখে ভয়ংকর ধারালো দাঁত। অনেকটা সেই মেয়েটার বুকে থাকা মুখটার মতো।

বলটা বেড়েই চলল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা সবদিকেই! সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল চোখ আর মুখগুলো আকৃতি আর সংখ্যা।

আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে ওরা!

মনের মধ্যে আবার সেই আত্মহত্যার চিন্তাটা ফিরে এল। আবার মনে হতে লাগল এই ভয়াবহ দানবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় আর সেটা হল আত্মহত্যা!

বারবার জানালাটার দিকে নজর যেতে লাগল। ওখান থেকে লাফ দিলেই তো হয়! বেঁচে যাই ওই দানবটার হাত থেকে।

ক্রমাগত বড়ো আরও বড়ো হয়ে উঠছে বলটা। আমার বিছানার প্রায় কাছেই চলে এসেছে ওটা।

ওই ভয়াবহ দাঁতগুলোর যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়াই কি তবে আমার কপালে লেখা!

তার চেয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিলে কেমন হয়? এই দানবের খোরাক হয়ে কষ্টদায়ক মৃত্যুর চাইতে আত্মহত্যা অনেক আরামের মৃত্যু!

সেই বিকটাকৃতির দানবটার প্রতিটা মুখ থেকে একটা করে লকলকে জিহ্বা বেরিয়ে আসছে, প্রায় ছাদ স্পর্শ করে ফেলেছে ওটার উপরিভাগ। হুট করে হাতে ঠেকল মোবাইলটা। আশ্চর্য! তখনও রাত দুটোই বাজে।

মানে এতক্ষণে সময় একটুও পার হয়নি? সময় কি তবে থমকে গেছে?

কোনো কিছু না ভেবেই মোবাইলটা ছুড়ে মারলাম দানবটার দিকে। থক করে একটা শব্দ হল, তারপর ওটার শরীরের ভেতর ঢুকে গেল।

টেবিলের ওপর বহু পুরোনো কিছু খাতা কলম পড়ে ছিল সেগুলোও একটা একটা করে ছুড়ে মারতে লাগলাম।

সবগুলোই দানবটার শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল।

খিলখিলিয়ে হাসছে ওটা। ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শব্দে আমার যেন কানে তালা লেগে যাচ্ছে।

তবে কি ঝাঁপ দেব?

টেবিলের ওপর তখনও একটা জিনিস রয়ে গেছিল।

এক গ্লাস পানি! ইলার দেওয়া সেই বোতলটা থেকে এক গ্লাস পানি আমি ঢেলে রেখেছিলাম!

ততক্ষণে দানবটার একটা জিহ্বা আমার মাথার খানিকটা চেটে দিয়েছে। ঘেন্নায় সেই পানির গ্লাসটা তুলে মারলাম ওর দিকে।

তখনই ঘটল ব্যাপারটা! 'গক' করে একটা শব্দ হল।

পুরো ঘরে যেন বিস্ফোরণ হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে দানবটা আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে! টগবগ করে ফুটছে ওটার গোটা শরীর।

মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড!

তারপরেই সব শেষ। সব কিছুই আবার সেই আগের মতো। সেই পুরোনো ঘরে ফিরে এলাম, সেই দরজা। সেই বন্ধ জানালা।

কোনো অতিপ্রাকৃত উপস্থিতিও আর অনুভব করতে পারছিলাম না। ওই জিনিসটা তবে একেবারেই শেষ।

ঘরের মেঝে পানিতে ভরে আছে, এক পাশে গ্লাসটা ভেঙে টুকরো টুকরো অবস্থায় পড়ে আছে। ওই দানবটার কোনো চিহ্নই নেই।

বিছানাতে পড়ে থাকা মোবাইলটা হাতে নিলাম। ভোর সাড়ে পাঁচটার মতো বাজে।

ইলাকে ফোন করলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা ধরল ও। সম্ভবত রাতে তেমন একটা ঘুম হয়েছিল না ওর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ও এসে দরজা খুলে দিল। আমাকে জড়িয়ে ধরল।

আমরা দুজন মিলে এই ঘরটাকে বন্ধ করে দিলাম। ইলা জানাল অভিজিৎদাকে বলে পরে ভাঙা কাচের গ্লাসটা সরিয়ে ফেলবে।

ওর ঘরে গিয়ে বসলাম।

তারপর ওকে সব কিছু খুলে বললাম। ভোর ছটা বাজতেই মেস থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। অভিজিৎদা তখনও ঘুমিয়ে ছিল, হাহাহা।

***

"তারপর?" মিসেস. রায়হানের কণ্ঠে উদ্বেগ।

"তারপর? তেমন কিছু না আর। এরপর ওই ঘরে আর কোনো অদ্ভুত ঘটনার কথা শোনা যায়নি। তবে হ্যাঁ, ঘরটা আর ভাড়া হয়নি। এখন কোনো মেয়ের কোন অতিথি আসলে ওখানে থাকে। তবে খারাপ কোনো ঘটনার কথা আর শুনিনি,"

হাসল আফ্রিতা।

"ইলা বলেছে?"

"নাহ... আমিই খোঁজ নিয়েছিলাম।"

"ওই প্রেতটা, ওটা..."

"পরে জেনেছি ওই প্রকারের প্রেতকে বলে 'লুকান্ডকা'। সাধারণত মানুষকে আত্মহত্যাতে প্ররোচিত করার জন্য আফ্রিকার কিছু তান্ত্রিক এদের ব্যবহার করে। খুবই নীচু স্তরের প্রেত এরা। এদের দুর্বলতা হল পানি, পানি এরা সহ্য করতে পারে না।"

"তাই?"

"হুম, ওই ঘরে ওই জিনিসটা কী করে এল সেটা এখনও রহস্য।"

"ইলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়?"

"না," ভ্রূ কুঁচকে গেল আফ্রিতা, "ইলা মাঝে মাঝে ফোন দেয়, মেসেজ দেয়। আমি কিছুরই উত্তর দিই না। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো ইচ্ছাই নেই।"

"কেন?"

"বুঝলে মা, ওই মেসে যাওয়ার আগে আমি কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম। ইলার সঙ্গে ওই অদিতি নামের মেয়েটার সম্পর্ক ভালো তো ছিল। কিন্তু ভার্সিটির শুরুর দিকে কিন্তু ঘটনা একটু আলাদাই ছিল।"

"মানে?"

"ইলাকে বেশ বাজেভাবে i¨vগ দিয়েছিল অদিতি। কিন্তু পরে সব মিটমাট হয়ে যায়। ইলা অদিতির সবচেয়ে কাছের জুনিয়র ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার কী জানো? ইলা যেমনটা বলেছে, অদিতি খুব সাহসী ছিল... ব্যাপারটা কিন্তু এমন না। অদিতি মেয়েটা ছিল খুবই ভীতু, বিশেষ করে ভূত বা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারে ওর খুব ভয় ছিল। ওর ক্লাসমেটরাও অনেকবার ওকে ভূতের ভয় দেখিয়েছে। তাহলে? অদিতি ওই ঘরে রাতে থাকতে কেন যাবে?"

"কী বলতে চাচ্ছ?"

"সম্ভবত ইলাই অদিতিকে প্ররোচিত করে ওই ঘরে পাঠিয়েছিল। এবং আমার এটাও মনে হয় যে অদিতির মৃত্যুতে ইলার একটুও কষ্ট পায়নি।"

"তাহলে ও তোমাকে ডাকল?"

"অপরাধবোধ, এটা কখনও আগে জাগ্রত হয় তো কখনও পরে। হয়তো অপরাধবোধের কারণে ও আমাকে খোঁজ দেয়। কিন্তু ও টেনশনে ছিল, তাই সারারাত ঘুমায়নি। ও হয়তো ভাবছিল আমার সঙ্গেও অদিতির মতো কিছু একটা হবে!"

"তুমি যা বললে সব কিছু নিয়ে তুমি নিশ্চিত তো?"

"না, তবে আমার ধারণা ভুল হয় না।"

"আচ্ছা বাদ দাও। ওই প্রেত আর কখনও দেখেছ?"

"আহাহাহা, ছোটো জাতের প্রেত। তুমি চাইলে এই মুহূর্তে একটাকে এক চুটকি মেরে হাজির করতে পারি। করব?"

"রান্নাঘরে একটু যেতে হবে, থাকো," উঠে গেলেন মিসেস রায়হান।

হাসতে হাসতে আবার ফেসবুকে মনোযোগ দিল আফ্রিতা।

আকাশ-প্রতিম

"একমাত্র মৃত্যুর সামনেই আমরা সবাই সমান!'
-শমীক দাশগুপ্তের 'টিএনটি-আঁধারনগরী' গ্রাফিক নভেল থেকে।

।। ১ ।।

"কাল রাতেও আমি হ্যারিকে দেখেছি, বাগানের ছোট্ট গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ও," ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস. জেনিংস, "বিশ্বাস করো আফ্রিতা। আমি সত্যিই দেখেছি। কিন্তু ওর বাবা বলছে আমি নাকি স্বপ্ন দেখছিলাম।"

মহিলার কপালে হাত রাখল আফ্রিতা। তারপর কিছুক্ষণ চোখটা বন্ধ করে রইল।

"আমি আমার ছেলেকে দেখেছি," আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস জেনিংস।

"হ্যাঁ, আপনার ছেলে কাল রাতে এসেছিল, আপনাকেই দেখা দিতে এসেছিল," চোখ খুলল আফ্রিতা, "ওর মৃত্যুর একমাস হয়নি মনে হয়, তাই না?"

"দেখেছ।" প্রায় লাফিয়ে উঠলেন স্বর্ণকেশী মহিলা।

"ওর মৃত্যু কবে হয়েছে?"

"দু-সপ্তাহ!"

"কোনো দুর্ঘটনা, তাই না?"

"তুমি কী করে জানলে? কালই না এলে? কেউ বলেছে?"

"না না!"

"বাইক চালাচ্ছিল ও। ঠিক তখনই একটা গাড়ি এসে..." কেঁদে ফেললেন মিসেস. জেনিংস।

"আসলে মাঝে মাঝে এমনটা হয়ে থাকে। আকস্মিক দুর্ঘটনাতে যারা মারা যায় তারা সত্যিকার অর্থেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাই মারা যাওয়ার পর তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তারা আর বেঁচে নেই। এজন্যই মাঝে মাঝে দেখা দেয়।"

"আমার হ্যারি কি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না?"

"না বলাই ভালো। মৃতদের জগতের সঙ্গে জীবিত মানুষদের জগতের যোগাযোগ কখনও ভালো ফলাফল বয়ে আনে না।"

মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে চেয়ে রইলেন মিসেস. জেনিংস। ভদ্রমহিলা শ্বেতাঙ্গ, বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে সম্ভবত। চেহারাতে এখনও যথেষ্ট রূপ-লাবণ্য রয়েছে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা সোনালি চুল সেই সৌন্দর্যে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

"আপনি নিজের মনকে শক্ত করুন, হ্যারি মারা গেছে," ঠান্ডা গলাতে বলল আফ্রিতা।

"এবার কতদিনের জন্য এলে?" কথা ঘুরানোর চেষ্টা করলেন মিসেস জেনিংস। আফ্রিতার কথাটা তাঁর ভালো লাগেনি।

"দুই-তিন সপ্তাহ।"

"একা এলে যে।"

"মা অনেক কিছু নিয়েই ব্যস্ত, আমি তাই একাই চলে এলাম।"

"তোমাদের দেশটা ভারতের পাশে না?"

"হ্যাঁ, এককালে ভারতেরই অংশ ছিল।"

"জানো আমার দাদি দীর্ঘদিন ভারতে ছিলেন। উনি সবসময় বলতেন, 'ভারতীয়রা জাদুবিদ্যাতে সেরা!' আজ থেকে দেড়বছর আগে যখন তোমাকে দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম। উনি ঠিকই বলতেন।"

"পৃথিবীর সব দেশেই জাদুবিদ্যা চলে। এক-একটা অপরের চেয়ে আলাদা।"

"যাই তবে, রাতের খাবার খেতে এস আমার ওখানে একদিন।"

"হ্যাঁ যাব, আপনার হাতের রান্না আমার খুবই ভালো লাগে। তবে কিছুদিন পর, আজ নয়," হাসল আফ্রিতা। ও জানে মিসেস. জেনিংস ওকে একবার হলেও নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবেনই, "মি. জেনিংস কোথায়?"

"ও শহরে নেই, এমনিতেই বাড়িতে কম থাকে, হ্যারি মারা যাওয়ার পর থেকে তো আরো কম।"

বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। যে বাড়িতে কদিন আগেই একজন মারা গেছে সেখানে দাওয়াত খেতে যেতে সম্ভবত কোনো বাঙালিই পারবে না, আফ্রিতাও পারল না।

কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের ছোট্ট শহর 'কেস্টভিল'এ এখন আফ্রিতা। প্রায় দশ বছর আগে এই শহরে 'ফ্রেজার ম্যানসন' নামের বাড়িটা কেনে ওরা।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই এখানে ছুটি কাটাতে আসা হয়। শহর হিসাবে কেস্টভিল বেশ পিছিয়েই আছে। একটা মাত্র হাইস্কুল, দোকানপাটও কম, একটা সিনেমাহল, একটা রেলস্টেশন, একটা পোস্ট অফিস আর একটা পার্ক রয়েছে। রয়েছে ছোট্ট একটা গির্জা, অল্পকিছু দোকানপাটও। জনসংখ্যা সবমিলিয়ে আড়াইশোও হবে না।

তবে ডেনভারের খুব কাছে এই জায়গাটা। তাই কোনো দরকার পড়লে চট করে গাড়ি চালিয়ে ওদিকে যাওয়া যায়।

দেড় বছর আগে এই শহরে খুবই ছোটোখাটো একটা সমস্যার সমাধান করেছিল সে। তারপর থেকে মোটামুটি সবাই ওকে চেনে। বিশেষ করে শহরের বয়স্ক লোকেরা।

এইবার একাই এসেছে সে। গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকটা কেস নিয়ে অনেক মানসিক চাপ গেছে ওর। তাই একটু বিশ্রামের দরকার ছিল।

রাতে আবার মি. স্মিথদের বাড়িতে দাওয়াত রয়েছে। ফ্রেজার ম্যানসন থেকে পাঁচ মিনিট লাগবে পায়ে হেঁটে ওখানে যেতে। আমেরিকানরা রাতের খাবার আটটার মধ্যেই খেয়ে ফেলে বেশিরভাগ সময়ে, বাংলাদেশের হিসাবে তাই এটাকে 'সন্ধ্যার খাবারের দাওয়াত'ও বলা যায়।

বেশ ভালো লাগছে আফ্রিতার। ছোটো শহরটার ঠান্ডা পরিবেশ। কোনো সমস্যা নেই, চিন্তা নেই, অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়ের খোঁটাও নেই।

কিন্তু সে যদি জানত যে এখানে কীসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পড়তে হবে তাকে!

***

"খবর পাকা তো?" সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে বলল ড্যানি।

"একদম, জুলিয়া লাঞ্চের সময়েই বলছিল যে আজ রাতের সিনেমাটা দেখতে যাবে, স্টেফানি বলেছে ও একটু ব্যস্ত তাই যেতে পারবে না," দাঁত কেলিয়ে হাসল স্যামুয়েল।

"বাহ, তবে আজ রাতে আমিও যাচ্ছি, জুলিয়ার আশে-পাশেই থাকব।"

"আমিও যাই?"

"আরে না না, তোমার আবার কী দরকার? জুলিয়ার মন জয় করতে চাও নাকি?"

"না মানে সিনেমা দেখতে নাকি অনেক মেয়েই যাচ্ছে। ওই যে এইথড গ্রেডের পলা, সেও নাকি যাবে আজ!"

"পলা? মাথা ঠিক আছে ব্যাটা রামছাগল? ওই মেয়ে তোমাকে পাত্তা দেবে?"

"সেটাই," মাথা নামিয়ে দিল স্যামুয়েল তারপর ফিশফিশ করে বলল, "যেমন জুলিয়া তোমাকে।"

"কী বললি? কী বললি রে শুয়োর?" স্যামুয়েলের কলার চেপে ধরল ড্যানি।

"না না, মাফ করে দাও ড্যানি। দেখো তোমার জন্য কত খাটলাম।" মাছের মতো খাবি খেতে লাগল স্যামুয়েল।

ধাক্কা মেরে গলির অপরপাশের দেয়ালে ওকে ছুড়ে ফেলল ড্যানি। তারপর আধখাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিল ওর মুখে, "এই নে তোর পুরস্কার!"

উঠে দাঁড়াল স্যামুয়েল। প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি লম্বা সে। গায়ে বেশ জোরও আছে।

কিন্তু তারপরেও ড্যানির সঙ্গে ওর তুলনা চলে না। পাক্কা ছয়ফুট চার ইঞ্চি লম্বা ড্যানি। শরীরটাও বেশ তাগড়া। গায়ে বেশ জোরও আছে। স্কুলের রাগবি আর বাস্কেটবল দলের ক্যাপটেন সে। ইদানীংকালে একটু বখে গেছে। সিগারেটের সঙ্গে আরও উলটো-পালটা কিছু জিনিস সেবন করা ধরেছে। শুধু তাই নয়, শেরিফের ধারণা শহরে ঘটে যাওয়া কিছু ছিনতাইয়ের পেছনেও ওর হাত আছে। যদিও কোনো প্রমাণ নেই। স্কুলের সবাইই ড্যানিকে বেশ সমঝে চলে।

ওরা দুজনেই নাইনথ গ্রেডের ছাত্র।

ড্যানির একটাই দুর্বলতা আর সেটা হল ওদেরই ক্লাসের জুলিয়া নামের মেয়েটা। হিস্পানিক এই মেয়েটা এই বছরই কেস্টভিলে এসেছে। স্থানীয় পোস্ট অফিসের চাকুরে ওর মা, বাবা মারা গেছেন।

প্রথম দিন দেখার পরেই মেয়েটাকে ভালো লেগে গেছে ড্যানির। তারপর থেকেই সে সুযোগে আছে জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করার।

এমনিতে মেয়ের অভাব নেই ড্যানির জীবনে। স্কুলকে অসংখ্য রাগবি আর বাস্কেটবল ম্যাচে জিতিয়েছে সে আর সেজন্য ওর সঙ্গে প্রেম করার জন্য কেস্টভিল হাইস্কুলের অধিকাংশ মেয়েই একপায়ে খাড়া।

কিন্তু জুলিয়া কেমন যেন ব্যতিক্রম। ড্যানির সঙ্গে কথাই বলে না মেয়েটা। ওর সামনে গেলে ড্যানিও কেমন যেন ইতস্তত বোধ করে।

কেস্টভিলের বেশ কয়েকজন ছেলেই জুলিয়াকে পছন্দ করে। তবে ড্যানি ওকে পছন্দ করে এটা জানার পর ভয়ে আর কেউ ওর দিকে হাত বাড়ায়নি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে সিগারেটটা টেনে চলেছে স্যামুয়েল।

"আচ্ছা স্যামুয়েল, আঁতেল রেজি নাকি আজকাল জুলিয়ার আশপাশে খুব ঘুরছে?" একটু কেশে বলল ড্যানি।

"কে বলেছে? বরঞ্চ লাঞ্চের সময়ে আমিই দেখেছি যে রেজির কাছে অঙ্কের একটা সমস্যা বুঝে নিচ্ছে জুলিয়া," খ্যাক করে হাসল স্যামুয়েল।

রেজিকে প্রায় সবাই আঁতেল বলে ডাকে। ওদের ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র এই ছেলেটা। লেখাপড়ার বাইরে আর কোনো বিষয়েই আগ্রহ নেই ওর। স্কুলের শিক্ষকেরা সবাইই মোটামুটি ওকে পছন্দ করেন। সবারই বিশ্বাস যে রেজি একদিন বড়ো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে।

"হুম, শালা রেজিকে দেখে নেব!" দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ড্যানি।

"শুধু শুধু রেজির দোষ দিচ্ছ কেন? শোনো, জুলিয়া রাতে একাই যাচ্ছে শো দেখতে...সঙ্গে সম্ভবত ওই কুকুরটাই থাকবে।"

"ডাফি? ওই বুলডগটা?"

"হুম..সবসময়ই তো থাকে। বডিগার্ড!"

"থাকুক, নিরীহ একটা ছোটো কুত্তা। আজ তো জুলিয়ার পাশে আমিই বসছি!"

"দেখা যাবে!"

"তোমাকে যেন হলের আশেপাশেও না দেখি।"

"সিনেমাটা ইউটিউবেও পাওয়া যাচ্ছে বুঝলে? ওখানেই দেখে নেব, যত্তসব!"

"দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে!"

***

"একটা জিনিস খেয়াল করছ জুলিয়া, আজকাল প্রায় সবসময়ই স্যামুয়েল তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে," বিরক্ত কণ্ঠে বলল স্টেফানি।

"হুম, তাই তো দেখছি," চুল ঠিক করতে করতে জুলিয়া। প্রায় কোমর পর্যন্ত দিঘলকালো চুল ওর। চেহারাতে যথেষ্ট কমনীয়তা আছে। প্রথম নজরে মধ্যযুগের কোনো স্প্যানিশ রাজকন্যা বলেও ভুল করতে পারে অনেকে।

"পছন্দ করে নাকি?"

"আমার তা মনে হয় না। ড্যানির জন্য নজর রাখছে!"

"উফফ ড্যানি, ভাবতেই কেমন লাগে!"

"তোমার অনেক পছন্দ নাকি?"

"তা আর বলতে। স্কুলের, না না শহরের সব মেয়েরাই তো বলতে গেলে ওর জন্য পাগল। আর তুমি ওকে পাত্তা দিচ্ছ না!"

"বড্ড বুনো স্বভাবের একটা ছেলে ও স্টেফানি। এমন মানুষ পছন্দ নয় আমার!"

"প্রেমের মজা তো এই ধরনের ছেলের সঙ্গেই," মুখ টিপে হাসল স্টেফানি।

"বাদ দাও, আমার মনটা খারাপ!"

"আবার সেই দুঃস্বপ্ন?"

"হ্যাঁ! কালরাতে আবার দেখেছি, দিনের পর স্বপ্নটা যেন ভয়াবহ হয়ে যাচ্ছে, আমার ভয় লাগছে! আজ সকালেও দেখেছি, আজকের স্বপ্নটা একটু আলাদা।"

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে ওরা দুজন। বিকেল প্রায় হয়ে এসেছে। কেনসো'র চকোলেটের দোকান থেকে কিছু চকোলেটও কিনেছে জুলিয়া। এই ছোটো শহরে সেরা চকোলেটের দোকান কেনসো'স ক্যান্ডিশপ। বোঝাই যাচ্ছে রাতের সিনেমা নিয়ে ওর অনেক পরিকল্পনা।

"আলাদা, কেমন আলাদা?" স্টেফানির কণ্ঠে আগ্রহ।

"কাল বলি?"

"ধুর!"

"আচ্ছা আজ রাতে তবে সিনেমাহলে এস, বলব?"

"ওই সিনেমা পুরাই ফ্লপ, ইউটিউবেও পাওয়া যাচ্ছে। আমার বাড়ি এসো, দুজন মিলে দেখব!"

"না স্টেফানি আমার একটু পরিবেশ পরিবর্তন করা জরুরি। মনটা বেজায় খারাপ!"

"আচ্ছা তবে কালই বলো, বাড়ি এসে গেছে আমার," ছোট্ট দোতলা বাড়িটার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল স্টেফানি।

একমনে হাঁটতে লাগল জুলিয়া। গত কয়েকবছর ধরেই ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখে সে।

একটা বিকটাকৃতির বিরাট মূর্তি, মূর্তিটা এতটাই লম্বা যে ওটার মুখটাই ঠিক দেখা যায় না। ওই মূর্তিটার পায়ের কাছে একটা অদ্ভুত প্রাণী বসে থাকে।

প্রাণীটার শরীরটা কুকুরের, কিন্তু মাথাটা মানুষের!

কালরাতে অদ্ভুত স্বপ্নটা আবার দেখেছে সে। কিন্তু এইবার শুধুই মূর্তিটা! সেই অদ্ভুত প্রাণীটা আর নেই!

প্রতিবারই স্বপ্নটা দেখার পর কেমন যেন উদাস হয়ে যায় জুলিয়ার মন আর আজ তো আরও বেশি খারাপ লাগছে ওর। কেন যেন মনে হচ্ছে ভয়াবহ কিছু একটা হতে যাচ্ছে।

।। ২ ।।

সন্ধ্যা প্রায় হতে চলেছে। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই ইভিনিং শো শুরু হবে।

সিনেমা হলের পেছনের নির্জন গলিটায় দাঁড়িয়ে একমনে গাঁজার স্টিকটা টেনে চলেছে ড্যানি। আশেপাশে তেমন কেউই নেই।

সাধারণত শো শুরুর পনেরো মিনিট আগে দর্শকেরা লাইন ধরে হলে ঢুকতে শুরু করে।

গাঁজা টেনে তারপর হলের দরজা থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াবে সে, জুলিয়া এলে ওর পিছে পিছেই ঢুকবে।

গাঁজা টানার পর প্রতিবারই মাথাটা বেশ হালকা লাগে ড্যানির। আজকে মাথাটা ঠান্ডা রাখা খুব জরুরি ওর জন্য। যেভাবেই হোক টিকেট কাউন্টার থেকেই জুলিয়ার পিছে থাকতে হবে এবং সিটটা যেন ওর পাশেই পাওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

"কুউউউ..." একটা অদ্ভুত ডাক শুনে থমকে গেল ও।

গলির একদম ডানদিকের প্রায় অন্ধকার প্রান্তটা থেকে এসেছে ডাকটা।

ওদিকে কোনো স্ট্রিটলাইটও নেই।

শরীরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল ড্যানির। ডাকটা কি কুকুরের ডাক?

পকেট থেকে মোবাইল বের করে ওটার টর্চলাইটটা ওই কোণাতে ধরল সে।

একটা কুকুর, দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। মাথাটা কেমন অদ্ভুত না কুকুরটার?

আচ্ছা ওটা কি ডাফি? জুলিয়ার কুকুর? এত আগে! জুলিয়াও এসেছে নাকি?

নাহ, ডাফি আকারে এতোটাও বড়ো নয়।

আর একটু এগিয়ে গেল ড্যানি।

***

রাত সোয়া আটটার মতো বেজে গেছে।

রোমান্টিক ধাঁচের একটা সিনেমা। হলে বলতে গেলে তেমন কেউই নেই। যে-কজন মানুষ রয়েছে সবাই-ই জুলিয়ার চাইতে অনেক বয়স্ক।

তারপরেও সিনেমাটা বেশ উপভোগ করেছে ও।

স্কুলে কার কাছে থেকে যেন শুনেছিল যে ড্যানি নাকি আজ হলে আসবে, শুধুমাত্র ওর জন্য।

কিন্তু ড্যানি আসেনি। স্কুলের ওরা গুজবও ছড়াতে পারে!

সিনেমা প্রায় শেষের পথে।

***

"তুমি নিশ্চিত যে তোমাকে এগিয়ে দিতে হবে না? আফ্রিতা?" মৃদু হাসলেন মিসেস. স্মিথ।

"না না, এইতো এখানেই, হেঁটে হেঁটেই চলে যাব।"

"দেখো শহরে কিন্তু আবার ইদানীং ছিনতাই-টিনতাই বেড়েছে।" দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসলেন মি. স্মিথ।

"মি. স্মিথ! আমাদের ঢাকা শহর সম্পর্কে একবার গুগল করে দেখবেন দয়া করে! ওখানেই রাতে বের হই আর এখানে তো প্রশ্নই উঠে না।" হাঁটতে লাগল আফ্রিতা।

রাস্তা-ঘাট বেশ নির্জনই। ছোটো শহরগুলোর মানুষেরা রাতের বেলা খুব একটা দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বের হয় না।

ফ্রেজার ম্যানসনের প্রায় কাছে চলে এসেছে আফ্রিতা।

বাড়ির জানালার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মিসেস. জেনিংস। যেন একটা পাথরের মূর্তি।

আফ্রিতাকে দেখেই হাত নাড়লেন উনি।

এগিয়ে গেল আফ্রিতা।

"তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম," কেমন যেন প্রাণহীন কণ্ঠ মিসেস. জেনিংসের।

"আপনি কী করে জানলেন আমি এখন এদিক দিয়ে যাব? স্মিথদের বাড়িতে আমার দাওয়াতের কথা জানতেন?"

"নাহ, হ্যারি বলল!"

"হ্যারি!"

"হ্যাঁ, ও আবার এসেছে। ওর অনেক কষ্ট! ও তোমার কাছে কিছু একটা চায়! প্লিজ বাড়িতে এসো।"

"হুম, চলুন!"

মিসেস. জেনিংসের বসার ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। সোফার ওপর বসে পড়ল আফ্রিতা। কফি মেশিন থেকে দুকাপ কফি নিয়ে এলেন মহিলা।

"মি. জেনিংস কোথায়? আসেননি?" কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল আফ্রিতা।

"না, আজ ফিরবে না।"

"সত্য বলতে কী মিসেস. জেনিংস আপনার বাড়িতে আমি কোনো প্রেতশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি না।"

"আচ্ছা? পেছনের উঠানের দিকে চলো।"

পেছনের ঘরটাতে আফ্রিতাকে নিয়ে গেলেন মিসেস. জেনিংস। একটা ডাইনিং টেবিল, ফ্রিজ আর বাসন-কোসন ধোয়ার জায়গা।

তার ঠিক পেছনেই উঠানটা। বেশ কয়েকটা গোলাপের চারা দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোতে।

"ওদিকে দেখো, হ্যারি ওখানেই আছে," ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস. জেনিংস।

উঠানের দিকে তাকাতেই গম্ভীর হয়ে উঠল আফ্রিতার মুখ। ব্যাপারটা আসলেই অনেক বেশি জটিল।

"তুমি হ্যারিকে দেখতে পাচ্ছ?" বললেন মিসেস. জেনিংস।

"না, তবে ওখানে ও আছে। শুধু ও না।"

"মানে?"

"ওর সঙ্গে আরও কিছু একটা আছে। ভয়ংকর খারাপ কিছু। যার হাত থেকে ও মুক্তি চায়," চশমাটা খুলল আফ্রিতা।

***

সিনেমা হলের পেছনদিকটা কেবল দেখা বাকি এখন। যদিও ওদিকে সাধারণত কেউ থাকে না।

তারপরেও প্রতিদিন রাতে একবার করে পেছন দিকটা দেখে সব কিছু বন্ধ করাটা মি. হবসের অভ্যাস। কেস্টভিল সিনেমাহলের প্রধান কেয়ারটেকার তিনি।

হলের অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছে না। এমনিতেই কর্তৃপক্ষ তেমন ভালো কোনো সিনেমা আনতে পারে না। যেগুলো আনে সেগুলোর বেশিরভাগই ইউটিউবে পাওয়া যায়। তাই গত কয়েক বছর ধরে তেমন লোক হচ্ছে না হলে।

আজ তো রাতের শোয়ের একটা টিকিটও কেউ কাটেনি। তাই নটার দিকেই সব কিছু বন্ধ করে দিতে হচ্ছে।

গলির ভেতর ঢুকে টর্চ মারতেই চমকে গেলেন তিনি।

গলির অপর পাশের দেয়ালের দিকে মানুষের দুটো পা দেখা যাচ্ছে। খুবই

কম ক্ষমতাসম্পন্ন একটা সেকেলে টর্চ উনার হাতে, তাই এর বেশি দেখা যাচ্ছে।

আজকাল শহরে নেশাখোরদের সংখ্যা খুব বেড়েছে। তাদের কেউ হবে হয়তো।

এগিয়ে গেলেন তিনি। ব্যাটাকে তুলে দিতে হবে, হলের পেছনটা মাতাল হয়ে পড়ে থাকার জায়গা নয়, বাড়ি গিয়ে যা খুশি করুক কিংবা রাস্তাতে শুয়ে থাক।

দেয়ালের একদম কাছে গিয়ে টর্চ মারলেন তিনি আর শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল তাঁর।

সম্ভবত এতো ভয়ংকর কোনো দৃশ্য উনি এর আগে কোনোদিনই দেখেননি। দেখেনি কেস্টভিলের কেউই!

"ড্যানি!" নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল হবসের।

***

"এই কুত্তা, তোর মাথাটা তো মানুষের মতোই, তুই কথা বলতে পারিস?" চেঁচিয়ে উঠল ডগলাস।

হাসি ফুটে উঠল অদ্ভুত প্রাণীটার মুখে। তারপর এক লাফে বড়ো পাইন গাছটায় উঠে গেল সে, তারপর সোজাসুজি অদৃশ্য!

"আজকে কি খুব বেশিই নেশা করে ফেলেছি নাকি?" আপনমনেই বলে উঠল ডগলাস, "কুত্তার মাথা মানুষের মতো! এইসব আবার কী? ধুস শালা!"

পার্কের ভিতরের ছোট্ট পুকুরটার পাশের একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল সে। এই অবস্থায় বাড়ি গেলে জ্যানেট একদম ঝাড়ু দিয়ে পিটাবে। নেশা একটু হালকা হলে যাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সে খেয়াল করেনি যে পুকুরের অপরদিকের অন্ধকার জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

সব কিছুই দেখেছে সে।

"অন্ধকারের জীব, আত্মার ওপর ভর করে এসেছিস, আত্মার মধ্যেই হারিয়ে যাবি!" বেশ জোরে হেসে উঠল লোকটা।

তার হাসি শুনতে পেল না ডগলাস।

।। ৩ ।।

বেশ মন যোগ দিয়ে বৃত্তটা আঁকল আফ্রিতা। মিসেস. জেনিংসের বসার ঘরে এসেছে ওরা দুজন।

"বৃত্তের ভেতরে যান, আর আমি যতক্ষণ না বলব তার আগে বের হবেন না, যত যাই হয়ে যাক," শক্ত হয়ে এসেছে আফ্রিতার মুখ।

"প্রেতচক্র নাকি?" মিসেস. জেনিংসের চেহারায় উদ্বেগ।

"ভয়ংকর কিছুই না, আপনার পুরো বাড়িতে প্রেতশক্তির কোনো অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু পেছনের উঠানে গেলে বোঝা যাচ্ছে! এটা কেমন কথা? ...াবার অনভিজ্ঞ কেউ কিন্তু সহজে বুঝবে না। তারা ভাববে পুরো বাড়িতে কোনো ...তশক্তির ছায়া নেই! কোনো ভয়ংকর অতিপ্রাকৃত শক্তির নজর এই বাড়ির ...কে।"

"হ্যারির প্রেত?"

"নাহ, অন্য কিছু, যেটা হয়তো হ্যারির প্রেতের সঙ্গে আছে!"

"মানে কী?"

"পরে বলব, আপাতত আমার কথামতো কাজ করুন!"

বৃত্তটার ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন মিসেস. জেনিংস।

***

কেস্টভিল হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রববি। রাত প্রায় সাড়ে নটার মতো বেজেছে।

ওর চেহারাতে উদ্বেগ স্পষ্ট। গত সাতমাস ধরে কেস্টভিলে আছে সে। এত ভয়াবহ কোনো জিনিস এর আগে সে দেখেনি।

রববির উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছফুট। মাথাভর্তি বাদামি চুল, পুলিশের ইউনিফর্মে বেশ মানায় ওকে। ওর জন্ম আর বেড়ে ওঠা সবই ডেনভারে। কেস্টভিল পুলিশের চাকরিটাও বেশিদিন করার ইচ্ছা নেই ওর। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার জন্যই করছে। এক-দেড় বছর পর ডেনভারেই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা।

থমথমে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন ডা. এমিলি। মধ্যবয়স্ক এই মহিলার চেহারা দেখলে মাঝে মাঝে স্কুলের রাগি শিক্ষিকাদের কথা মনে পড়ে যায় রববির।

"অফিসার, আমার মনে হয় না ওকে কোনো মানুষ মেরেছে, সম্ভবত কোনো জানোয়ার..." ফিশফিশ করে বললেন তিনি।

"লাশ তো একদম টুকরো টুকরো হয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ, শুধু মাথাটাই অক্ষত আছে। ছেলেটাকে আমি চিনি অফিসার। আর সেটাই খারাপ লাগছে!"

"তাই? কী নাম ওর?"

"ড্যানি, কেস্টভিল হাইস্কুলে পড়ে। আমার মেয়েরই ক্লাসে। ছেলেটাকে দেখেছি আগেও। ওর বাড়িতে জানিয়েছেন?"

"না, ওর বাড়িটা কোনদিকে? কনস্টেবল ফ্রেডরিককে পাঠিয়ে দেব আমি।"

"পার্ক স্ট্রিটের তিননম্বর বাড়িটা।"

"কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট?"

"নাহ! কিছুই নেই... তবে কিছু টেস্ট করতে হবে, ওগুলোর ফলাফল আসতে আসতে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জানেনই তো আমাদের অবস্থা। আর কেস্টভিলে এমন ঘটনা হবে কে জানত?"

"আমাদেরও একই অবস্থা ম্যাম! লোকস্বল্পতার কারণে আমি একাই তদন্ত করছি।"

"বুড়ো শেরিফ মার্ক কই? ওকে দেখছি না!"

"শেরিফ সাহেব ডেনভারে গেছিলেন, রওনা দিয়ে দিয়েছেন। রাতের মধ্যেই এসে পড়বেন। আচ্ছা আপনার মেয়ে ওর ক্লাসমেট, তাই না?"

"হ্যাঁ!"

"ওকে একটু জিজ্ঞাসা করুন, ছেলেটার সঙ্গে কারো কোনো সমস্যা ছিল কিনা। আমি একটু সিনেমাহলের কেয়ারটেকার হবসকে জেরা করব। লাশটা প্রথম সেই

দেখেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে আর হলের বাকি কর্মচারীরা বলছে যে ওরা কেউই কোনো চিৎকার শোনেনি! এমন করে একটা মানুষকে মারল আর কোনো চিৎকার নেই! ওদেরকে থানাতেই বসিয়ে রেখে এসেছি! এত রাতে এর বেশি আর কী করতে পারি?"

"সেটাই। তবে আমার মনে হয় কোন বন্য জানোয়ার। তবে চিৎকার না শোনাটা! হলের ভেতর কি খুব আওয়াজ?"

"আরে নাহ, হলের সাউন্ড সিস্টেমের অবস্থা তেমন ভালো না। আঙুলের ছাপ নেই, এটা একটু অদ্ভুত না?"

"তা তো বটেই। হয়তো খুনি গ্লাভস পরে ছিল। কিন্তু মানুষ কি মানুষকে এভাবে খুন করতে পারে? পুরো শরীর ফালাফালা হয়ে গেছে! শুধু মাথাটাই রয়ে গেছে!"

"গ্লাভস মানুষই পরে ম্যাম, কোনো পিশাচ নয়!"

***

বৃত্তটার মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস. জেনিংস।

"লা মা হিং,লাসু লা হিং।" একটানা অদ্ভুত একটা মন্ত্র পড়ে চলেছে আফ্রিতা। সে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা বৃত্তের মধ্যে।

মিসেস. জেনিংসের মনে হচ্ছে ক্রমাগত যেন ঘরের তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। শীত-শীত লাগছে উনার।

'টক টক টক," অদ্ভুত একটা শব্দ শুরু হলো ঘরের ঠিক মাঝখানে।

টিভি চ্যানেলের মতো ঝিরঝিরে একটা আলো ফুটে উঠল কোনো উৎস ছাড়াই আর ধীরে ধীরে সেই আলোটাই পরিণত হল হ্যারির শরীরে। পুরো শরীরটা ঝিরঝির করছে ওর।

"হ্যারি, সোনা আমার।" চিৎকার করে উঠলেন মিসেস. জেনিংস।

"দাঁড়ান, ওখানেই দাঁড়ান," আঁতকে উঠল আফ্রিতা।

"হ্যারি..আমি আফ্রিতা, আমাকে মনে আছে?" হ্যারির ছায়ামূর্তিটার দিকে ঘুরে তাকাল সে।

মাথা নাড়ল ছায়ামূর্তিটা। দেড় বছর আগের ওই কেসের সময় থেকেই ওকে খুব ভালো করে চেনে হ্যারি।

"তুমি কথা বলতে পারবে?"

"ক ক কষ্ট।" যান্ত্রিক একটা গলায় বলে উঠল প্রেতটা।

"কে দিচ্ছে কষ্ট?"

"ওটা"

"ওটা কী?"

"ও ও মি মি" আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে ঠিক তখনই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন মিসেস. জেনিংস আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল আফ্রিতা।

***

“মি. হবস, তাহলে আপনিই ড্যানি নামের ছেলেটার লাশ প্রথম দেখেন?” কফির কাপটা হবসের দিকে এগিয়ে দিল রববি।

“হ্যাঁ ইশশ যদি আমি না দেখতাম!”

“ওকে আপনি চিনতেন কী করে?”

“কেস্টভিলে তো একটাই হাইস্কুল। আমার ছেলেও ওখানে পড়ে। এই ছেলেটা বেশ জনপ্রিয়। পুরো শহরে প্রায় সবাইই ওকে চেনে।”

“আপনি কখন মৃতদেহটা দেখলেন?”

“সন্ধ্যার শো-ই আজকে শেষ শো ছিল, রাতের শোয়ের একটাও টিকিট বিক্রি হয়নি। তাই আমরা হল বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। প্রতিদিনই আমি একবার করে পেছনের গলিটা দেখে আসি, এটা তো আমার দায়িত্ব আর কাল দেখতে গিয়ে।”

“আপনারা কোনো চিৎকার-চেঁচামিচি শোনেননি? নিশ্চিত? কিন্তু হলের সাউন্ড সিস্টেম তো সেই খারাপ, পেছনের গলিতে জোরে কেউ চিৎকার করলে তো শোনা যাওয়ার কথা।”

“হ্যাঁ, শোনা যায়ও, সেটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। কেউই কিছু শুনলাম না।”

“মৃতদেহের আশেপাশে তো কাউকে দেখেননি, তাই না?”

“নাহ, আপনি কি মনে করছেন কেউ ওকে খুন করেছে? অফিসার, কোনো মানুষ এইভাবে কাউকে মারতে পারে না! উফফ!”

“আচ্ছা বাদ দিন। কালকে অদ্ভুত কিছু নজরে পড়েছে? গলির পিছে? বা কেউ কিছু দেখেছে? মানে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পুরোপুরি আসেনি। তাই আমরা বুঝতে পারছি না যে ঠিক কখন ড্যানি মারা গেছে।”

“নাহ তেমন কিছুই না!”

“আমি কি কিছু বলতে পারি স্যার?” হবসের পাশে বসে থাকা ছোকরা এই প্রথম কথা বলে উঠল।

ভালো করে ওর দিকে তাকাল রববি। ছেলেটা ড্যানিরই বয়স্ক হবে, একটু খাটো। তবে চেহারা যথেষ্ট ধারালো। হলের কোনো কর্মচারী সম্ভবত। আর দুজন লোক বসে আছে, তবে ওরা কোনো কথা বলছে না। থানা থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে।

“তুমি কে হে?” বেশ কড়া গলাতে বলে উঠল রববি।

“আমি এড, রিসেপশন ডেস্কে বসি আর টিকেট বেচি।”

“তুমিও কেস্টভিল হাই স্কুলে পড়তে নাকি?”

“না স্যার, আমি মিডল স্কুল পাশ করতে পারিনি। তবে কেস্টভিল হাইয়ের সবাইকেই মোটামুটি চিনি। ড্যানিকে তো অবশ্যই।”

“আজকের সিনেমার টিকিট কি ড্যানি কিনেছিল?”

“নাহ কেনেনি, ও হলের ভেতরেই আসেনি, এলে আমি দেখতাম।”

“তা কী যেন বলতে চাইছিলে?”

“বিকালের শো শেষ হওয়ার পর আমি বাড়ি যাই, তারপর সন্ধ্যার ঠিক আগ দিয়ে আবার ফিরে আসি। ওই গলির পাশের রাস্তা দিয়েই ফিরে। কাল হলে ঢোকার আগে ওই গলি থেকে কুকুরের ডাক শুনেছিলাম আমি! কান্নার মতো কিছুটা। আর

ড্যানিকেও ওই গলিতে ঢুকতে দেখেছি, সন্ধ্যার ঠিক আগ দিয়ে।"

"এ আর অদ্ভুত কী? কোনো কুকুর হয়তো গলিতে ঢুকেছিল! ড্যানির সঙ্গে কেউ ছিল?"

"সেটাও কথা স্যার। তবে শব্দটা একটু অদ্ভুতই ছিল, যেন একটা কুকুর ধীরে ধীরে ডেকে উঠছে, কেঁদে উঠছে! এমনকি যখন টিকেট কাউন্টারে বসেছিলাম তখনও এই শব্দটা কয়েকবার শুনেছি। আর ড্যানি একাই ছিল, কেউ ছিল না ওর সঙ্গে।"

"এটা শুনেছ কিন্তু ড্যানির চিৎকার শোনোনি?"

"না স্যার!"

"অতিরিক্ত হরর সিনেমা দেখো নাকি?"

"তা দেখি!"

"তবেই হয়েছে। আপনাদের কিছু বলার আছে? কী করেন আপনারা?" বসে থাকা অপর দুজন লোকের দিকে তাকাল রববি।

ওরা কিছুটা থতোমতো খেয়ে গেল।

"ওদের নাম স্টিফেন আর হ্যাল, একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী আর আর একজন টিকেট কালেক্টর। ওরা কিছুই জানে না!" বলে উঠল হবস।

"তাই নাকি?" ভ্রূ কুঁচকে গেল রববির।

মাথা নাড়ল ওরা দুজন।

***

"এ কী করলেন আন্টি?" রেগে গেল আফ্রিতা, "অনেক কষ্ট করে ওর আত্মাটাকে ডেকে এনেছিলাম, এখন আর কোনোভাবেই ওকে আনা সম্ভব না!"

"আমি দুঃখিত, আমার ছেলেটা," প্রায় কেঁদে ফেললেন মিসেস. জেনিংস, "ওর কী হয়েছে?"

"কিছু একটা ওকে কষ্ট দিচ্ছে, হয়তো ও সে-কথা খুলেও বলত।"

"আমি দুঃখিত!"

"বাদ দিন, আমি যাচ্ছি। ঘুমাতে হবে।"

"রাগ করো না।"

"হুম," মিসেস. জেনিংসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আফ্রিতা।

***

"তো বেশ রাত হয়ে গেছে, তবে ছেলেটার বাড়ির লোক এখনও এসে পৌঁছোল না, ব্যাপারটা অদ্ভুতই। যাই হোক আপনারা আসতে পারেন এখন। কাল দেখা হবে, কেউ কিন্তু শহর ছেড়ে বাইরে যাবেন না," কড়া গলাতে বলল রববি।

মাথা নাড়াল হবস, এড আর বাকি দুজন।

"ড্যানির চাচাকে পাওয়া গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে," থানাতে প্রবেশ করল মধ্যবয়স্ক একজন ব্যক্তি। মাথার চুল পেকে গেলেও শরীরটা এখনও বেশ মজবুতই রয়েছে সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার লোকটার। শেরিফ মার্ক এডিনসনকে কেস্টভিলের লোকেরা বুড়ো মার্ক বলে ডাকে।,

"আরে শেরিফ," উঠে দাঁড়াল রববি, "আপনি এসে গেছেন!"

"হ্যাঁ, তো তুমি কি ওদের চলে যেতে বলছিলে?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী? রাত হয়ে গেছে। ওরা কি থাকবে?"

"নাহ, যাও তোমরা।"

বেরিয়ে গেল ওরা চারজন।

"শহরে বাইরে থেকে কেউ এসেছে কিনা খোঁজ নিয়েছিলে?" একটা সিগার ধরিয়ে বললেন শেরিফ।

"নাহ, বাইরে থেকে কে আর আসবে? এই মরা শহরে কেউ আসে?"

"এসেছে, ফ্রেজার ম্যানসনের বিদেশি মেয়েটা এসেছে।"

"ফ্রেজার ম্যানসন? ওই পুরোনো বাড়িটা?"

"হ্যাঁ, কয়েকবছর আগে দক্ষিণ এশিয়ার একজন মহিলা ওটা কিনে নেন। ওই মহিলার মেয়েই আসে মাঝে মাঝে মেয়েটা, উমম..."

"কী?"

"শহরের অনেকের মতেই মেয়েটা ডাইনি!"

"কীহ!"

"হ্যাঁ দেড় বছর আগে এই শহরে এক ভয়াবহ অতিপ্রাকৃত রহস্য সমাধান করেছিল সে। জ্যাকলিন স্ট্র্যাকার নামে এক নর্তকীর আত্মা প্রায় অস্থির করে রেখেছিল পুরো শহরকে। ওই মেয়েটা সেই আত্মাকে তাড়ায়!"

"আপনি এসব বিশ্বাস করেন শেরিফ?"

"আমি নিজের চোখে ভূতটাকে দেখেছি!" স্থির দৃষ্টিতে রববির দিকে তাকিয়ে বললেন শেরিফ।

"মারা যাওয়া ছেলেটার চাচাকে নিয়ে এসেছি স্যার," এই বলে ডগলাসকে নিয়ে থানাতে ঢুকল কনস্টেবল ফ্রেডরিক। ভাতিজার মৃত্যুর খবর শুনে নেশা অনেকটাই কেটে গেছে ডগলাসের।

"আমার ছোট্ট ড্যানকে কে মারল?" কাঁদতে কাঁদতে শেরিফকে জড়িয়ে ধরল ডগলাস।

"জ্যাকলিনের আত্মার গল্প পরে হবে," রববির দিকে তাকিয়ে বললেন শেরিফ।

***

"কী বলছ মা! ড্যানি মারা গেছে!" হতভম্বের মতো হয়ে গেল স্টেফান্নি।

"হ্যাঁ, আমি ওর লাশ দেখেই এলাম, খুব নির্মম হত্যাকাণ্ড। হয়তো কোনো জানোয়ার।" সোফার ওপর বসলেন ডা এমিলি।

"ও নাকি আজ জুলিয়ার সঙ্গে..."

"জুলিয়া মানে? তোমার বান্ধবী? ওরা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছিল?"

"না না ঠিক তা নয়। জুলিয়া একাই গেছিল। আসলে ড্যানি জুলিয়াকে অনেক পছন্দ করে। তাই স্কুলে একটা গুজব চলছিল যে আজ নাকি যেভাবেই হোক সিনেমা হলে জুলিয়ার পাশেই বসবে ও।"

"একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলেন অফিসার রববি। ড্যানি সিনেমার টিকিট কাটেনি।"

"অদ্ভুত! আর হলের পেছনে ওর লাশ পাওয়া গেল!"

"আচ্ছা ড্যানিকে কতটা চেনো তুমি?"
"ওই যে শহরের সব মেয়েরা যেভাবে চেনে। ওকে প্রায় সবাই পছন্দ করে।"
"জুলিয়াও?"
"না, জুলিয়া তেমন পাত্তা দিতো না।"
"ওর সঙ্গে কারো কোনো সমস্যা?"
"ছেলেদের থাকে না? ওই যে হালকা কিছু সমস্যা। তবে খুন করার মতো সমস্যা নেই। তারপরেও স্যামুয়েল সব খুলে বলতে পারবে।"
"স্যামুয়েল? কে?"
"ড্যানির সবচেয়ে কাছের বন্ধুই বলতে পারো।"
"হুম!"
"এতক্ষণে তো গোটা শহরে সম্ভবত খবরটা ছড়িয়ে গেছে তাই না?"
"হ্যাঁ তা তো বটেই। আমাকে একটু জুলিয়ার নম্বরটা দিও তো।"
"আচ্ছা।"

***

হড়হড় করে বেসিনে বমি করে চলেছে ডগলাস। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে রববি, চোখেমুখে বিরক্তি তার।
বেশ দূরে একটা টেবিলে বসে আছেন শেরিফ।
ধাতস্থ হয়ে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগল ডগলাসের।
তারপর তাকে নিয়ে আসা হল শেরিফের টেবিলের সামনের চেয়ারটায়।
"তোমাকে মানা করেছিলাম ডগলাস, মৃতদেহটা দেখো না, কিন্তু শুনলে না!" নরম গলায় বললেন শেরিফ।
"ঈশ্বর! আমার একমাত্র ভাতিজা! আমি ছাড়া ওর কেউ ছিল না," কাঁদতে লাগল ডগলাস।
"ও তো বেশ অনেক বছর ধরেই তোমার কাছে আছে, তাই না?"
"হ্যাঁ, প্রায় পনেরো বছর। ওর বাপ মানে আমার ভাই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর থেকেই।"
"ওর মা?"
"ওর জন্মের পরেই মারিয়ার সঙ্গে আমার ভাইয়ের ডিভোর্স হয়ে গেছিল। তারপর আমাদের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ নেই। জানিও না কোথায় থাকে। যতদূর শুনেছি ক্যালিফোর্নিয়ার ওদিকে।"
"আচ্ছা বাদ দাও, তুমি কাউকে সন্দেহ করছ?"
"কাকে সন্দেহ করব? ওকে মেরেছে একটা দানব! দানবটাকে দেখেছি আমি! পার্কে।"
"কেমন দানব?"
"শরীরটা কুকুরের, মাথাটা মানুষের। আমাকে দেখে হেসেছে ওটা। তখন যদি জানতাম আমার ভাতিজা ওর শিকার! ভেবেছিলাম নেশার ঘোরে ভুল দেখছি।"
"ভুলও তো দেখতে পারো?" গম্ভীর হয়ে গেল শেরিফের মুখ।
"আমি ভুল দেখিনি, আজ অতটাও নেশা করিনি আমি।"

"অমন প্রাণী আবার হয় নাকি?" তাচ্ছিল্যের হাসি দিল রববি।

"আপনি বলতে চান আমি মিথ্যা বলছি? অ্যা অ্যা অ্যা..." চেঁচাতে লাগল ডগলাস তারপর আবার জ্ঞান হারালো ব্যাটা।

"ওকে পার্কেই পেয়েছিলে তাই না?" কনস্টেবল ফ্রেডরিকের দিকে তাকিয়ে বললেন শেরিফ।

"হ্যাঁ স্যার।"

"নেশার ঘোরে কীসব দেখেছে স্যার, অমন অদ্ভুত প্রাণী হয় নাকি?" হাসল রববি।

"বয়স কত তোমার ছোকরা?" কেমন যেন বিরক্তি শেরিফের কণ্ঠে।

"সাতাশ," থতোমতো খেয়ে গেল রববি।

"ছেলেমানুষ তুমি। এইসবের কতটুকুই বা জানো?"

"তার মানে অমন প্রাণী আছে বলছেন? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন নাকি?"

"তোমার সঙ্গে কি ইয়ার্কির সম্পর্ক আমার?"

"দুঃখিত স্যার।"

"অমন একটা প্রাণীর উল্লেখ আছে আমাদের এই অঞ্চলের লোককথাতে, মিকুন্ডা।"

***

ফ্রেজার ম্যানসনের তালা খুলছে আফ্রিতা। বিরক্ত লাগছে ওর। মিসেস. জেনিংস মানুষটা খুবই বিরক্তিকর।

"মাঝে মাঝে কিছু ছায়া শুধু শুধুই একটা কায়াকে এনে দাঁড় করায় নিজেদের আড়াল করার জন্য," পেছন থেকে বলে উঠল কেউ।

ঘুর তাকাল আফ্রিতা। স্ট্রিটলাইটের নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে, শরীরে বেশ লম্বা ওভারকোট।

একটু অবাকই হয়েছে সে, লোকটার ইংরেজি উচ্চারণের মধ্যে উপমহাদেশীয় ছাপ রয়েছে। এই শহরে সে ছাড়া উপমহাদেশের আর অন্য কেউ আছে সেটা তার জানা ছিল না।

"আমাকে বললেন?" লোকটার উদ্দেশে বলে উঠল সে।

অপরদিকে ঘুরে হাঁটা শুরু করল লোকটা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আঁধারে।

দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকল আফ্রিতা। বেশ ঘুম এসেছে তার।

***

নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না জেফের।

ওদের বাড়ির পেছনের উঠোনে যে অদ্ভুত প্রাণীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটার শরীরটা তো কুকুরের, কিন্তু মাথাটা মানুষের!

কেস্টভিল এলিমেন্টারি স্কুলের ছাত্র জেফের এখনও ভূত-প্রেত নিয়ে ধারণা পরিষ্কার না। সম্ভবত সেই কারণেই ভয়াবহ প্রাণীটা দেখেও খুব বেশি ভয় পেল না সে।

এক লাফে উঠানের বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তাতে উঠে পড়ল সেই অদ্ভুত প্রাণী।

মায়ের ঘরের দিকে দৌড় দিল জেফ।

"বুঝলে হে ছোকরা, কলোরাডোতে আজ থেকে তেরো হাজার বছর আগে প্রথম মানবসভ্যতা স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ওরা কী করত না করত, কীসের উপাসনা করত তা কিন্তু আজও রহস্য," একটু কেশে নিলেন শেরিফ।

"সেটাই স্যার," মাথা নাড়ল রববি। ইতিহাস তার বিরক্ত লাগে। কিন্তু শেরিফ গাড়ি করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। এখন ইতিহাস শোনা ছাড়া উপায় নেই।

"স্থানীয় আদিবাসীরা অদ্ভুত কিছু শক্তির পূজা করত, বিশেষ করে অ্যাপাচিরা। ওরা এক অদ্ভুত প্রাণীর কথা বলত। যার মাথাটা মানুষের, কিন্তু শরীরটা কুকুরের। ১৫৪০ সালে এখানে স্প্যানিশরা আসে। স্যান্ট্রো রামিরেজ নামের একজন স্প্যানিশ নাবিক নিজের ডায়েরিতে লিখে যান এই প্রাণীর কথা, একটা ছবিও এঁকেছিলেন উনি, কেস্টভিল মিউজিয়ামে ছবিটা এখনও আছে। অ্যাপাচিরা নাকি বলে এই প্রাণী হাজার বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওদের মুখেই সে শোনে যে এর নাম 'মিকুন্ডা'। কেস্টভিল জাদুঘরে গেছ কখনও?"

"না স্যার!"

"যাবে সময় পেলে। ওখানে এখনও সেই আঁকা ছবিটা আছে।"

"তো আপনি বলতে চাচ্ছেন যে রূপকথার ওই প্রাণীটা ফিরে এসেছে?"

"তা নয়। তবে তুমি বললে না, এইরকম প্রাণী থাকা সম্ভব না?"

"স্যার, মানুষ এইরকম কাহিনি ছড়াতেই থাকে। তাই বলে এমন অবৈজ্ঞানিক জিনিস বিশ্বাস করবেন?"

"করতাম না, যদি না ফ্রেজার ম্যানসনের ওই বিদেশি মেয়েটা দেড় বছর আগে ওই অদ্ভুত ভেলকিটা না দেখাত।"

"কী দেখিয়েছিল?"

"কাল বলব, তোমার বাড়ি এসে গেছে!"

বাইরে তাকাল রববি। ওর ছোট্ট বাড়িটার একদম সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি।

"শুনেই যাই স্যার?" বলল সে।

"নাহ কাল। আজ আর ভালো লাগছে না।"

মনে মনে শেরিফকে গালি দিতে দিতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল রববি।

***

ধড়ফড়িয়ে বিছানাতে উঠে বসল জুলিয়া। সিনেমা দেখে ফিরে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শুয়েছিল, কখন যে ঘুম এসে গেছিল।

আবার সেই স্বপ্নটা দেখেছে ও।

সেই অদ্ভুত মূর্তিটা, পায়ের কাছের সেই প্রাণীটা এবারও নেই।

ফোনটা তুলে নিল সে, এগারোটা মিসকল আর একটা মেসেজ। ফোন সাইলেন্ট করা ছিল।

সবগুলো মিসকলই স্টেফানির। এই সময়ে স্টেফানি!

মেসেজটা খুলল সে।

ড্যানি মারা গেছে! কে ওকে খুন করেছে?

বাইরে থেকে জেফের গলা শোনা যাচ্ছে। মাকে কিছু একটা বলছে সে। ওদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে তা জুলিয়ার কানে গেল না।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছে সে।

***

রাতের বেলা বেশ সময় নিয়ে গোসল করল আফ্রিতা। প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বেজে গেছে ঘুমাতে হবে।

ফেসবুকে বেশ কয়েকটা মেসেজ এসেছে। সেই উদ্ভট লোকটা মেসেজ দিয়েছে, "আপনি কি বিদেশে?"

কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘুমাতে হবে।

কিন্তু স্ট্রিটলাইটের নীচে ওটা কে ছিল?

হুট করেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল আফ্রিতার। অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তার উপস্থিতির অনুভূতি।

খুবই কাছে যেন রয়েছে সেই সত্তা।

চোখ বুঝল আফ্রিতা।

ফ্রেজার ম্যানসন, আশেপাশের এলাকা।পুরো শহর, সবখানেই সেই উপস্থিতি!

***

কেস্টভিলের একমাত্র টিভি চ্যানেল 'কেস্টভিল টিভি'তে ড্যানির মৃত্যু সংবাদ যথেষ্ট রঙ-চঙ মিশিয়ে পরিবেশন করা হলো রাত বারোটার বিশেষ সংবাদে।

বিকৃত মস্তিষ্কের কোনো সিরিয়াল কিলারের আভাস পেয়ে যেন সংবাদপাঠিকা নিজেই উত্তেজিত হয়ে আছে।

"ছোট শহরের এই এক সমস্যা, এতোটাই বৈচিত্রহীন এদের জীবন যে কোনোকিছু পেলেই এরা কল্পনা করতে শুরু করে," বিরক্ত হয়ে বলে উঠল রববি।

"জুলিয়া? ড্যানি ছেলেটা তোমার ক্লাসের ছিল না?" বলে উঠলেন মিসেস. হাওয়ার্ড।

কোনো উত্তর দিল না জুলিয়া। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছে ও।

সবাই মিলে ড্রইংরুমে বসে বারোটার বিশেষ বুলেটিন দেখছে ওরা। প্রায় পনেরো মিনিটের একটা প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে ড্যানির হত্যাকাণ্ড নিয়ে। মিসেস. হাওয়ার্ডই ডেকে এনেছেন জুলিয়াকে।

"জুলিয়া? ও জুলিয়া," আবার বললেন তিনি।

জুলিয়া নিরুত্তর।

"মা বাগানের পিছে..." বলতে লাগল জেফ।

"ওসব ফালতু গল্প বাদ দাও জেফ," ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে মেয়ের হাত ধরে ঝাঁকালেন তিনি।

"হ্যাঁ মা।" হুট করেই যেন বাস্তবে ফিরল জুলিয়া।

"ড্যানি তোমার ক্লাসেই পড়ত না?"

"হ্যাঁ!"

"ইশশশ"

"আমি শুতে যাচ্ছি মা, সকালে স্কুল।"

"স্কুলে তো সম্ভবত কাল শোকসভা হবে তোমাদের। আচ্ছা যাও ঘুমাও গিয়ে।"

ঘরের দিকে আনমনে হাঁটছে জুলিয়া। মায়ের কোনো কথাই কানে ঢুকছে না ওর।

কারণ সোফাতে এসে বসার পরেই হুট করেই সব কিছু বদলে গেছিল। এই প্রথম না ঘুমিয়েই দৃশ্যটা দেখেছে সে। সেই বিরাট মূর্তি আর তার পায়ের কাছে, সেই অদ্ভুত প্রাণীটা ফিরে এসেছে!

চারটে আয়না ঘরের চারপাশে খাড়া করে দাঁড় করাল আফ্রিতা।

পুরো শহরের ওপর ঘনিয়ে আসা অতিপ্রাকৃত সত্তাটার মুখ তাকে দেখতেই হবে।

ঠিক তখন হুট করে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল। আচমকাই প্রভাবটা চলে গেল।

অবাক হয়ে গেল সে। এটা কী করে সম্ভব? একটু আগেই যেখানে ভয়াবহ এক অতিপ্রাকৃত শক্তির আভাব পাচ্ছিল, তা কয়েক মুহূর্তেই নেই হয়ে গেল?

কী হচ্ছে এই শহরে?

মনের অজান্তেই টিভিটা চালু করল সে। কেস্টভিল টিভি।

।। ৪ ।।

কেস্টভিল হাইস্কুলের পেছনের বিশাল মাঠটাতে শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক আর কিছু ছাত্র বক্তৃতা রাখল। ড্যানি কতটা ভালো ছেলে ছিল, সহপাঠীদের বিপদে কতটা এগিয়ে যেত, স্কুলের হয়ে কতগুলো ট্রফি এনেছিল সেসব স্মৃতিচারণ হলো। সবাই ড্যানির খুনির বিচার চাইল।

কিন্তু সত্যিকার অর্থে ড্যানির সবচেয়ে কাছের বন্ধু স্যামুয়েলকে কেউ ডাকল না।

দিনের শেষে এই অনুষ্ঠানগুলো শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। মঞ্চে উঠলেন শেরিফ মার্ক। তিনি সবাইকে আশ্বাস দিলেন যে খুব তাড়াতাড়ি ড্যানির মৃত্যু-রহস্য সমাধান করা হবে।

একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে স্যামুয়েলের ওপর নজর রাখছিল রববি। অনুষ্ঠান শেষেই ওকে পাকড়াও করে থানায় নেওয়া হবে। এমনটাই শেরিফের আদেশ।

কেস্টভিল টিভির রিপোর্টার একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে, না জানি কতটা রং চড়িয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে সে।

সবার শেষে মঞ্চে উঠল ড্যানির চাচা ডগলাস। যদিও বেশি কথা বলতে পারল না সে। দু-একটা লাইন বলেই ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলল।

জুলিয়া অবশ্য এসবের কিছু শুনতে পাচ্ছে না। গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি ওর। তিনবার ঘুম ভেঙেছে। প্রতিবারই সেই একই স্বপ্ন দেখে।

তবে হ্যাঁ, ওই অদ্ভুত প্রাণীটা মূর্তিটার পায়ের কাছে ফিরে এসেছে!

***

"হাই কেনসো," মৃদু হেসে কেনসোর দোকানে ঢুকল আফ্রিতা। এবার আমেরিকা আসার পর কেন যেন দোকানে আসা হচ্ছিল না। আসার ইচ্ছাও ছিল না। তবে আজ বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছে সে।

"আরেহ্ আফ্রিতা।" হাসল কেনসো, সত্তর বছর বয়সি মানুষ সে। ভ্রূ থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্যন্ত সব পেকে গেছে। যদিও শারীরিক দিক দিয়ে বেশ শক্ত-সামর্থ সে এখনও।

"আমি এসেছি জানতেন আপনি?"

"আরেহ্ জানব না? তুমি তো শহরের পরিচিত মুখ। বেশ কয়েকজন বলেছে তোমার কথা। তা এবার কদিনের জন্য?"

"দুসপ্তাহ থাকার ইচ্ছা। কিন্তু শহরে যা শুরু হল... যাই হোক এক প্যাকেট মার্শমেলো চকোলেট আর দুই প্যাকেট টক চকোলেট দিন।"

"আজকাল খুব চকোলেট খাচ্ছ!"

"আপনার দোকানের চকোলেট, খেতে তো হবেই।"

"এই নাও," তিনটে প্যাকেট আফ্রিতার দিকে এগিয়ে দিল কেনসো।

"আচ্ছা কেনসো, এই সময়ে শহরে কি নতুন কেউ এসেছে?"

"নতুন কেউ মানে?" ভ্রূ কুঁচকে গেল কেনসোর, "অনেকেই, এই যে ধরো অফিসার রববি, সে নতুন। তারপর ওই চার্চ রোডের।"

"না না। নতুন বলতে এই ধরুন ভারতীয় উপমহাদেশের কেউ।"

"নাহ্।" মাথা নাড়ল কেনসো, "এই বহুকাল ধরে ওই অঞ্চলের কেউ আসেনি। শুধু তুমি আর তোমার পরিবার ছাড়া।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"আরে হ্যাঁ!"

চকোলেটের দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল আফ্রিতা। কেনসো এলাকার পুরোনো লোকদের মধ্যে একজন। শহরের সব খবরই রাখে ও।

ও যখন বলছে তার মানে আসলেই কেউ আসেনি।

তাহলে ওই লোকটা কে ছিল?

ইচ্ছা করেই ড্যানির মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেনি সে। খোঁজ-খবর নিচ্ছে সে এই খবর যদি শহরে ছড়িয়ে পড়ে তবে অনেকেই মনে করতে পারে ড্যানির মৃত্যু অতিপ্রাকৃত ঘটনা।

***

"না স্যার, তেমন কিছুই পেলাম না। ড্যানির সঙ্গে তেমন কারোরই সমস্যা ছিল না, খুন করার মতো তো নয়ই," হতাশা ঝরে পড়ছে রববির কণ্ঠে।

"হুম, আর কিছু বলেছে স্যামুয়েল?" কফির কাপে একটা ছোট্ট চুমুক দিলেন শেরিফ।

"হ্যাঁ, কাল নাকি ও আসলে সিনেমা হলে গেছিল জুলিয়া নামের মেয়েটার পাশে বসার জন্য।"

"কিন্তু সে হলে ঢোকেনি! অদ্ভুত!"

"সেটাই।"

"প্রেম?"

"না স্যার, জুলিয়া তেমন পাত্তা দিত না ড্যানিকে।"

"জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজকেই, যদিও মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে।"

"স্যামুয়েলকে ছেড়ে দেব স্যার? ও বাড়ি যেতে চাচ্ছে। নিশ্চয়ই বেশ ভয় পেয়েছে।"

"হুম যেতে দাও। আমরাও বের হব।"

"জুলিয়ার বাড়িতে?"

"না তার আগে ডগলাসের ওখানে একটু যাওয়া দরকার। ড্যানির ঘরদোর দেখা দরকার। আর ডগলাসের ব্যাপারে ওর বউকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে।"

"এটার কি খুবই দরকার স্যার?"

"অবশ্যই।"

"স্যামুয়েল বলছিল স্টেফানি নামের একটা মেয়ে জুলিয়ার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী। স্কুলের সব খবরই নাকি সে রাখে।"

"তাহলে জুলিয়ার আগে ওর সঙ্গেই দেখা করব আমরা।"

"এখনই যাই চলুন?"

"নাহ, ডগলাস সবার আগে। তবে ওর বাড়িতে যাওয়ার আগে একটা জায়গায় একটু থামব।"

"কোথায়?"

"ফ্রেজার ম্যানসনে।"

"ওখানে কেন?"

"দরকার আছে।"

***

"জুলিয়া, আচ্ছা তোমার কি মন খারাপ?" জুলিয়ার ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারল জেফ।

ল্যাপটপে একটা সিনেমা দেখছিল জুলিয়া।

"না," হাসার চেষ্টা করল ও, "কেন এই কথা কেন?"

"কাল থেকেই দেখছি মন-মরা হয়ে আছ। তোমার ওই স্কুলের বন্ধুটা?"

"ও আমার তেমন ভালো বন্ধু ছিল না।"

জানালা দিয়ে পেছনের বাগানের দিকে তাকাল জেফ, ওখানে ডাফির জন্য একটা ছোট্ট ঘর আছে। মাঝে মাঝে ওখানে থাকে সে।

"আচ্ছা জুলিয়া, তুমি তো কুকুর নিয়ে অনেক কিছুই জানো, তাই না?"

"মোটামুটি।"

"আমাদের ডাফি বুলডগ, ওর মুখটা ভারী। আচ্ছা এমন কোনো কুকুর আছে কি, যার মুখটা একদম মানুষের মতো?"

চমকে উঠল জুলিয়া।

"মানুষের মতো বলতে?" নিজেকে সামলে নিল ও, "বুঝলাম না।"

"মানে শরীরটা কুকুরের, কিন্তু মাথাটা মানুষের!"

"এমন কুকুর হতে পারে না," প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে জুলিয়া।
"কিন্তু আমি না, গতকাল এমন একটা কুকুরকে দেখেছি।"
"ক... কোথায়?"
"আমাদের পেছনের উঠানে।"
"সত্যি?"
"হ্যাঁ! তোমাকে বলব ভাবলাম। কিন্তু মা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন! আরে কোথায় যাচ্ছ?"
ততক্ষণে উঠে গেছে জুলিয়া। ওর গন্তব্য ডাইনিংরুম।

***

Before I let you down again,
I just want to see you in your eyes.
I wouldn't have taken everything out on you,
I only thought you could understand.
They say every man goes blind in his heart,
And they say everybody steals somebody's heart away.
And I got nothing more to say about it Nothing more than you would me.
Send me your flowers of your december,
Send me your dreams of your candied wine.
I've got just one thing I can't give you... Just one more thing of mine.

চুপচাপ গানটা শুনছিল আফ্রিতা। সকাল থেকেই মেঘ করেছে। মনটাও ভালো নেই ওর। এসব দিনের সঙ্গে গানটা যায় ভালো।
বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল।
দরজা খুলে বেশ অবাক হল সে। স্বয়ং শেরিফ মার্ক দাঁড়িয়ে আছেন।
"আরে শেরিফ যে! কী সৌভাগ্য আমার!" করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।
"জাদুকরি, শহরে যে এলে, আমার সঙ্গে দেখা তো করলে না," কপট রাগ দেখালেন শেরিফ।
"কদিন মাত্র তো এলাম। তা ছাড়া আপনাদের যে ব্যস্ত সময় যাচ্ছে," হাসল আফ্রিতা। শেরিফ ওকে জাদুকরি বলে ডাকেন।
"যাই হোক, শোনো তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। পারলে এখনই মিউজিয়ামে চলে যাও। সোজা সাত নম্বর ঘরে যাবে এবং স্প্যানিশ নাবিক স্যান্ট্রো রামিরেজের আঁকা ছবিটা দেখবে। তারপর আমাকে ফোন দেবে," একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন শেরিফ।
"এখনই? আর একটু ঘুমাব ভাবছিলাম।"
"তোমার ফোনের অপেক্ষা করব," গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন শেরিফ।

"এমন কুকুর হতে পারে না," প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে জুলিয়া।

"কিন্তু আমি না, গতকাল এমন একটা কুকুরকে দেখেছি।"

"ক... কোথায়?"

"আমাদের পেছনের উঠানে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ! তোমাকে বলব ভাবলাম। কিন্তু মা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন! আরে কোথায় যাচ্ছ?"

ততক্ষণে উঠে গেছে জুলিয়া। ওর গন্তব্য ডাইনিংরুম।

***

Before I let you down again,
I just want to see you in your eyes.
I wouldn't have taken everything out on you,
I only thought you could understand.
They say every man goes blind in his heart,
And they say everybody steals somebody's heart away.
And I got nothing more to say about it Nothing more than you would me.
Send me your flowers of your december,
Send me your dreams of your candied wine.
I've got just one thing I can't give you... Just one more thing of mine.

চুপচাপ গানটা শুনছিল আফ্রিতা। সকাল থেকেই মেঘ করেছে। মনটাও ভালো নেই ওর। এসব দিনের সঙ্গে গানটা যায় ভালো।

বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল।

দরজা খুলে বেশ অবাক হল সে। স্বয়ং শেরিফ মার্ক দাঁড়িয়ে আছেন।

"আরে শেরিফ যে! কী সৌভাগ্য আমার!" করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

"জাদুকরি, শহরে যে এলে, আমার সঙ্গে দেখা তো করলে না," কপট রাগ দেখালেন শেরিফ।

"কদিন মাত্র তো এলাম। তা ছাড়া আপনাদের যে ব্যস্ত সময় যাচ্ছে," হাসল আফ্রিতা। শেরিফ ওকে জাদুকরি বলে ডাকেন।

"যাই হোক, শোনো তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। পারলে এখনই মিউজিয়ামে চলে যাও। সোজা সাত নম্বর ঘরে যাবে এবং স্প্যানিশ নাবিক স্যান্ট্রো রামিরেজের আঁকা ছবিটা দেখবে। তারপর আমাকে ফোন দেবে," একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন শেরিফ।

"এখনই? আর একটু ঘুমাব ভাবছিলাম।"

"তোমার ফোনের অপেক্ষা করব," গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন শেরিফ।

"প্রেম?"
"না স্যার, জুলিয়া তেমন পাত্তা দিত না ড্যানিকে।"
"জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজকেই, যদিও মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে।"
"স্যামুয়েলকে ছেড়ে দেব স্যার? ও বাড়ি যেতে চাচ্ছে। নিশ্চয়ই বেশ ভয় পেয়েছে।"
"হুম যেতে দাও। আমরাও বের হব।"
"জুলিয়ার বাড়িতে?"
"না তার আগে ডগলাসের ওখানে একটু যাওয়া দরকার। ড্যানির ঘরদোর দেখা দরকার। আর ডগলাসের ব্যাপারে ওর বউকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে।"
"এটার কি খুবই দরকার স্যার?"
"অবশ্যই।"
"স্যামুয়েল বলছিল স্টেফানি নামের একটা মেয়ে জুলিয়ার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী। স্কুলের সব খবরই নাকি সে রাখে।"
"তাহলে জুলিয়ার আগে ওর সঙ্গেই দেখা করব আমরা।"
"এখনই যাই চলুন?"
"নাহ, ডগলাস সবার আগে। তবে ওর বাড়িতে যাওয়ার আগে একটা জায়গায় একটু থামব।"
"কোথায়?"
"ফ্রেজার ম্যানসনে।"
"ওখানে কেন?"
"দরকার আছে।"

***

"জুলিয়া, আচ্ছা তোমার কি মন খারাপ?" জুলিয়ার ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারল জেফ।
ল্যাপটপে একটা সিনেমা দেখছিল জুলিয়া।
"না," হাসার চেষ্টা করল ও, "কেন এই কথা কেন?"
"কাল থেকেই দেখছি মন-মরা হয়ে আছ। তোমার ওই স্কুলের বন্ধুটা?"
"ও আমার তেমন ভালো বন্ধু ছিল না।"
জানালা দিয়ে পেছনের বাগানের দিকে তাকাল জেফ, ওখানে ডাফির জন্য একটা ছোট্ট ঘর আছে। মাঝে মাঝে ওখানে থাকে সে।
"আচ্ছা জুলিয়া, তুমি তো কুকুর নিয়ে অনেক কিছুই জানো, তাই না?"
"মোটামুটি।"
"আমাদের ডাফি বুলডগ, ওর মুখটা ভারী। আচ্ছা এমন কোনো কুকুর আছে কি, যার মুখটা একদম মানুষের মতো?"
চমকে উঠল জুলিয়া।
"মানুষের মতো বলতে?" নিজেকে সামলে নিল ও, "বুঝলাম না।"
"মানে শরীরটা কুকুরের, কিন্তু মাথাটা মানুষের!"

"এমন কুকুর হতে পারে না," প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে জুলিয়া।
"কিন্তু আমি না, গতকাল এমন একটা কুকুরকে দেখেছি।"
"ক... কোথায়?"
"আমাদের পেছনের উঠানে।"
"সত্যি?"
"হ্যাঁ! তোমাকে বলব ভাবলাম। কিন্তু মা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন! আরে কোথায় যাচ্ছ?"
ততক্ষণে উঠে গেছে জুলিয়া। ওর গন্তব্য ডাইনিংরুম।

***

Before I let you down again,
I just want to see you in your eyes.
I wouldn't have taken everything out on you,
I only thought you could understand.
They say every man goes blind in his heart,
And they say everybody steals somebody's heart away.
And I got nothing more to say about it Nothing more than you would me.
Send me your flowers of your december,
Send me your dreams of your candied wine.
I've got just one thing I can't give you... Just one more thing of mine.

চুপচাপ গানটা শুনছিল আফ্রিতা। সকাল থেকেই মেঘ করেছে। মনটাও ভালো নেই ওর। এসব দিনের সঙ্গে গানটা যায় ভালো।
বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল।
দরজা খুলে বেশ অবাক হল সে। স্বয়ং শেরিফ মার্ক দাঁড়িয়ে আছেন।
"আরে শেরিফ যে! কী সৌভাগ্য আমার!" করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।
"জাদুকরি, শহরে যে এলে, আমার সঙ্গে দেখা তো করলে না," কপট রাগ দেখালেন শেরিফ।
"কদিন মাত্র তো এলাম। তা ছাড়া আপনাদের যে ব্যস্ত সময় যাচ্ছে," হাসল আফ্রিতা। শেরিফ ওকে জাদুকরি বলে ডাকেন।
"যাই হোক, শোনো তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। পারলে এখনই মিউজিয়ামে চলে যাও। সোজা সাত নম্বর ঘরে যাবে এবং স্প্যানিশ নাবিক স্যান্ট্রো রামিরেজের আঁকা ছবিটা দেখবে। তারপর আমাকে ফোন দেবে," একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন শেরিফ।
"এখনই? আর একটু ঘুমাব ভাবছিলাম।"
"তোমার ফোনের অপেক্ষা করব," গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন শেরিফ।

"এটা আবার বলার কী আছে?" জুলিয়ার দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলেন ওর মা। অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন উনি।

"মা, আমি... আমি..."

"তুমিও দেখেছ নাকি ওই জিনিসটা?"

"হ্যাঁ, স্বপ্নে!"

"দেখো, এসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই আমার।"

"মা, যে জিনিসটা আমি স্বপ্নে দেখলাম সেটাই জেফ বাস্তবে দেখল। অদ্ভুত না ব্যাপারটা?"

"জেফ বানিয়ে বলেছে হয়তো!"

"জেফ মিথ্যা বলে না মা।"

"দেখো জুলিয়া," স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন মিসেস. হাওয়ার্ড, "তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর আমি একাই সব সামলেছি, শক্ত হাতে তোমাদের মানুষ করেছি। আমি চাই না কোনো এক উদ্ভট স্বপ্ন আর উদ্ভট কল্পনার কারণে তোমরা মাতামাতি করো। এসব শুনতে আমার ভালো লাগে না।"

"কিন্তু মা।"

"আমার কথা বুঝেছ?"

"হ্যাঁ মা," মাথা নাড়াল জুলিয়া।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মিসেস. হাওয়ার্ড।

***

"শোনো সংক্ষেপে তোমাকে বলছি, আজ থেকে ধরো দেড় বছর আগের কাহিনি। হুট করেই শহরের দুটো মেয়ে আত্মহত্যা করল। স্টেলা আর মিকো। বুঝলে?" গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন শেরিফ।

"হুম," ছোট্ট করে উত্তর দিল রববি। গাড়ি চালাচ্ছে সে।

"একজন একটা দোকানে কাজ করত আর একজন কেস্টভিল হাইস্কুলের ছাত্রী। প্রথমজনের আত্মহত্যার এক সপ্তাহ পরেই পরের জন আত্মহত্যা করে।"

"কীভাবে?"

"প্রথমজন সাততলা একটা বাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েছিল আর পরের জন নিজের শরীরে আগুন দিয়েছিল।"

"ভয়াবহ!"

"তা তো বটেই। দুটো আত্মহত্যা নিয়ে ঘাটলাম বেশ। কারণ তখন আর কোনো কেসই ছিল না হাতে। একটা অদ্ভুত মিল পেলাম। দুজনের বাড়ির লোকেরাই জানাল যে মৃত্যুর আগে অদ্ভুত আচরণ করত ওরা।"

"অদ্ভুত আচরণ বলতে?"

"এই ধরো হুট করে বাড়ি লোককে না চেনা, একা একা হাসা, গলার স্বর বদলে যাওয়া। 'এক্সরসিস্ট' সিনেমাটা দেখেছ না? অমন আচরণ করা অনেকটা!"

"বাপরে! সিনেমা?"

"হ্যাঁ, কয়েকটা দিন কেটে গেল। কেনসোর দোকানে একদিন কিছু চকোলেট কিনতে-গেছি। তুমি তো জানোই কেনসো কত খবর রাখে? ও আমাকে জানাল যে

ফ্রেজার ম্যানসনের সেই মেয়েটা নাকি তার পাশের বাড়ির মহিলাকে বলেছে যে এদের আত্মহত্যার জন্য দায়ী একটা ভূত। আর এই ভূত নাকি নিজের পরবর্তী শিকারও বেছে নিয়েছে।"

"স্যার আমরা কিন্তু ডগলাসের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখা করলাম ওর সঙ্গে। শহরে গুজব কেন ছড়াচ্ছে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। ও হাসতে হাসতে আমার লিলিয়ান নামে একটা মেয়ের কথা বলল। মেয়েটাকে চিনতাম আমি। পার্কের ওদিকে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকত, একটা কফিশপও ছিল। সে বলল ওই মেয়ের ওপর নাকি ভূতের নজর আর সেদিনই সে ভূতটাকে তাড়াবে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী, আমি লিলিয়ানের বাড়ি গেলাম। মানে এই মেয়ে যদি ওকে কোনোভাবে বিরক্ত করে তবে যেন আমাকে জানায় সেই কথা বলতে।"

"তারপর? আর পাঁচ মিনিট স্যার।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দরজার কলিং বেল টিপে বেশ অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি ধরো। কেউ খোলে না। খোলেই না। আমি করলাম কী জানো? কি হোল দিয়ে দিয়ে উঁকি মারলাম আর কী দেখলাম জানো?"

"ভেতরে লিলিয়ানের মৃতদেহ ঝুলছে?"

"আরে না, লিলিয়ান তো বেঁচে আছে। আমি দেখলাম কী লিলিয়ান দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছে আর আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।"

"তাই? খুব ভালো।"

"না ভালো নয়! সে চেয়ারে উলটা হয়ে বসেছিল আর ওর পুরো ঘাড়টা আমার দিকে ঘুরেছিল!"

"পুরাই সিনেমা!"

"আচ্ছা শোনো আমি তো দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। তারপর সন্ধ্যাবেলা এলাকার কয়েকজন বুড়োবুড়ি আর ওই জাদুকরির সঙ্গে আবার গেলাম ওই ফ্ল্যাটে।"

"আর মেয়েটা ভূতটাকে তাড়াল?"

"হ্যাঁ, অদ্ভুত সব প্রক্রিয়া ওর..."

"আমরা এসে গেছি স্যার," গাড়ি থামাল রববি।

"তুমি অনেক জোরে গাড়ি চালিয়েছ!"

"হুম। তাই হবে। যাই হোক, মেয়েটাকে দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছি। আমি জানতাম না এশিয়ান মেয়েরা এত লম্বা হতে পারে।"

"সে একজন জাদুকরি! তুমি গাড়ি থেকে নেমে ওর সঙ্গে কথা বললেও পারতে, ও বেশ মিশুক।"

"যদি আমাকে ব্যাং বানিয়ে দেয়? তাই ভয়ে নামিনি!"

"অফিসার আমি জানি তুমি আমার কাহিনি বিশ্বাস করছ না। যাই হোক লিলিয়ানকে মুক্ত করার পর ও আমাকে বলেছিল যে জ্যাকলিন স্ট্র্যাকার নামে উনিশ শতকের এক মহিলার প্রেত ওই ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী। আর বেশি কিছু বলেনি।"

"বেশ!"

"আর তারপর," ফিশফিশিয়ে উঠলেন শেরিফ, "আমি শহরের পুরোনো নথি ঘেঁটে দেখেছি। জ্যাকলিন স্ট্র্যাকার নামে একজন মহিলা আসলেই ছিলেন অষ্টদশ শতকে এই এলাকাতে! নর্তকী ছিলেন উনি!"

"বাহ, চলুন স্যার, ডগলাসের বাড়িটা দেখে আসি, আর কতক্ষণ বসে থাকব?"

"চলো, তোমাকে কাহিনিটা বলাই ঠিক হলো না," বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলেন শেরিফ।

***

কেস্টভিল মিউজিয়ামের সাত নম্বর ঘরটাতে একেবারেই কেউ নেই। আশেপাশের ঘরগুলোতে কয়েকজন আছে, তবে এই ঘরে বলতে গেলে কেউই আসে না।

কেন আসে না তা আফ্রিতা দেয়ালে ঝোলানো হাতে আঁকা ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছে।

একটা বিরাটাকৃতির কুকুর, কিন্তু মাথাটা আবার মানুষের, সেই মুখে ফুটে উঠেছে কুটিল হাসি।

"দরিন্দা," আপনমনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আফ্রিতার।

ছবিটার নীচের লেখাগুলো একটু-আধটু পড়ল সে। স্যান্ট্রো রামিরেজ নামক স্প্যানিশ এক নাবিক স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে বর্ণনা শুনে নাকি এই ছবি এঁকেছিল।

আশেপাশে ভালো করে তাকাল আফ্রিতা। নাহ্, কেউ নেই। এই ঘরে লোকে তেমন আসেই না, তাই এই ঘরের পাশে গার্ডরাও তেমন আসে না।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা ছবি তুলে নিল সে সব কিছুর। ছবি তোলা নিষেধ এখানে।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল আফ্রিতা। বাকি তথ্যগুলো ডিপওয়েবের কিছু ওয়েবসাইট থেকেই পাওয়া যাবে।

***

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

চিরকালই অসীম রহস্যের আধার ওই আকাশ। মানুষ মহাকাশে পৌঁছে গেছে, গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে আজ তাদের চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু তারপরেও, মহাবিশ্বের কিছু অন্ধকার রহস্য এখনও মানুষের কাছে ধরা দেয়নি।

আর ধরা দেয়নি বলেই মানুষেরা এখনও সুস্থ আছে। কারণ কোনো মানুষেরই ওসব সইবে না।

সে অনেক কিছুই জানে। সেজন্যই সে সবার মতো না।

সে মানুষ না।

কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে আফ্রিতার। যদিও কেস্টভিলের আবহাওয়া বর্তমানে তেমন একটা গরম না।

ডিপওয়েব থেকে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে সে।

কাগজে কিছু জিনিস প্রিন্টও করে রেখেছে।

শেরিফকে ফোন দিতে হবে বিকালে। কেস্টভিল শহর অনেক বড়ো বিপদে

আছে, ব্যাপারটা যে এতটা ভয়াবহ সেটা সম্ভবত সে নিজেও চিন্তা করেনি।

***

ডগলাসকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। ট্রাকে করে গমের চালান নিয়ে পাশের শহরে গেছে, ফিরতে সন্ধ্যা হবে, এমনটাই জানাল ওর স্ত্রী জ্যানেট।

রববির কেন যেন মনে হচ্ছে যে শেরিফ আসলে জ্যানেটকেই খুঁজছিলেন।

মধ্যবয়স্ক মহিলা জ্যানেট। মাথাভর্তি লাল চুল, চেহারায় কৃত্রিম এক কঠোরতা। দেখেই বোঝা যায় মাতাল স্বামীর ঘর করেও শক্ত হাতে সংসারটাকে আগলে রেখেছে মহিলা।

ড্যানির ঘর দেখতে চাইলেন শেরিফ। ড্যানির কথা উঠতেই চেহারাটা বিষণ্ণ হয়ে গেল জ্যানেটের। চুপচাপ ওদের দুজনকে ড্যানির ঘরে নিয়ে গেল সে।

ড্যানির ঘরে অদ্ভুত তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো, দেয়ালে বেশ কিছু বেসবল খেলোয়াড়ের ছবি লাগানো রয়েছে। সব কিছু দেখেও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

"ঘরটা তো বেশ সাজানো-গোছানো," হাসল রববি।

"আমি গুছিয়েছি আজ সকালে," ম্লান হাসি ফুটে উঠল জ্যানেটের মুখে, "ছেলেটার এইমাত্র কটা স্মৃতিই তো রয়ে গেল আমাদের কাছে।"

"অনেক ভালোবাসতেন ওকে তাই না?"

"হ্যাঁ, ওর মা-বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের কাছে ছিল। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কোনো সন্তানও নেই।"

"আচ্ছা, ওর কি কোনো খারাপ অভ্যাস ছিল?"

"হয়েছিল কিছু, তবে আমার ভয়ে বাড়ির ভেতরে ওসব করার সাহস পেত না। আমাকে বেশ ভয় পেত। আমি ডগলাসকে বলেছিলাম ওর স্কুলে একটু খোঁজ নিতে যে, ও কাদের সঙ্গে মেশে। কিন্তু ওর সময় হয়নি, আসলে ওকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমরা স্বচ্ছল নই তেমন, দেখুন না, আজই ওকে কাজে যেতে হল।"

"আমি দুঃখিত!"

"সমস্যা নেই!"

"আচ্ছা জ্যানেট," ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শেরিফ, "ডগলাসের কি কোনো মানসিক অসুখ আছে?"

"মানসিক অসুখ বলতে?"

"মানে উলটা-পালটা জিনিস দেখা?"

"ওহ... ওই মাথা মানুষের আর শরীর কুকুরের অদ্ভুত জন্তু?"

"আপনাকেও বলেছে?"

"হ্যাঁ, কাল রাতে যখন ও এসে আমাকে ড্যানির মৃত্যুর খবর দিল আমি তো কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। তারপরেও একটু পরেই নিজেকে সামলে নিলাম, কারণ ডগলাস প্রচুর ভেঙে পড়েছে। এখন আমি শক্ত না হলে... যাই হোক, তখনই ও আমাকে ওই কথাটা বলল। দেখুন ও মদ খায় প্রচুর...তবে হ্যাঁ, এমন কথা ও আগে বলেনি কখনও।"

"হুম, আমরা যাই তবে।"

"কফি?"
"পরে কোনোদিন।"
"ডগলাস আসলে কিছু বলতে হবে?"
"নাহ, দরকার নেই।"
গাড়িতে ওঠার পর বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না দুজন।
"আপনি জ্যানেটের সঙ্গে দেখা করার জন্যই গেছিলেন, তাই না?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রববি।
"হ্যাঁ, একটা জিনিস নিশ্চিত হলাম, সেদিনকার মতো কথা ডগলাস আগে কখনও বলেনি।"
"স্যার! আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ওই অদ্ভুত প্রাণীটাই খুন করেছে?"
"তা না, ডগলাস বহুদিন ধরেই মদ খায়। পাঁড় মাতালও হয়, কিন্তু উদ্ভট জিনিস দেখার কথা সে আগে বলেনি। ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে। যাই হোক, স্টেফানির বাড়ি যাচ্ছি আমরা নাকি?"
"ডা. এমিলির বাড়ি।"
"উনার বাড়ি আবার এখন কেন? উনার সঙ্গে পরে দেখা করব!"
"কিন্তু স্টেফানির সঙ্গে দেখা করতে হলে তো উনার বাড়িই যেতে হবে। কারণ স্টেফানি উনারই মেয়ে।"
"তুমি কখন জানলে?"
"সকালে, একটু-আধটু খোঁজ নিয়েই জানতে পারলাম।"
"হুম!"

***

Change my life just upon a whim
Jump into the ocean learn to swim Gone for summer, winter, all the seasons
I guess that might be the reason that
I'm a ghost I'm partially a ghost
I love you more than you know
That's why I'm a ghost A ghost

গানটা শুনতে শুনতে ব্যাপারটাতে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে আফ্রিতা। ঘরের চার দেয়ালে লাগানো রয়েছে চারটি আয়না।
ধীরে ধীরে আয়নাতে ফুটে উঠছে একটা অবয়ব।
হ্যারি।
এটাই শেষ সুযোগ। হ্যারির মুখ থেকে সব শোনার। এইবার বিফল হলে ওকে আর ডাকা যাবে।
"আআআ..." খুব জোরে চিৎকার করে উঠল হ্যারির প্রতিবিম্ব, যেন খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।
"কে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে হ্যারি?" জিজ্ঞাসা করল আফ্রিতা। হাঁফাচ্ছে ও,

গানটাও বন্ধ করে দিয়েছে।

"ও ও..."

"ও কে?"

"ও ও ও..."

কিক করে একটা শব্দ, হল তারপরেই মিলিয়ে গেল হ্যারির অবয়ব।

চলে গেছে হ্যারি। নাকি ওকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে!

ভ্রূ কুঁচকে গেল আফ্রিতার। আজকে হ্যারি একা এসেছিল, ওর সঙ্গে কেউ ছিল না। সেটা আফ্রিতা অনুভব করেছে।

ঐ অতিপ্রাকৃত শক্তিটা হ্যারির সঙ্গে নেই আজ, তাহলে এখন ওকে কে কষ্ট দিচ্ছে? কে ওকে এখান থেকে তাড়াল?

হঠাৎ করেই হাসি ফুটে উঠল আফ্রিতার মুখে। একটা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে সে।

***

"আপনারা?" দরজাটা খুলে একটু অবাকই হলেন ডা. এমিলি।

"আসলে আমরা..." আসল ব্যাপারটা খুলে বলতে যাচ্ছিল রববি, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন শেরিফ।

"আসলাম আর কী, কী অবস্থা? পুরো রিপোর্ট এসেছে?" হাসলেন শেরিফ।

"আমি ভাবিনি আপনারা বাড়িতে চলে আসবেন। হুম, পুরো রিপোর্ট সকালে পেয়েছি। কিছু ব্যাপার নিয়ে ডেনভারের একজনকে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছিলাম। সেটার উত্তরও একটু আগে পেলাম।"

"তো, তারপর?"

"খুব নৃশংস ভাবে মারা হয়েছে ড্যানিকে। প্রথমে দুটো পা ছিড়ে ফেলা হয়েছে, তারপর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।"

"ছিঁড়ে ফেলা?"

"হ্যাঁ, কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়নি কিন্তু, ছিঁড়েই ফেলা হয়েছে, টান মেরে আর কী। ওর শরীরে কোনো নখের আঁচর পাওয়া যায়নি। কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়াও যায়নি। কালই বলেছিলাম। রাত পৌনে নটার মধ্যেই মারা গেছে ড্যানি। মাথাটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তবে একটা ব্যাপার, হাত-পা গুলো ছিঁড়ে নেওয়ার প্রায় পাঁচ মিনিট পর মাথাটা ছেঁড়া হয়েছে।"

"মানে খুনি চেয়েছিল ড্যানি একটু কষ্ট পাক?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয় না কোন মানুষ এই কাজ করেছে।"

"কোনো পশু যে করেছে এমন কোনো চিহ্নও তো নেই!"

"হ্যাঁ, তাও নেই!"

"হুম, এই ছাড়া আর কোনো তথ্য?"

"আপাতত এই।"

"কিন্তু এত কিছু করার পরেও কেউ ওর চিৎকার শুনল না! হুম, আসলে আমরা এসেছিলাম আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সেই ফাঁকে আপনার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল," ফিক করে হাসলেন শেরিফ।

"স্টেফানিকে কাল রাতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও ড্যানিকে তেমন ভালো করে চেনে না। আমার মনে হয় না ওর কাছ থেকে তেমন কোনো তথ্য পাবেন আপনারা।"

"জুলিয়া নামে কাউকে চেনেন?"

"হ্যাঁ, স্টেফানির সবচেয়ে কাছের বান্ধবী, কেন?"

"ওই জুলিয়াকে পছন্দ করত ড্যানি, মূলত ওর সঙ্গে সিনেমা দেখবে বলেই ও হলে গেছিল!"

"অদ্ভুত, তাহলে জুলিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন!"

"তাও করা হবে, তার আগে স্টেফানিকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার।"

"হুম," একটু ইতস্তত করলেন ডা. এমিলি, "আচ্ছা, আমি ওকে ডেকে আনছি," বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন তিনি।

"বুঝলে রববি, বাপ-মায়েরা চিরকালই নিজের সন্তানকে পুলিশের সামনে আসতে দিতে ভয় পান," হাসলেন শেরিফ।

"পুলিশ এসে যদি মেয়ের বদলে মায়ের সঙ্গেই দশমিনিট সময় কাটায়, তবে তো ভয় পাবেই। না জানি মেয়েকে কতক্ষণ ধরে প্রশ্ন করবে!"

"তোমার খোঁচা দেওয়ার স্বভাবটা আর গেল না অফিসার।"

"আপনার কাছ থেকেই শিখেছি স্যার।"

***

"জুলিয়া, অ্যাই জুলিয়া, কোথায় হারালে," জেফের ডাকে হুঁশ ফিরল জুলিয়ার।

"অ্যাঁ.. আমি আসলে," নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে, "একটু মাথা ধরেছিল।"

"ধুর, সেই কখন থেকে ডাকছি, একটু রান্নাঘরে এসো।"

"আচ্ছা, তুমি যাও আমি আসছি।"

চলে গেল জেফ।

জুলিয়ার চোখের সামনে আবার সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠেছিল। সেই বিশাল মূর্তি, ওটার পায়ের কাছে সেই অদ্ভুত প্রাণীটা।

"আচ্ছা তুমি কি নিশ্চিত যে জুলিয়ার সঙ্গে ড্যানির কোনো সম্পর্ক ছিল না?" প্রশ্ন করল রববি।

"হ্যাঁ, জুলিয়া আর আমি স্কুলে বলতে গেলে সবসময় একসঙ্গেই থাকি। ড্যানি ওকে পছন্দ করতো, এটুকুই।"

"তুমি নিশ্চিত? আজকাল তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অনেক কিছু হয়। তারপরেও মানুষ সম্পর্কগুলোকে সত্যিকার জীবনে লুকিয়ে রাখে।"

"আমার মনে হয় না এমন কিছু ছিল। আপনারা কি ড্যানির মৃত্যুর জন্য জুলিয়াকে সন্দেহ করছেন?"

"আমরা কাউকেই সন্দেহ করছি না, আবার সবাইকেই সন্দেহ করছি।"

"আচ্ছা, জুলিয়ার আচার-আচরণে," বলে উঠলেন শেরিফ, "কোনো পরিবর্তন দেখেছ? মানে সাম্প্রতিক সময়ে?"

“কীহ...” একটু যেন চমকে উঠল স্টেফানি, “না না, কী পরিবর্তন হবে?”

“হুম, আচ্ছা, জুলিয়ার কি আর কোনো কাছের বন্ধু অথবা বান্ধবী আছে?”

“নাহ, জুলিয়া তেমন মিশুক মেয়ে নয়। আমি ছাড়া সবার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ওই একটা-দুটো কথাতেই সীমাবদ্ধ।”

“হুম, স্যামুয়েলও তাই বলেছে, আচ্ছা তুমি যেতে পারো।”

নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল স্টেফানি।

তখনই শেরিফের ফোনটা বেজে উঠল।

“হ্যালো,” ফোনটা ধরলেন শেরিফ।

“শেরিফ মার্ক?” ওপাশ থেকে বলে উঠল একটা নারীকণ্ঠ।

“জাদুকরি নাকি?”

“হ্যাঁ.. আপনি কি ব্যস্ত?”

“তেমন না।”

“তবে দুপুরে একটু আসুন ফ্রেজার ম্যানসনে। যা বুঝলাম ব্যাপারটা খুব একটা সুবিধার না।”

“অতিরিক্ত ভয়াবহ?”

“তেমনই!”

“হুম, আচ্ছা।”

***

ফ্রেজার ম্যানসনের বসার ঘরটা অনেক বড়ো। ডানদিকের একটা সোফাতে পাশাপাশি বসে আছেন শেরিফ আর রববি। দুজনের হাতে দুটো কাগজ।

“তো আপনি বলতে চাচ্ছেন, এই অদ্ভুত মন্দিরটা তেরো হাজার বছর আগে কেস্টভিলে ছিল?” মুখ তুলে বলল রববি।

“হ্যাঁ,” মাথা নাড়ল আফ্রিতা।

“আর ওই অদ্ভুত প্রাণীটা ছিল ওই মন্দিরের প্রহরী?” বললেন শেরিফ।

“হ্যাঁ।”

শেরিফের হাতে যে ছবিটা রয়েছে তাতে মন্দিরের ত্রিমাত্রিক রূপটা দেখা যাচ্ছে। রববির হাতের কাগজটায় মন্দিরটা সামনে, পেছনে, ওপরে, ডানে, বামে কেমন দেখাত সেই কাগজ, অর্থোগ্রাফিক প্রোজেকশন।

“আচ্ছা শুনুন, এখন আমি অনেক কিছু বলব, আপনারা বিরক্ত হলেও মন দিয়ে শুনুন,” গলা খ্যাঁকারি দিল আফ্রিতা।

“অদ্ভুত আকৃতির একটা মন্দির, তেরো হাজার বছর আগে এইরকম জ্যামিতিক আকৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল? এখনই তো সম্ভব না! আপনি কি তবে বলতে চান যে ওই সময়ের মানুষ এখনকার মানুষের চাইতে স্থাপত্যবিদ্যায় বেশি এগিয়ে ছিল?” বলে উঠল রববি।

“আদিম ওই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই সম্ভব ছিল, যা এখন সম্ভব না। আবার এখন অনেক কিছুই সম্ভব যা তখন সম্ভব ছিল না। এটাই সময়ের নিয়ম। যাইহোক কথা শুরু করি তবে?”

“আমার এসবে বিশ্বাস নেই।”

"সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"আহা," বিরক্ত হলেন শেরিফ, "ওকে বলতে দাও তো রববি, জাদুকরি, তুমি বলো।"

"হুম, মিউজিয়াম থেকে স্যান্ট্রো রামিরেজের আঁকা ছবিটা লুকিয়ে আমি আমার ফোনের ক্যামেরাতে তুলে নেই। তারপর বাড়ি এসে ডিপ ওয়েবের একটা সাইটে এইসব নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি। ডিপওয়েবকে সবাই মানসিকভাবে অসুস্থ লোকেদের আবাস বললেও এখানে এমন কিছু সাইট আছে যেগুলো তথ্যে একদম পরিপূর্ণ, সারফেস ওয়েবে এসব আপনি পাবেনই না।

"যাই হোক হ্যাঁ, আজ থেকে পনেরো হাজার বছর আগে কেস্টভিলে যারা বসবাস করত তাদের মন্দির ছিল ওটা। এখন একটা কথা, ওই বাসিন্দারা মানুষ ছিল কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ আছে।"

"মানুষ না? তবে কী? ভূত?" খ্যাক করে হেসে ফেলল রববি।

"এই মন্দিরটা কী করে নির্মাণ হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে ওই মন্দিরের পাহাড়াদার ছিল একটা দারিন্দা। দারিন্দা মানে অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জানোয়ার। গ্রিক কিংবদন্তির সেনটরদের কথা শুনেছেন না? অর্ধেক মানুষ অর্ধেক ঘোড়া? ঠিক তেমনই। এরা সাধারণত মানুষের জগতে বাস করে না। এই দারিন্দাকেই সম্ভবত পরবর্তীতে মিকুন্ডা বলে ডাকা হত। স্যান্ট্রো রামিরেজ এরই গল্প শুনেছিল।

"প্রতিমাসে একবার করে নিজেদের মধ্যে একজনকে এই মন্দিরে উৎসর্গ করত এখানকার বাসিন্দারা। উৎসর্গের নিয়মটাও ছিল অদ্ভুত। যাকে উৎসর্গ করা হত তাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হত আর সেই দারিন্দাটা এসে তার হাত, পা আর মাথা ছিঁড়ে ফেলত। ঠিক যেভাবে ড্যানিকে মারা হয়েছে!"

"হে ঈশ্বর!" বলে উঠলেন শেরিফ।

"হুম, মন্দিরের যে দেবতার উদ্দেশে এই বলি দেওয়া হত তাঁর নাম জানা যায়নি। সম্ভবত এখানকার বাসিন্দারাই শুধু তাঁর পূজা কর।"

"আচ্ছা, মন্দিরটার কী হয়েছিল?" জিজ্ঞাসা করলেন শেরিফ।

"সেটাও ঠিকঠাক জানা যায়নি। তবে যতটুকু জেনেছি এখানকার আদিম বাসিন্দারা আর মন্দিরটা হুট করেই গায়েব হয়ে গেছিল। মানে একদিন সকালে উঠে আপনি দেখলেন আপনার বাড়ির পাশের বাড়িটা নেই! ঠিক তেমনই। এইতো, এইটুকুই। ডিপওয়েবের তথ্যগুলো ঠিক এমনই হয়, সূত্রও গোপন রাখা হয়।"

"তাহলে বলতে চাচ্ছেন ওই দানবটা আবার ফিরে এসেছে?" হেসে ফেলল রববি।

"আসলেই এমনটা হয়েছে," ওর চোখ চোখে রাখল আফ্রিতা, "আমি আগেই এটা অনুভব করেছিলাম। হ্যারি বলে একটা ছেলে কদিন আগে মারা গেছে না শেরিফ?"

"হ্যাঁ, হ্যারি... ওই মিসেস. জেনিংসের ছেলে।"

"সাধারণত অন্য প্রেতদের মতো মানুষের শরীরের ওপর ভর করে না দারিন্দারা। এরা অন্য জগৎ থেকে মানুষের জগতে আসার জন্য কোনো অপঘাতে মারা যাওয়া মানুষের আত্মার ওপর ভর করে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে হ্যারির আত্মাকে দখল করেছে এই দারিন্দা।"

"এখন আমরা কী করতে পারি?"

"শুধু আত্মাকে দখল করলেই এদের হয় না। এরা সাধারণত একটা পথের মাধ্যমে এই জগতে আসে। সেই পথটা হতে পারে কোনো মানুষ, কোনো প্রাণী কিংবা কোনো জিনিস। সেই পথটাকে শনাক্ত করলেই এদের শেষ করা যায়। তবে..."

"কী?"

"এটা খুবই কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। কারণ যদি সেই পথ নিজে থেকে আমার সামনে না আসে তবে আমি তাকে চিনতে পারব না।"

"জাদুর মাধ্যমে।"

"কোনো জাদু দিয়েই ওটাকে খুঁজে বের করা যায় না!"

"ঈশ্বর!"

"ভালোই লাগল গল্পটা," মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে রববির।

"এখন আমরা কী করতে পারি?" বললেন শেরিফ।

"আপাতত কিছু করার নেই," হাসল আফ্রিতা, "দেখা যাক দারিন্দাটার ইচ্ছা কী, কিংবা কোথায় গিয়ে থামে সে।"

"মানে কী? ড্যানির মতো ঘটনা আরো হবে?"

"হ্যাঁ হবে। যেকোনো রাতে... ক'বার হবে জানি না, তবে হবে।"

"দিনে?"

"নাহ, দিনে দারিন্দারা কিছু করতে পারে না। আচ্ছা শেরিফ, একটা কথা বলতাম।"

"হুম?"

"শহরে কি নতুন কোনো লোক এসেছে? মানে এমন কেউ যাকে আপনি আগে দেখেননি!"

"নাহ, এমন কেউ আসেনি। কেন?"

"নাহ এমনিই," চিন্তার রেখা ফুটে উঠল আফ্রিতার কপালে, "ওহ হ্যাঁ, শুনুন, সেই স্প্যানিশ সৈনিক স্যান্ট্রো রামিরেজের শেষ জীবন সম্পর্কেও কিছু তথ্য পেয়েছি। তথ্যগুলো অদ্ভুত।"

"কেমন অদ্ভুত?"

"এখানে আসার ছয়মাস পরেই পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছিলেন তিনি। সারাদিন নিজের ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকতেন আর আবোল-তাবোল বকতেন। একটা সময়ে উনাকে একটা জাহাজে করে স্পেনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু..."

"কী?"

"সেই জাহাজের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। মানে ওটা কোনো দিনই আর স্পেনে পৌঁছোয়নি। কেউ জানে না ওটার কী হয়েছিল।"

"ডুবে গেছিল?"

"হতেই পারে।"

শেরিফের বাড়ির বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে রববি। ওকে বসিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আগে ভেতরে গেছেন শেরিফ।

মানুষের জন্য অপেক্ষা করার ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর লাগে ওর। মোবাইলে সময় দেখল ও, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মতো বাজে।

স্ত্রীর সঙ্গে দুবছর আগে বিবাববিচ্ছেদ হয়ে গেছে শেরিফের। দুই ছেলেকে নিয়ে এখন ডেনভারেই থাকেন ভদ্রমহিলা। শেরিফ তাই একাই থাকেন বাড়িতে। মাঝে মাঝে উনার ছেলেরা দেখা করতে আসে।

ওদিকে রববিও বলতে গেলে নিঃসঙ্গ, বিয়ে-থা করেনি। বর্তমানে কোনো বান্ধবীও নেই, এই মরা শহর ছাড়ার আগে আর কোনো সম্পর্কের সম্ভাবনাও নেই।

জুলিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তেমন নতুন কিছুই পাওয়া যায়নি। স্টেফানি যা বলেছিল তেমনই কথাবার্তা সব। ও সেদিন হলে ড্যানিকে দেখেনি। কেমন যেন গম্ভীর মেয়েটা, কথার উত্তরগুলোও কেমন যেন কাটা কাটা।

মোটেই বন্ধুত্বসুলভ নয় ওর আচরণ।

আর ফ্রেজার ম্যানসনের ওই বাংলাদেশি মেয়েটা! কীসব আজগুবি কাহিনি শোনাল। অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখেছিল সে। শেরিফের মুখভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন উনি অনেকটা বিশ্বাসও করেছেন।

অবশেষে দুটো স্যান্ডউইচ নিয়ে ফিরলেন শেরিফ।

"বুঝলে ইয়ংম্যান, আমি কিন্তু অনেক ভালো স্যান্ডউইচ বানাই," একটা স্যান্ডউইচ রববির দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

"উমম," স্যান্ডউইচে একটা জলহস্তি কামড় বসাল রববি, "ততটাও ভালো না স্যার, তবে চলে।"

"যে বড়ো কামড় মারলে, বোঝাই যায় তোমার ভালো লেগেছে।"

"ঠিক তা নয় স্যার, ক্ষুধা লেগেছিল তো, তাই।"

"হুম, আমরা তো অন্ধকারে পড়ে গেলাম, তাই না?"

"সেটাই স্যার,জুলিয়ার কাছ থেকেও তেমন কোনো তথ্য পেলাম না।"

"সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। একটা মানুষের শরীরের অঙ্গগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাঁচ টুকরো করল, সেই মানুষের চিৎকার কেউ শুনতে পেল না? আবার দেখো, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। আবার ওর শরীরে কোনো আঁচর-কামড়েরও চিহ্ন নেই। মানে কোনো জানোয়ার যে করেছে সেটাও না সম্ভবত, তাহলে? মানুষের পক্ষে কি এইভাবে ছেড়া সম্ভব?"

"হয়তো একাধিক লোক ছিল!"

"কিন্তু চিৎকার না শুনতে পাওয়ার ব্যাপারটা?"

"হয়তো ওর মুখটা চেপে রেখেছিল! হয়তো অন্য কোথাও থেকে ওকে মেরে তারপর এখানে এনেছিল!"

"ড্যানি খুবই বলশালী একটা ছেলে। ওর মুখ চেপে এইভাবে হত্যা করতে কমপক্ষে পাঁচ-সাতজন লোকের দরকার হবে। আর একটা ব্যাপার, যে ওর হাত পা ছিঁড়েছে তাকেও খুবই শক্তিশালী হতে হবে। আর এড কিন্তু বলেছে ও ড্যানিকে গলিতে ঢুকতে দেখেছিল! উমম..নাহ, কিছু একটা মিলছে না।"

"তাহলে হয়তো স্যার ফ্রেজার ম্যানসনের মেয়েটার কথাই ঠিক?"

"উম?"

"মানে আপনি তো এটাই বলতেন, হিহি," পুরো স্যান্ডউইচটা খেয়ে একটা ঢেঁকুর তুলল রববি।

"তোমাকে বোঝাতে পারব না," হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন শেরিফ।"

***

দরজা খুলে আফ্রিতা দেখল মিসেস. জেনিংস দাঁড়িয়ে আছেন। উনার হাতে একটা ছোট্ট ট্রে, তার ওপর একটা থালাতে কী যেন ঢেকে রাখা আছে।

"আরে আন্টি, এই সময়ে," অবাক হলো আফ্রিতা।

"একটা কেক এনেছিলাম তোমার জন্য, হ্যারি অনেক পছন্দ করত আমার হাতের কেক, ও তো আর নেই। তাই তুমিও তো আমার মেয়েরই মতো।" আবেগ ঝরে পড়ছে মিসেস. জেনিংসের কণ্ঠে।

"আরে আসুন আসুন, একসঙ্গে খাই।"

"নাহ, তুমি নাও, আমাকে বাড়ি যেতে হবে," আফ্রিতার হাতে ট্রেটা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মহিলা।

টেবিলের ওপর ট্রে-টা রেখে ঢাকনা তুলল আফ্রিতা। বেশ সুন্দর একটা চকলেট কেক।

হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। চকোলেট কেক খুবই প্রিয় ওর।

***

"কীই বা বলব শেরিফকে? আর ড্যানির মৃত্যুর ব্যাপারে তো কিছুই জানি না আমি," বলল জুলিয়া।

"সেটাই, আমাদের কেন যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে," ফোনের অপর পাশ থেকে বলল স্টেফানি।

"ওই ব্যাটা স্যামুয়েলের কারণে, ও বলেছে আমাকে ড্যানি পছন্দ করত আমার জন্যই সিনেমা হলে গেছিল। আর তুমি আমার কাছের বান্ধবী!"

"বলল আর শেরিফও আমাদের সন্দেহ করলেন?"

"অদ্ভুত! আচ্ছা স্টেফানি, তুমি তো শেরিফকে ওই ব্যাপারে কিছু বলোনি, তাই না?"

"কোন ব্যাপারে?"

"ওই যে আমার অদ্ভুত স্বপ্ন।"

"আরে ধুর, এইসব স্বপ্ন নিয়ে পুলিশের সামনে কেন কথা তুলবো আমি? আর তুমিই কেন ভাবলে আমি এমন অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলব?"

"সেটাই, এমনিই জিজ্ঞাসা করলাম," ভেতরে ভেতরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জুলিয়া।

"তুমি আজও স্বপ্নটা দেখেছ, তাই না?"

"হ্যাঁ, আজকেও মূর্তিটার পায়ের কাছে ওই অদ্ভুত জানোয়ারটা ছিল।"

"যেদিন ড্যানি মারা গেছে সেদিনই শুধু ছিল না, তাই না?"

"হ্যাঁ, অদ্ভুত না ব্যাপারটা?"

"স্বপ্ন তো স্বপ্নই। তুমি কী ভাবছ, তোমার স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এসে ড্যানিকে মেরেছে ওটা?"

"তাও কথা, পাগলামি সব চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসছে।"

সেদিন আর কিছু হল না।

পরের দিনও কিছু হল না। রববি তো ধরেই নিল যে আর কিছুই হবে না।

সেদিনও স্বপ্নে ওই জন্তুটাকে মূর্তিটার পায়ের কাছেই দেখতে পেয়েছিল জুলিয়া।

।। ৫ ।।

সকাল থেকেই মনটা ভালো নেই জুলিয়ার। গতরাতে ওর স্বপ্নে আবার সেই অদ্ভুত প্রাণীটা মূর্তিটার পায়ের কাছে ছিল না। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে ওর।

আবার কি কিছু খারাপ হতে যাচ্ছে?

মাকে কিছু বলার সাহস নেই ওর। সকালে উঠে উঠেই জেফকে আকারে-ইঙ্গিতে ড্যানির মৃত্যুর দিন পেছনের উঠানে দেখা প্রাণীটা দেখতে কেমন ছিল সেই প্রশ্ন করেছে।

কোনো ভুল নেই, জেফের দেখা প্রাণীটা আর স্বপ্নের প্রাণীটা একদমই এক।

ফেসবুকে স্টেফানিকেও মেসেজ দিয়েছে ও, পাত্তা দেয়নি।

স্টেফানি জানিয়েছে যে ওর মা বলেছে ড্যানির মৃত্যুর এখন পর্যন্ত কোনো সূত্র খুঁজে পাননি শেরিফ।

পুরোটা দিন এখানে-সেখানে ঘুরে কাটাল আফ্রিতা।

পার্কে গেল, কফি শপে কফি খেল, কেনসোর দোকান থেকে চকোলেট কিনল, সিনেমাহলের দুপুরের শো দেখল।

কেমন যেন অস্থির লাগছে ওর। মনে হচ্ছে খারাপ কিছু একটা ঘটবে।

কিন্তু অতিপ্রাকৃত কিছু অস্তিত্বও টের পাচ্ছে না সে। ব্যাপারটা খুব একটা অদ্ভুত না, কারণ দারিন্দাদের উপস্থিতি তখনই টের পাওয়া যায় যখন তারা মানুষের জগতে উপস্থিত হয়ে কারও ক্ষতি করার প্রচেষ্টা শুরু করে, তার আগে নয়।

***

"এত রাতে এখানে কেন এলাম আমরা স্যার?" ভীষণ বিরক্ত রববি।

"শোনো, ওই অদ্ভুত প্রাণীটাকে ডগলাস এখানেই প্রথম দেখেছিল। এই জায়গাটা একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার আমাদের, কী বলো?" হাসলেন শেরিফ।

"তাই বলে রাত নটার দিকে এখানে আসতে হবে?"

"আর কোনো কাজও তো নেই আমাদের হাতে!"

"হুম।"

রববির ফোনটা বেজে উঠল। ওর মা ফোন দিয়েছেন। নিউইয়র্কে থাকেন উনি, সপ্তাহে একবার করে ফোন দেন, আর এক ঘণ্টার আগে ফোন ছাড়েন না।

"আমার মা ফোন করেছেন, আমি একটু ওপাশের বেঞ্চটাতে গেলাম স্যার, হুম?"

"আচ্ছা যাও, তবে বেশি দূরে যেও না।"

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে গাছের আড়ালের বেঞ্চটার কাছে গিয়ে বসল রববি। ততক্ষণে ওর মায়ের দুবার ফোন দেওয়া হয়ে গেছে।

মায়ের নাম্বারে ডায়াল করল সে। কখনোই মায়ের ফোন ধরে না সে, কেটে গেলে তারপর আবার ফোন দেয়।

"হ্যালো মা?" বলে উঠল রববি।

ঠিক তখনই কুকুরের কান্নার মতো শব্দ শুনতে পেল সে। গুরত্ব না দিয়ে কথা বলতে লাগল রববি।

***

পাথরের মতো জমে গেছেন শেরিফ মার্ক।

কুকুরের ডাকটা এসেছিল ঠিক পাশের গাছটা থেকে আর ওটার ওপরে তাকিয়েই উনি দেখতে পেলেন সেই অদ্ভুত জন্তুটাকে।

শরীরটা বিরাট এক কুকুরের আর মাথাটা মানুষের। শেরিফের দিকে তাকিয়ে হাসছে ওটা। মুখটায় ফুটে উঠেছে একটা তীব্র নিষ্ঠুরতা। যেন প্রাচীন যুগের কোনো নিষ্ঠুর গুহামানবের মাথা কেটে ওই কুকুরের শরীরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ততক্ষণে কোমরের পিস্তলটাতে হাত চলে গেছে শেরিফের। কিন্তু তার আগেই উনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দানবটা।

মাটিতে পড়ে গেলেন শেরিফ। নিজের একটা থাবা শেরিফের মুখের ওপর রাখল ওটা। থাবাগুলো একদম মানুষের হাতের মতো!

কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড আক্রোশে শেরিফের দুটো হাত ছিঁড়ে ফেলল সে।

পকেটের মধ্যে বেজে উঠল শেরিফের ফোনটা। ক্রমাগত বেজেই চলেছে ওটা। ফোন ধরবেন কী করে উনি? উনার হাত দুটোই তো আর নেই!

তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেন শেরিফ। কিন্তু এ কী! কোনো চিৎকার বের হচ্ছে না উনার মুখ থেকে! উনার কথা বলার শক্তি চলে গেছে।

উনার বুকের উপর দাঁড়িয়ে বীভৎসভাবে হেসে চলেছে জানোয়ারটা। খুব সুন্দর করে ছিঁড়ে ফেলা হাতদুটো পাশে রেখে দিল সে।

তারপর এগিয়ে গেল শেরিফের পায়ের দিকে।

ও দুটো ছিঁড়ে ফেলার পরেও মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটাও করতে পারলেন না শেরিফ।

তীব্র ব্যথাতে উনার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। উনি জানেন বাঁচার আর কোনো উপায় নেই উনার।

পা দুটোকে হাত দুটো পাশে রেখে শেরিফের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সেই অতিপ্রাকৃত দানব। কী যেন নাম ওটা? সেই জাদুকরি বলেছিল? দারিন্দা!

এজন্যই ড্যানির চিৎকার কেউ শুনেছিল না। ওই দানবের থাবা মুখে পড়লে মানুষের কথা বলার শক্তি চলে যায়!

ধীরে ধীরে সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে শেরিফের চোখের সামনে, প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে উনার।

এই তীব্র যন্ত্রণার চাইতে মৃত্যুই ভালো। তারিয়ে তারিয়ে সেই যন্ত্রণা উপভোগ

করছে শয়তানটা। শেরিফ জানেন, বেশ কিছুটা যন্ত্রনা পাওয়ার পরেই উনাকে মারবে শয়তানটা, তার আগে নয়!

'ঢাঁই ঢাঁই,' গুলির শব্দ পেলেন শেরিফ। শব্দটা এসেছে দানবটার পেছন থেকে।

ঝাপসা হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতেও শেরিফ দেখলেন রববিকে। রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। আরও কয়েকটা গুলি ছুড়ল সে দানবটার দিকে।

কিন্তু কিছুই হল না ওর।

এক লাফে আবার শেরিফের বুকের ওপর উঠে বসল সে, তারপর ছিঁড়ে নিল উনার মাথাটা!

মৃত্যুর একদম আগের মুহূর্তে শেরিফের একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল, "জাদুকরি কি পারবে এই নরক থেকে উঠে আসা শয়তানটাকে শেষ করতে?"

তখনই উনার পকেটের মধ্যেকার ফোনটা আবার বেজে উঠল।

***

অস্থির হয়ে উঠেছে আফ্রিতা। সেই দানবীয় প্রাণীটার অস্তিত্ব আবার টের পেতে শুরু করেছে সে। তার মানে আবার শহরের বুকে নেমে এসেছে সে।

দুবার ফোন করেছে সে শেরিফকে।

কিন্তু ফোন ধরেননি উনি!

কী করবে এখন ও? বাইরে যাবে? কিন্তু আপাতত তো ওই শয়তানকে মোকাবিলা করার কোনো উপায় নেই!

***

রববির চোখের সামনেই এক লাফে গাছে উঠে গেল দানবটা। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে একটা পৈশাচিক হাসি দিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

এখনও সব কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না রববির!

সত্যিই ওই প্রাণীটা আছে, ওটা হত্যা করেছে শেরিফকে! শেরিফের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ ওর চোখের সামনে পড়ে রয়েছে।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেল সে।

শেরিফের মোবাইলটা বেজে উঠল। ওই দানবটা যখন উনার মাথা ছিড়ে নিচ্ছিল তখন পকেট থেকে ছিটকে গিয়ে বেশ দূরে পড়েছিল ওটা।

কাঁপা-কাঁপা হাতে মোবাইলটা তুলল রববি।

পর্দাতে একটা নাম ভেসে উঠছে, 'জাদুকরি'।

কোনোমতে ফোনটা ধরল সে।

"হ্যালো।"

"হ্যালো, শেরিফ?"

"না, আমি রববি, আপনি কি আফ্রিতা?"

"হ্যা, শেরিফ কই? উনাকে একটু দিন!"

"শেরিফ আর এই পৃথিবীতে নেই! উনাকে মেরে ফেলেছে।"

"কীহ! কে?"

"ওই দানবটা, আমি দেখেছি ওটা।" আর কিছু বলতে পারল রববি, গা গুলিয়ে বমি চলে এল ওর।

***

শেরিফের পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও ড্যানির মতোই ফলাফল এল। কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই, নেই কোনো আচর-কামড়ের দাগ।

রববি অবশ্য কাউকেই বলল না যে সে ওই দানবটাকে দেখেছে। শুধু শুধু আতঙ্ক ছড়ানোর ইচ্ছা নেই ওর।

দুইদিন পর শেরিফের শেষকৃত্য হয়ে গেল। উনার এক ছেলেও এসেছিল।

শোকসভাতে প্রায় পুরো কেস্টভিল শহরই উপস্থিত ছিল। শেরিফ অনেক পুরোনো মানুষ। তাকে প্রায় সকলেই খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত। উনার মৃত্যুতে সবাইই খুব কষ্ট পেল।

কেস্টভিল টিভি আর খবরের কাগজগুলোতেও রং-চং মাখিয়ে প্রচার করা হল শেরিফের মৃত্যুসংবাদ। এমনকি ডেনভারের কিছু সংবাদপত্রেও এল শেরিফের মৃত্যুর খবর।

কে করল ওই দুজন মানুষকে খুন? অদ্ভুত এই দুটো মৃত্যুর পর কেস্টভিল শহরে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক।

নতুন শেরিফ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত শেরিফের দায়িত্ব রববির উপরেই এসে পড়ল।

রববি জানে তাকে শুধুমাত্র একজনই সাহায্য করতে পারে, সেই জাদুকরি!

।। ৬ ।।

শেরিফের মৃত্যুর চারদিন পর।

কেবল খুলেছে কেস্টভিল হাইস্কুল। পর পর দুটো ভয়ানক মৃত্যুর ধাক্কা সামলে এখনও উঠতে পারেনি শহরটা। সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট বলতে গেলে ফাঁকাই হয়ে যায়। কেউ মনে করছে কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের সিরিয়াল কিলার এসেছে তাদের শহরে আবার কারও মতে এটা কোনো প্রেতের ছায়া। কাজ না থাকলে বিকালের আগেই সবাই ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

পুলিশ এখনও কিছুই বের করতে পারেনি। খুব শীঘ্রি নাকি ডেনভার পুলিশের একটা বিশেষ দল আসবে।

দুপুরের বিরতিতে ক্লাসের এক কোনাতে বসে আছে স্টেফানি আর জুলিয়া।

"তুমি নিশ্চিত জেফ অমন কিছুই দেখেছিল?" বলল স্টেফানি।

"জেফ মিথ্যা বলে না স্টেফ," কেমন যেন প্রাণহীন শোনাচ্ছে জুলিয়ার কণ্ঠ।

"তুমি আজকেও স্বপ্নটা দেখেছ, তাই না?"

"প্রতিদিন, গত কয়েকমাস ধরে প্রতিদিন। কখনও ঘুমের মধ্যে তো কখনও জাগ্রত অবস্থাতেই, আমার চোখের সামনে অসংখ্যবার ভেসে উঠেছে দৃশ্যটা।"

"কুকুরের মতো অদ্ভুত প্রাণীটা আর মূর্তিটা?"

"শুধু দুদিন কুকুরটা ছিল না। ড্যানি আর শেরিফের মৃত্যুর দিন।"

"তোমার কী মনে হয়, তোমার স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে খুন করেছে ওই প্রাণীটা?"

"হতেও তো পারে। পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। ফ্রেজার ম্যানসনের মেয়েটা।"

"ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

"হ্যাঁ, তাই তো চাচ্ছিলাম!"

"এশিয়ান, অশিক্ষিত!"

"ও নাকি দেড়বছর আগে তোমাদের শহরে একটা..."

"ওহ জুলিয়া! সাপ ধরা আর তুকতাক, এই ছাড়া এশিয়ানরা পারেটা কী? কী এক ভেলকি ও দেখিয়েছিল শহরের মানুষকে! তাই দেখেই সবাই কুপোকাত! আমি ওসবে বিশ্বাস করি না!"

"কিন্তু।"

"কোনো কিন্তু নয়, গেলে তুমি যাও, আমি কোনো এশিয়ানের কাছে সাহায্যের জন্য যাব না," উঠে দাঁড়াল স্টেফানি।

"স্টেফ।"

"আমি এসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না," গটগট করে ঘরের বাইরে চলে গেল স্টেফানি।

উদাস চোখে ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল জুলিয়া। কেউ ওর কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

তবে কি ও একাই ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? কিন্তু জাদুটোনা তো খারাপ! ওর যদি কিছু হয়ে যায়।

মাথাটা চেপে ধরল জুলিয়া! কী করবে ভেবে পাচ্ছে না ও।

***

"তো, মাননীয় নতুন শেরিফ সাহেব, কী ভাবছেন?" মোবাইল টিপতে টিপতে প্রশ্ন করল আফ্রিতা।

"কিছুই না। ডেনভার পুলিশের দল এই সপ্তাহের শেষের দিকে চলে আসবে। আর আমি তো ভারপ্রাপ্ত শেরিফ। নতুন শেরিফ নিয়োগ হতে অবশ্য দেরি আছে," হাসল রববি।

কেস্টভিল হাইস্কুলের পেছনের মাঠটাতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন, সন্ধ্যা প্রায় হতে চলেছে।

"আচ্ছা, সেদিন কি আপনি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন?" বলে উঠল রববি।

"হ্যাঁ, হুট করেই আমি অতিপ্রাকৃত সত্তাটার অস্তিত্ব বুঝতে পারছিলাম। তখনই শেরিফকে ফোন করলাম।"

"হুম আমি নিজের চোখে দেখেছি ওটাকে! আমার রিভলভারের গুলি যে ওর শরীর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। উফফফ।"

"হুম দারিন্দাদের এটাই সমস্যা, এরা হুট করেই মানুষের পৃথিবীতে এসেই আবার চলে যেতে পারে।"

"আচ্ছা এখানেই তো ওই মন্দিরটা ছিল, তাই না? যেটার পাহারাদার ছিল

ওই দানবটা?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে কোনোভাবেই ঠেকাতে পারবেন না?"

"ও কোন মাধ্যম ধরে এই পৃথিবীতে আসছে সেটা না বুঝতে পারলে কোনোভাবেই সম্ভব না।"

"আপনার কী মনে হয়? ওটা আরো মানুষকে মারবে?"

"সম্ভবত হ্যাঁ। এইসব করতেই ওটা এসেছে।"

"খুব হতাশ লাগছে, আমি জীবনে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিনি।"

"বাদ দিন।"

"হুম, কফি খাবেন?"

"সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়, কফির দোকান খোলা থাকবে? গোটা শহরই তো আতঙ্কে আছে।"

"পার্ক স্ট্রিটের সানলাইট কফি স্টোর সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে।"

"চলুন তবে।"

***

"এখানকার কফি বেশ ভালোই, কী বলেন?" নিজের কফির খালি কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল রববি।

"হুম, আপনার মতো অত তাড়াতাড়ি খেতে পারি না," ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে হাসল আফ্রিতা।

"আচ্ছা, আপনি এইসব জাদুটোনা ছোটো থেকেই করেন?"

"জাদুটোনা নয়। অতিপ্রাকৃত চর্চা বলতে পারেন। ছোটো থেকে নয়, কবছর হল।"

"অনেক আমেরিকানই মনে করে দক্ষিণ এশিয়ানরা শুধুই সাপুড়েগিরি আর কালো জাদু ছাড়া আর কিছুই পারে না!"

"অনেক দক্ষিণ এশিয়ানও মনে করে যে আমেরিকানরা মদ খাওয়া আর যৌনক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই পারে না! টিভিতে যা দেখায় তা বিশ্বাস করবেন না।"

"ভালোই বলেছেন। আচ্ছা, এই দানবটার সম্পর্কে কি কোনোভাবেই জানা যায় না? মানে জাদু কাজে লাগিয়ে?"

"নাহ, দারিন্দারা অদ্ভুত প্রকৃতির প্রাণী, এদের সম্পর্কে এইভাবে জানা সম্ভব না। এদেরকে পৃথিবীতে নিয়ে আসারও পদ্ধতি আছে আলাদা।"

"কেমন?"

"ধরুন প্রথমে একজন এদের আহ্বান করবে, তারপর ঠিক সময়মতো একটা মানুষের আত্মাকে এদের হাতে সমর্পণ করতে হয়, সাধারণত অন্য প্রেতরা মানুষের শরীরে ভর করে, কিন্তু এরা আবার ভর করে আত্মার ওপর। অপঘাতে মৃত্যু হওয়া মানুষদের আত্মা চায় দারিন্দা। আত্মা পাওয়ার আগ দিয়ে সে এই পৃথিবীতে আসার একটা রাস্তা তৈরি করতে থাকে।"

"কেমন রাস্তা?"

"ঠিক নেই। কখনও কোনো জিনিসের মাধ্যমে, কখনও কোনো প্রাণীর

মাধ্যমে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিছু মানুষের স্বপ্নকেও এরা পৃথিবীতে আসার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে সেই মানুষটা দারিন্দাকে স্বপ্নে দেখতে থাকে। মানে দারিন্দা পৃথিবীতে আসার রাস্তা বানাচ্ছে!"

"বাপরে!"

"তো আহ্বান যে করে সেই আত্মাটাকে সমর্পণ করে দারিন্দার হাতে। তারপর সেই আত্মাতে ভর করেই নিজের প্রস্তুত করে রাখা রাস্তা দিয়ে পৃথিবীতে আসে। দারিন্দাকে শেষ করার একটাই উপায় আর সেটা হল যে আত্মার ওপর সে ভর করে আছে তাকে ওর থেকে আলাদা করে ফেলা। তবে এর জন্য অবশ্যই সে যে রাস্তা দিয়ে এসেছে তা সম্পর্কে জানতে হবে! সম্ভবত কে ওকে আহ্বান করেছে আর কার আত্মার ওপর ভর করে ও পৃথিবীতে এসেছে তা আমি জানি।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, আপনাদের শহরের হ্যারি নামের একটা ছেলে মারা গেছিল না দুর্ঘটনাতে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতাম ওকে, ওর লাশ তো আমরাই উদ্ধার করেছিলাম। একদম চ্যাপ্টা হয়ে গেছিল মাথাটা।"

"ওই হ্যারির আত্মার ওপর ভর করেই আছে দারিন্দাটা।"

"আর ওকে কে ডেকেছে?"

"সেটা এখনই বলতে চাচ্ছি না!"

"কেন?"

"অফিসার রববি," টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কফিশপের মালিক, "আপনাদের হয়েছে কি? মানে সোয়া সাতটা বেজে গেছে তো?"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বিল দিয়ে যান!"

বিল আনতে চলে গেল লোকটা।

"দেখছেন তো, এরা কতটা ভয়ে আছে?" হাসল রববি, "সন্ধ্যার পর রাস্তাতে আজকাল মানুষই থাকছে না। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব?"

"নাহ, আমি একাই চলে যেতে পারব।"

বিল নিয়ে এল লোকটা। রববিই বিল দিল, আফ্রিতা দিতে চেয়েছিল, তবে ব্যাপারটা পাত্তা দিল না রববি।

রাস্তাতে নেমে এল ওরা।

"আচ্ছা আফ্রিতা, জ্যাকলিন স্ট্র্যাকারের প্রেতকে আপনি কী করে শনাক্ত করেছিলেন?" বলল রববি।

"ওহ," হাসল আফ্রিতা, "ও একটা মামুলি প্রেতাত্মা, ওকে অনুভব করা খুবই সহজ। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানেন?"

"কী?"

"ওকেও কেউ আহ্বান করেই এনেছিল, যেটা আমি এখনও বের করতে পারিনি!"

"তাই!"

"হ্যাঁ, আমি ব্যাপারটা বুঝেছিলাম ওকে শেষ করে দেওয়ার পর, তখন আর সেটা জানা সম্ভব না। তবে এখন একটা সন্দেহ করছি।"

"ওকে যে ডেকেছিল এই দানবটাকেও সেই ডেকেছে?"

"হ্যাঁ! কী করে বুঝলেন? আর একটা ব্যাপার জানেন? দারিন্দারা না সব সময় মানুষের পরিপূর্ণ এলাকায় আসতে পছন্দ করে, কারণ এই ধরনের দারিন্দারের একটা প্রিয় শখ হল মানুষ শিকার।"

"বোঝাই যায়। হুম, তাহলে কেস্টভিলের মতো একটা নির্জন শহরে কেন এল ওটা? "

"সেটাই ভাবছি, তবে নির্জন শহরে এরা এলে এমন কিছু করে যার ফলে অনেক মানুষ এখানে আসতে বাধ্য হয়, বাইরে থেকে।" হুট করেই যেন চমকে উঠল আফ্রিতা, "আচ্ছা, ডেনভার পুলিশের লোকেরা আসছে না?"

"হ্যাঁ!"

"মানে এরপর সাংবাদিকরাও আসবে, ইতোমধ্যেই কেস্টভিলের দুটো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে গেছে, তাই অনেক মানুষই এই শহর দেখতে আসবে। যেহেতু শহরের একটা বড়ো অংশের মানুষের বিশ্বাস যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটছে আর জ্যাকলিন স্ট্রকারের ঘটনা তো আছেই। সবমিলিয়ে অনেক অতিপ্রাকৃত গবেষকও আসবে,বুঝতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ.. কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কেস্টভিল মানুষে ভরে যাবে!"

"এই তাহলে ও চায়!"

"হে ঈশ্বর! তাহলে ও-ই নরকের পিশাচ! জানেন আমরা একটা বিষয় নিয়ে খুব চিন্তাতে ছিলাম, সিনেমা হলের পিছে যে ড্যানিকে মারল, অত ভয়াবহ উপায়ে, তারপরেও ওর চিৎকার কেউ শুনতে পেল না কেন? আমি তো ধারণাই করে ফেলেছিলাম যে ড্যানিকে অন্য জায়গা থেকে হত্যা করে ওখানে আনা হয়েছে। কিন্তু..."

"কী?"

"শেরিফকে যখন ওটা মারছিল তখন তো আমি কাছেই ছিলাম, শেরিফেরও কোনো চিৎকার আমার কানে আসেনি! শুধুই কুকুরের ডাক শুনেছিলাম।"

"অদ্ভুত ব্যাপার, তবে দারিন্দারা রহস্যময়। সম্ভবত এই দারিন্দাটা মানুষের আওয়াজ বন্ধ করে দিতে পারে!"

***

বাড়ির ফেরার পথে মি. জেনিংসকে বাড়ির সামনের ব্যাগানের ক্যাকটাসগুলো নিয়ে কাজ করতে দেখল আফ্রিতা। এইবার কেস্টভিলে আসার পর এই প্রথম ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তার।

মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক তিনি, আকারে একটু খাটো।

"আরে মি. জেনিংস," বলে উঠল আফ্রিতা।

"আফ্রিতা! তুমি যে এসেছ সেটা আমি শুনেছি, কিন্তু দেখা হচ্ছিল না, আসলে বাড়িতে ছিলাম না," মৃদু হাসলেন উনি।

"মিসেস. জেনিংস বলেছেন, আপনি বাড়িতে কম থাকেন।"

"হুম, হ্যারি মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়ি আর ভালো লাগে না। ওর মাও সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে, আমার সঙ্গে কথা-টথা কম বলে। আজকাল মাটির

বাসন-কোসনে খাচ্ছে!"

"কেন?"

"ও বলে 'আমার হ্যারি মাটিতে মিশে গেছে তাই মাটির বাসনে খাব!"

"হুম।"

"এসো বাড়িতে।"

"নাহ, বাড়ি ফিরছি, সাবধানে থাকবেন মি. জেনিংস। শহরে যা হচ্ছে।"

"সে আর বলতে, তুমিও সাবধানে থেকো।"

***

খুব তাড়াতাড়িই রাতের খাবার সেরে নিল আফ্রিতা। রাতে আর রান্না করে না সে, দুপুরের থেকে যাওয়া খাবারগুলো খেয়েই কাটিয়ে দেয়।

এক কাপ চা নিয়ে দোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে সে। না জানি কী আছে এই শহরটার কপালে।

"সময় তোমাকে ঠিক জায়গাতে পৌঁছে দেবে," উপমহাদেশীয় টানে ইংরেজিতে কে যেন বলে উঠল।

স্ট্রিটলাইটের দিকে নজর গেল আফ্রিতার। সেই লোকটা! পরনে সেই ওভারকোট।

প্রায় দৌড়ে নীচে নামল আফ্রিতা, দরজা খুলে পৌঁছল সেই স্ট্রিটলাইটের নীচে।

ওখানে কেউ নেই!

তবে কি লোকটা কোনো অতিপ্রাকৃত কিছু?

নাহ! তেমন কিছু হলে সে আগেই অনুভব করতে পারত।

তবে কে এই লোক? এর ব্যাপারে শহরের কেউ জানে না কেন? একে কি শুধু সে-ই দেখতে পায়? এ এইসব কথা কি আফ্রিতাকে শোনানোর জন্যই বলে? দারিন্দাটার সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে?

কোনো উত্তরই বর্তমানে জানা সম্ভব না আফ্রিতার পক্ষে।

।। ৭ ।।

দুদিন পর।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে।

রান্নাঘরে একমনে কফি বানাচ্ছে স্টেফানি। জুলিয়ার ওপর খুবই বিরক্ত সে। সারাটাদিন স্কুলে মেয়েটা সেই একই প্যানপ্যান করে গেছে। সে নাকি আজকে আবারও স্বপ্নে ওই অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখেনি।

মানে আজকেও কেউ খুন হবে! ওদের নাকি ফ্রেজার ম্যানসনের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

যত্তসব ফালতু কথা, এসবে বিশ্বাস করতে বয়েই গেছে স্টেফানি।

কফিটা মগে ঢেলে নিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে

লাগল সে। ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত কুকুরের ডাক কানে এল তার। কেমন যেন গা ছমছমে ডাকটা।

আশেপাশের বাড়িগুলোতে তো কোনো কুকুর নেই, তবে ডাকল কে?

রাস্তার কোনো কুকুর?

মোবাইলে ঘড়ি দেখল স্টেফানি, ওর মায়ের বাড়ি আসতে এখনও আধাঘণ্টার মতো লাগবে।

সাধারণত খুবই সাহসী মেয়ে সে, কিন্তু তারপরেও, আজ কেন যেন অকারণেই ভয় পাচ্ছে সে।

ঠিক তখন রান্নাঘরের জানালার দিকে নজর পড়ল ওর, একটা মানুষ যেন ওখান দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

আর একটু এগিয়ে গেল সে, হ্যাঁ একটা মানুষই। লোকটা সম্ভবত বসে আছে, কারণ ওর মাথাটা জানালার একদম নীচে।

কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টিতে স্টেফানিকে দেখছে ও। কোনো পাগল নাকি?

কুটিল একটা হাসি ফুটে উঠল মুখটাতে।

দরজা সবসময় বন্ধই রাখে স্টেফানি। এই পাগলটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল? পুলিশে ফোন করবে নাকি সে?

আবার তাকাল সে জানালার দিকে। নাহ, কেউ নেই ওখানে।

চলে গেছে ব্যাটা।

কফিটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল স্টেফানি। কেমন যেন গা ছমছম করছে ওর। অদ্ভুত ব্যাপার, বরাবরই বাড়িতে একাই থেকে এসেছে সে, আগে তো কখন এমন অনুভূতি হয়নি! আজ কেন হচ্ছে?

আর পাগলটাই বা কেমন? জানালা দিয়ে উঁকি দিল, তাও আবার বসে।

একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল ওর, যেন ডাইনিংরুমে কেউ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কী করে সম্ভব? সদর দরজা তো ও লাগিয়ে রেখেছে। মায়ের কাছেও চাবি থাকে না, উনি এলে সে নিজেই দরজা খুলে দেয়।

আবার শব্দটা কানে এল ওর, যেন কোনো চারপেয়ে প্রাণী হেঁটে বেড়াচ্ছে ডাইনিং-এ।

প্রচণ্ড সাহসী স্টেফানি প্রায় দৌড়ে বাইরে চলে এল। কই! কেউ নেই ডাইনিং এ। দরজাও বন্ধ!

"কু কু কুউউউ" কুকুরের ডাকটা আবার শুনতে পেল সে। এবার ওর ঘর থেকে!

প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল সে। তারপরেই সে দেখতে পেল ওটাকে!

ওর বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্টেফানির পুরো শরীরটা যেন আতঙ্কে জমে গেল। ঠিক যেমনটা জুলিয়া স্বপ্নে দেখে। মাথাটা মানুষের কিন্তু শরীরটা কুকুরের। এই মাথাটা একটু আগেই রান্নাঘরের জানালাতে দেখেছে সে!

কিন্তু দরজা তো বন্ধ, কী করে ঢুকল এই পিশাচ?

আপশোশ, স্টেফানি এই প্রশ্নের উত্তর কোনোদিনই আর পাবে না।

***

বাসন-কোসনে খাচ্ছে!"

"কেন?"

"ও বলে 'আমার হ্যারি মাটিতে মিশে গেছে তাই মাটির বাসনে খাব।"

"হুম।"

"এসো বাড়িতে।"

"নাহ, বাড়ি ফিরছি, সাবধানে থাকবেন মি. জেনিংস। শহরে যা হচ্ছে।"

"সে আর বলতে, তুমিও সাবধানে থেকো।"

***

খুব তাড়াতাড়িই রাতের খাবার সেরে নিল আফ্রিতা। রাতে আর রান্না করে না সে, দুপুরের থেকে যাওয়া খাবারগুলো খেয়েই কাটিয়ে দেয়।

এক কাপ চা নিয়ে দোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে সে। না জানি কী আছে এই শহরটার কপালে।

"সময় তোমাকে ঠিক জায়গাতে পৌঁছে দেবে," উপমহাদেশীয় টানে ইংরেজিতে কে যেন বলে উঠল।

স্ট্রিটলাইটের দিকে নজর গেল আফ্রিতার। সেই লোকটা! পরনে সেই ওভারকোট।

প্রায় দৌড়ে নীচে নামল আফ্রিতা, দরজা খুলে পৌঁছল সেই স্ট্রিটলাইটের নীচে।

ওখানে কেউ নেই!

তবে কি লোকটা কোনো অতিপ্রাকৃত কিছু?

নাহ! তেমন কিছু হলে সে আগেই অনুভব করতে পারত।

তবে কে এই লোক? এর ব্যাপারে শহরের কেউ জানে না কেন? একে কি শুধু সে-ই দেখতে পায়? এ এইসব কথা কি আফ্রিতাকে শোনানোর জন্যই বলে? দারিন্দাটার সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে?

কোনো উত্তরই বর্তমানে জানা সম্ভব না আফ্রিতার পক্ষে।

।। ৭ ।।

দুদিন পর।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে।

রান্নাঘরে একমনে কফি বানাচ্ছে স্টেফানি। জুলিয়ার ওপর খুবই বিরক্ত সে। সারাটাদিন স্কুলে মেয়েটা সেই একই প্যানপ্যান করে গেছে। সে নাকি আজকে আবারও স্বপ্নে ওই অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখেনি।

মানে আজকেও কেউ খুন হবে! ওদের নাকি ফ্রেজার ম্যানসনের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

যত্তসব ফালতু কথা, এসবে বিশ্বাস করতে বয়েই গেছে স্টেফানি।

কফিটা মগে ঢেলে নিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে

লাগল সে। ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত কুকুরের ডাক কানে এল তার। কেমন যেন গা ছমছমে ডাকটা।

আশেপাশের বাড়িগুলোতে তো কোনো কুকুর নেই, তবে ডাকল কে?

রাস্তার কোনো কুকুর?

মোবাইলে ঘড়ি দেখল স্টেফানি, ওর মায়ের বাড়ি আসতে এখনও আধাঘণ্টার মতো লাগবে।

সাধারণত খুবই সাহসী মেয়ে সে, কিন্তু তারপরেও, আজ কেন যেন অকারণেই ভয় পাচ্ছে সে।

ঠিক তখন রান্নাঘরের জানালার দিকে নজর পড়ল ওর, একটা মানুষ যেন ওখান দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

আর একটু এগিয়ে গেল সে, হ্যাঁ একটা মানুষই। লোকটা সম্ভবত বসে আছে, কারণ ওর মাথাটা জানালার একদম নীচে।

কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টিতে স্টেফানিকে দেখছে ও। কোনো পাগল নাকি?

কুটিল একটা হাসি ফুটে উঠল মুখটাতে।

দরজা সবসময় বন্ধই রাখে স্টেফানি। এই পাগলটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল? পুলিশে ফোন করবে নাকি সে?

আবার তাকাল সে জানালার দিকে। নাহ, কেউ নেই ওখানে।

চলে গেছে ব্যাটা।

কফিটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল স্টেফানি। কেমন যেন গা ছমছম করছে ওর। অদ্ভুত ব্যাপার, বরাবরই বাড়িতে একাই থেকে এসেছে সে, আগে তো কখন এমন অনুভূতি হয়নি! আজ কেন হচ্ছে?

আর পাগলটাই বা কেমন? জানালা দিয়ে উঁকি দিল, তাও আবার বসে।

একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল ওর, যেন ডাইনিংরুমে কেউ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কী করে সম্ভব? সদর দরজা তো ও লাগিয়ে রেখেছে। মায়ের কাছেও চাবি থাকে না, উনি এলে সে নিজেই দরজা খুলে দেয়।

আবার শব্দটা কানে এল ওর, যেন কোনো চারপেয়ে প্রাণী হেঁটে বেড়াচ্ছে ডাইনিং-এ।

প্রচণ্ড সাহসী স্টেফানি প্রায় দৌড়ে বাইরে চলে এল। কই! কেউ নেই ডাইনিং এ। দরজাও বন্ধ!

"কু কু কুউউউ" কুকুরের ডাকটা আবার শুনতে পেল সে। এবার ওর ঘর থেকে!

প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল সে। তারপরেই সে দেখতে পেল ওটাকে!

ওর বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্টেফানির পুরো শরীরটা যেন আতঙ্কে জমে গেল। ঠিক যেমনটা জুলিয়া স্বপ্নে দেখে। মাথাটা মানুষের কিন্তু শরীরটা কুকুরের। এই মাথাটা একটু আগেই রান্নাঘরের জানালাতে দেখেছে সে!

কিন্তু দরজা তো বন্ধ, কী করে ঢুকল এই পিশাচ?

আপশোশ, স্টেফানি এই প্রশ্নের উত্তর কোনোদিনই আর পাবে না।

***

বসে আছে ববি। কিছুই করার নেই আজকাল। সন্ধ্যার পর মানুষ বাড়ি থেকেই বের হচ্ছে না, তাই ভারপ্রাপ্ত শেরিফের কাছে নালিশ আসাও প্রায় বন্ধই বলা চলে।

ওর ফোনটা বেজে উঠল।

ফ্রেজার ম্যানসনের সেই মেয়েটা ফোন দিয়েছে, এই সময়ে!

"হ্যালো," ফোনটা ধরল ববি।

"আজ রাতেও কিছু একটা ঘটবে বা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে সম্ভবত।"

"আবার ওটার অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছেন! হায় হায়, এখন কী করব?"

"কিছুই করার নেই! চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া। হয়তো সে কাউকে মেরে ফেলেছে।"

"হায় ঈশ্বর!"

***

পার্কের একটা কোনাতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

প্রকৃতির কিছু নিয়ম আর সীমারেখার কাছে সে বাঁধা। আপত্তি থাকলেও তাই অনেক কিছুই চেয়ে চেয়ে দেখতে হয় তাকে।

তবে আর কিছুটা সময়, তারপরেই সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে সে।

ওদিকে আরও একটি মৃতদেহ পেল কেস্টভিল শহর। আতঙ্কের ছায়াটা যেন আবার নতুন করে জাপটে ধরল পুরো শহরকে।

কিন্তু বরাবরের মতো কিছুই করতে পারল সে না কেউ।

***

পরের দিন।

ফ্রেজার ম্যানসনের বসার ঘরের সোফাতে বসে আছে আফ্রিতা আর ববি।

"তাহলে স্টেফানির লাশ প্রথম দেখেন ওর মা, ডা. এমিলি।"

"হুম, ভদ্রমহিলা পাগলপ্রায়। এর আগের দুটো লাশও উনিই পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কোনোটাই তো আর নিজের মেয়ের লাশ ছিল না।"

"লাশ পরীক্ষা করল কে তবে?"

"ডেনভারে পাঠানো হয়েছিল লাশ। একটু আগেই ফলাফল এল।"

"কী জানলেন?"

"ওই একই। কোনো আঙুলের ছাপ নেই, আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন নেই, স্রেফ হাত-পা আর মাথা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।"

"ওটা স্টেফানিকে বাড়িতে ঢুকে মেরেছে!"

"হ্যাঁ এটাও এক রহস্য, সব-দরজা জানালা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। ওটা ভেতরে ঢুকল কী করে? আর ওদের পড়শিরাও বলেছে, কোনো চিৎকার তারা শোনেনি।"

"হুম। ওর পক্ষে বন্ধ বাড়িতে ঢোকা কোনো ব্যাপার না।"

"তাই হবে হয়তো, ডা. এমিলি অনেকবার নক করার পরও যখন স্টেফানি দরজা খোলে না তখন তিনি আশেপাশের লোকদের ডেকে দরজা ভাঙান।"

"হুম।"

"পরশুই ডেনভার পুলিশের বিশেষ দল আসছে। এর মধ্যে শহর থেকে কেউ আর বাইরে যেতে পারবে না, আমাকে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! যেহেতু আমি কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারিনি তাই কিঞ্চিৎ বকা-ঝকাও করা হয়েছে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, আপনার কি বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে নাকি?"

"নাহ, আমি আরো কয়েক সপ্তাহ থাকব! ভয় নেই, আপনাকে বিপদে ফেলব না।"

"ওটাকে ধরার ইচ্ছা?"

"ইচ্ছা তো তাই, কিন্তু আপাতত তো তা অসম্ভব। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে কিন্তু।"

"হুম," উঠে পড়ল রববি।

***

স্টেফানির মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকে তেমন কিছুই আর ভালো লাগছে না জুলিয়ার। সারাটাদিন জেফ আর মায়ের সঙ্গে তেমন কথাই বলেনি সে।

স্টেফানির মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে ওর।

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, ওর স্বপ্ন থেকে বেরিয়েই খুন করে ওই দানবটা।

ঠিক করে নিয়েছে জুলিয়া, কাল সকালেই সে ফ্রেজার ম্যানসনের মেয়েটার কাছে যাবে, একমাত্র সে-ই সাহায্য করতে পারবে ওকে।

ঠিক তখন জুলিয়ার বাড়ির সামনের স্ট্রিটলাইটটার নীচে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছিল সে।

সময় হয়েছে।

।। ৮ ।।

কে যেন ক্রমাগত দরজার কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে।

এত রাতে কে আসবে? কেস্টভিলের লোকেরা তো আজকাল সন্ধ্যার পর বের হয় না। রববি এসেছে? হতেও পারে।

নাকি ওই।

নিজের অজান্তেই ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল আফ্রিতা।

দরজাটা খুলল সে। কেউ নেই দরজাতে!

"মৃত্যু কাউকে ক্ষমা করে না, একমাত্র মৃত্যুর সামনেই আমরা সবাই সমান," স্ট্রিটলাইটের ওদিকে থেকে কারও কণ্ঠে ভেসে এল।

সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আফ্রিতা। সেই লোকটা! সেই ওভারকোট পরা লোকটা।

লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল আফ্রিতা। আজকে ধরতেই হবে ব্যাটাকে, কে ও? কী চায়?

কিন্তু হাঁটতে শুরু করল লোকটাও।

আফ্রিতা দৌড়াতে লাগল, আর লোকটা যেন হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে যাচ্ছে।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছে আফ্রিতা, সে ভুলে গেছে যে এই শহরটা

একটা ভয়াবহ পিশাচ দ্বারা আক্রান্ত। সে ভুলে গেছে এত রাতে রাস্তাতে হাঁটাটা একদমই অনিরাপদ। সে শুধু জানে, লোকটাকে ধরতে হবে।

আফ্রিতা নিজেও জানে না কতোটা পথ পেরিয়ে গেছে সে।

যখন হুঁশ ফিরল তখন ও বুঝতে পারল যে ও একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা ছোট্ট।

লোকটাকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেল না সে। কোথায় গেল তবে ব্যাটা? হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি?

আবার বাড়ির দিকে নজর পড়ল আফ্রিতার। কীসের যেন প্রভাব রয়েছে ওখানে।

চোখ বন্ধ করল সে, আর তারপরেই চমকে উঠল!

মোবাইলটা বের করে রববিকে ফোন করল সে।

***

"হ্যালো," রববির কণ্ঠে ক্লান্তি।

"ক্যাসল স্ট্রিটের সাত নম্বর বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এখানেই সম্ভবত..." হাফাচ্ছে আফ্রিতা।

"সাত নম্বর বাড়ি? ক্যাসল স্ট্রিট... ওটা তো জুলিয়াদের বাড়ি!"

"জুলিয়া মানে? সেই মেয়েটা? যাকে ড্যানি পছন্দ করত?"

"হ্যাঁ, ওখানে কী?"

"ফোনে অত বলা যাবে না, আপনি এখনই এখানে চলে আসুন, এখনই!"

"এত রাতে তো কোনো কনস্টেবলও মনে হয় বের হতে চাইবে না আমার সঙ্গে!"

"আপনি একাই আসুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!"

"কী হয়েছে? বলুন তো?"

"সম্ভবত এই বাড়িতেই দারিন্দাটার পৃথিবীতে আসার রাস্তা।"

***

কয়েকবার দরজা নক করার পর দরজাটা একটু খুলে ফাঁক দিয়ে মুখ বের করলেন একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা।

"আপনি কে? কী চাই?" মহিলার কণ্ঠে বিরক্তি।

"আমি ফ্রেজার ম্যানসনে থাকি, জুলিয়ার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাচ্ছিলাম," বলল আফ্রিতা।

"ওহ সেই মেয়েটা? শুনেছি আপনার ব্যাপারে, দুঃখিত, আমার মেয়ে এখন ব্যস্ত," দরজাটা প্রায় বন্ধই করে দিচ্ছিলেন মহিলা।

"দয়া করে একটু দেখা করতে দিন!"

"আপনি কি পুলিশের লোক? পুলিশ একবার দেখা করে গেছে তো!"

"না, একটু অন্য ব্যাপারে দরকার ছিল।"

"শুনেছি আপনি জাদুটোনা পারেন, আমি চাই না আমার মেয়ে ওইসবের চক্করে পড়ুক!"

"মা," পেছন থেকে অল্পবয়স্ক একটা মেয়ের গলা শোনা গেল, "উনাকে

আসতে দাও, কাল আমি নিজেই উনার কাছে যেতাম," জুলিয়া এসে দাঁড়িয়েছে।

"ঘরে যাও, আর আপনি বাড়ি যান, শহরের অবস্থা ভালো না!"

"মা দয়া করে..."

"আসলে আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না, তারপরেও," ডানহাতটা ওপরে তুলল আফ্রিতা, তারপর বুড়ো আঙ্গুলটা দুইবার নাড়াল।

কেমন যেন শূন্য হয়ে গেল জুলিয়ার মায়ের দৃষ্টি। দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

"মাআআ..." চিৎকার করে উঠল জুলিয়া, "কী হল উনার? আপনি কী করেছেন?"

"ভয় পেও না," বাড়িতে ঢুকল আফ্রিতা, "উনাকে সম্মোহিত করেছি, কাজ শেষ করার পরেই আবার উনাকে ঠিক করে দেব!"

"কিন্তু, আমার মা।"

"শান্ত হও জুলিয়া," ওকে সোফাতে বসাল আফ্রিতা, "তুমি ওটাকে স্বপ্নে দেখো, তাই না?"

"হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন? স্টেফানি বলেছিল নাকি?" ভয়ের ভাবটা এখনও যায়নি জুলিয়ার।

"নাহ, স্টেফানির সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি, তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, যাই হোক সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। আমাকে সব খুলে বলো। কবে থেকে স্বপ্নে দেখো ওটাকে? কী দেখো সব!"

"মা ঠিক হবে তো?"

"আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে আরম্ভ করল জুলিয়া।

***

"তার মানে তুমি ওটাকে শুধু স্বপ্নেই দেখেছ? সামনা-সামনি দেখোনি?" ভ্রূ কুঁচকে গেছে আফ্রিতার।

"হ্যাঁ!"

"যেদিন ওটা থাকে না, সেদিনই কেউ মারা যায়?"

"হ্যাঁ!"

"আজব, কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! দারিন্দারা তো একবার হলেও যার স্বপ্নের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে তাকে দেখা দেয়!"

"আমাকে তো দেখা দেয়নি!"

"তার মানে তোমার স্বপ্নের মাধ্যমে ও এই পৃথিবীতে আসছে না!"

"তাহলে?"

"সেটাই তো ভাবছি, কিন্তু বাইরে থেকে যা বুঝেছি রাস্তাটা, এই বাড়ির কারোরই।"

"তোমরা কী করছ?" বসার ঘরে ঢুকল জেফ, "মা আমি হট চকোলেট খাব!"

ওর দিকে তাকাতেই চমকে উঠল আফ্রিতা।

"জুলিয়া, মা উত্তর দিচ্ছেন না কেন?" আবার বলল জেফ।

"মায়ের একটু মন খারাপ, এটা আমার ছোটোভাই," বলল জুলিয়া।

"এই ছেলে এদিকে এসো," জেফকে ডাকল আফ্রিতা।

"হ্যাঁ বলুন," বেশ আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে এল জেফ, "আপনি কে?"

"আমি তোমার বোনের বান্ধবী, তুমি ওই অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখেছ, তাই না?"

"কোন প্রাণী?"

"মাথাটা মানুষের মতো, কুকুর?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম জুলিয়াকে ও বিশ্বাস করেনি!"

"বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু কাউকে বলিনি," মাথা নীচু করে বলল জুলিয়া।

"তুমি ওকে স্বপ্নেও দেখো, তাই না?"

"আপনি কী করে জানলেন? জানেন আমি মাঝে মাঝেই ওকে দেখি একটা গাছের নীচে বসে থাকে ওটা!"

"আর মাঝে মাঝে শুধুই গাছটা?"

"হ্যাঁ!"

"তুমি তোমার বোনকে কেন বলোনি যে ওটাকে তুমি স্বপ্নে দেখো?"

"তুমিও? আমাকে বলোনি কেন?" আর্তনাদ করে উঠল জুলিয়া।

"বলার কী আছে?" হেসে উঠল জেফ।

"জেফের স্বপ্নের মাধ্যমে ওটা পৃথিবীতে আসছে! তোমার স্বপ্নের মাধ্যমে না," বলল আফ্রিতা।

"কীহ!" চমকে উঠল জুলিয়া!

"আজ তোমরা দুজনেই ওটাকে স্বপ্নে দেখেছ? মানে দুজনের স্বপ্নেই তো ওটা ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল দুজন।

তখনই বাইরে একটা গাড়ি শব্দ হল।

রববি এসে গেছে।

***

"রববি ভালো হয়েছে আপনি এসে গেছেন, আমাদের এখনই যেতে হবে," বলে উঠল আফ্রিতা।

"কোথায় যেতে হবে? এখনই না এলাম? কী পেলেন আপনি?" হন্তদন্ত হয়ে বলল রববি।

"এঁই ছেলেটা," জেফকে দেখিয়ে বলল আফ্রিতা।

"কী?"

"পরে বোঝাব, গাড়ি এনে ভালো করেছেন। আচ্ছা, জুলিয়া তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে!"

"কিন্তু মা?" জুলিয়ার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

"কাজ শেষ করে এসে উনাকে ঠিক করে দেব, তোমাদের কি কোনো পোষা প্রাণী আছে?"

"হ্যাঁ, ডাফি," বলল জেফ।

"ওকে ভেতরে নিয়ে এসে রাখো, আর জুলিয়া সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দাও।"

ডাফিকে এনে ঘরের ভেতর রাখল জেফ। জুলিয়া সব বন্ধ করে দিল।

ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট মার্বেল বের করে টেবিলের ওপর রাখল আফ্রিতা।

তারপর ওরা বাড়ি থেকে বের হল।

"বাইরে থেকে তালা মেরে দাও," জুলিয়াকে বলল আফ্রিতা। তাই করল জুলিয়া। কেন যেন বিদেশি মেয়েটাকে খুব বেশি বিশ্বাস হচ্ছে তার।

"বুঝলেন রববি, আজকে দারিন্দার আসার দিন নয়, কিন্তু যে ওকে আহ্বান করেছে সে হামলা চালাতে পারে, তাই বাড়িটা বন্ধ করে দিলাম!"

"ওই মার্বেল?"

"হ্যাঁ! চলুন তবে!"

"কোথায়?"

"ফ্রেজার ম্যানসন। আপনারা গাড়িতে উঠুন আমি আসছে।"

গাড়ির পেছনে বসল জেফ আর জুলিয়া, ড্রাইভারের সিটে রববি।

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে গাড়িটাকে স্পর্শ করল আফ্রিতা, তারপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। তারপর উঠে এসে রববির পাশের সিটটাতে বসল।

"গাড়িও বন্ধ করে দিলেন?"

"হ্যাঁ, যে এই দারিন্দাকে ডেকে এনেছে সে সম্ভবত কোনো কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি এখনও আর তার ধারণা সে আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে। কিন্তু তারপরেও... বাড়তি সাবধানতা।"

"কে সে?"

"চলুন তো, গেলেই দেখতে পাবেন।"

চলতে শুরু করল গাড়ি।

"মায়ের কিছু হবে না তো?" আবার বলল জুলিয়া।

"নাহ, উনি একদম নিরাপদ, এখন যদি কোনো বিপদ হয় তবে আমাদেরই হবে," মৃদু হাসল আফ্রিতা।

।। ৯ ।।

গাড়ি থেকে নেমে ফ্রেজার ম্যানসনের দেকে হেঁটে যাচ্ছিল রববি।

"আরে আরে, করেন কী? ওদিকে না, এদিকে," বলে জেনিংসদের বাড়িটা দেখালো আফ্রিতা।

"ওটা না হ্যারিদের বাড়ি?" বলে উঠল জুলিয়া।

"হ্যাঁ, তুমি চিনতে ওকে?"

"হ্যাঁ, আমাদের স্কুলেই তো পড়ল ছেলেটা!"

"ওর আত্মাকেই কবজা করে দারিন্দা কাজ করছে!"

"কিন্তু ওই বাড়িতে কেন?" অবাক হলো রববি।

"ওখানেই সব রহস্য, শুনুন আপনারা তিনজন আমার পিছে থাকবেন। কারোই শরীর বন্ধ করিনি, এমনকি আমার নিজেরও না, শরীর বন্ধ করলে দারিন্দাকে ডেকে আনা যায় না। রববি আপনার পিস্তলটা কিন্তু বেশ কাজে লাগতে পারে, এনেছেন তো?"

"এনেছি," ঢোক গিলল রববি।
"গোলাগুলি হবে নাকি?" ফিক করে হেসে দিল জেফ।
"ছোটো ছেলেটা," ওর গাল টিপে দিল আফ্রিতা, "হতেও পারে, তুমি যদি বুঝতে কতো ভয়াবহ একটা কাজে যাচ্ছি আমরা।"
জেনিংসদের বাড়ির কলিংবেল আট-দশবার বাজানোর পরেও কেউ খুলল না। যদিও বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে।
"অফিসার রববি, দরজাটা খুব একটা শক্ত না, ভেঙে ফেলুন," বলে সরে দাঁড়াল আফ্রিতা।
দুটো শক্ত লাথি মারতেই খুলে গেল দরজাটা। আর ঠিক তখনই রববি দেখতে পেল একটা চাকু হাতে ওর দিকে ছুটে আসছেন মিসেস. জেনিংস।
"থামুন, নইলে গুলি করব," বলে চেঁচিয়ে উঠল সে।
ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে এগিয়ে এল আফ্রিতা। তারপর ডান হাতটা উঁচু করল, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য এক ধাক্কায় যেন সোফার ওপর গিয়ে পড়লেন মিসেস. জেনিংস।
"এটা কী হল?" ভয় পেয়ে গেছে রববি।
"হল কিছু একটা, উনি এখন আর কিছু করতে পারবেন না, সবাই ভেতরে এসো।"

***

সোফার ওপর বসে ক্রমাগত ছটফট করছেন মিসেস. জেনিংস। যেন অদৃশ্য কেউ তাঁকে জাপটে ধরে আছে।
"উনি এমন করছেন কেন?" ভয়ে ভয়ে বলল জুলিয়া।
"উনাকে আমি বেঁধে ফেলেছি অদৃশ্যভাবে, এখন উনি আর কিছুই করতে পারবেন না," ব্যাগ থেকে একটা সবুজ চক বের করে মাটিতে দুটো বৃত্ত আঁকতে লাগল আফ্রিতা।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আঁকা শেষ হয়ে গেল ওদুটো।
"জুলিয়া আর জেফ, তোমরা ওই দুটোর ভেতরে দাঁড়াও, যত যাই হয়ে যাক বের হবে না," উঠে দাঁড়াল আফ্রিতা।
ওর কথামতো কাজ করল ওরা দুজন। জুলিয়াকে খুব ভীত দেখাচ্ছে, কিন্তু জেফ অত ভয় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। সে বেশ উৎসুক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখছে।
"তো, কী খবর মিসেস. জেনিংস? প্রথমবার যখন হ্যারিকে ডাকলাম তখন আপনি গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, যাতে করে ও আমাকে কিছু বলতে না পারে," হাসল আফ্রিতা।
"আমি জানতাম কুত্তি, তুই এটা বুঝে ফেলবি," এই প্রথম কথা বললেন মিসেস. জেনিংস, কেমন যেন ঘ্যাড়ঘেড়ে কণ্ঠ, উনার এমন কণ্ঠ আগে শোনেনি আফ্রিতা।
ঘুরে তাকাল ও, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রববি আর জেফ। স্পষ্ট আতঙ্ক জুলিয়ার চোখে-মুখে।
"সেটাই, তারপর যখন আবার কোনোমতে ওকে একদিন ডাকলাম সেদিন

কিছু 'কুক্কু' পাঠিয়ে আমার কাজ শেষ করে দিলেন, তাই না?" সোফাতে বসে পড়ল আফ্রিতা।

"এটাও বুঝেছিস মাগি?"

"তা না বোঝার কী আছে?"

"কুক্কু কী?" পাশ থেকে বলল রববি।

"ছোটোখাটো এক প্রকারের প্রেত, মানুষের কোনো কাজ ভন্ডুল করতে এদের জুড়ি নেই," বলল আফ্রিতা, "যাই হোক মিসেস. জেনিংস, আপনার বানানো 'ইকসু কেক' কিন্তু আমি খাইনি। হ্যাঁ, ইকসু কেক দেখে কিছু অনুভব করা যায় না। তাই অনেকেই ভুল করে এটা খেয়ে নিজের ক্ষমতা কয়েক মাসের জন্য হারিয়ে ফেলে! কিন্তু আগে থেকেই আমার আপনার বাড়ির ওপর সন্দেহ ছিল! তাই খাইনি!"

"আমি জানতাম তুই খাবি না, এতই সব যখন বুঝেছিস তো কিছু করিসনি কেন আমাকে? নাকি সেই ক্ষমতা নেই তোর?" খলখল করে হাসলেন মিসেস. জেনিংস।

"করিনি, কারণ আমি জানি এইসব কাজ আপনি করছেন না। আপনাকে ব্যবহার করছে অন্য কেউ! আপনি হ্যারির আত্মাকে ওই দারিন্দার হাতে তুলে দেননি। যে আপনাকে ব্যবহার করছে তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি আজ," চোখ টিপল আফ্রিতা।

"আমিই সব করেছি, কেউ আমাকে ব্যবহার করছে না!"

"আমাকে বোকা ভাবেন নাকি? সেই লোকই জ্যাকলিন স্ট্র্যাকারের প্রেতকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু আমি তার মতলব শেষ করে দেই। পরে দারিন্দা ডাকার সময়ে যখন আবার আমাকে শহরে আসতে দেখে তখন আপনাকে দিয়ে চেষ্টা করে আমাকে ভুল পথে চালিত করার, যাতে করি আমি আপনাকে সন্দেহ করি!"

দাঁড়িয়ে পড়ল আফ্রিতা, তারপর দুটো হাত উপরে তুলে জোরে জোরে বলতে লাগল, "ইগতা, উ, হাউসা, ইগতা, উ, হাউসা।"

হুট করেই তাপমাত্রা কমতে লাগল ঘরটার। শীত-শীত করতে লাগল ওদের সবার। ঘরের আলোগুলো জ্বলতে আর নিভতে লাগল ক্রমাগত। যেন কোনো এক ইংরেজি হরর সিনেমার দৃশ্য!

আফ্রিতা কিছু বুঝে ওঠার আগেহ বামপাশের একটা দরজা খুলে গেল আর সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল অর্ধনগ্ন একটা লোক। দুইহাতে দুটো চাপাতি, মুখে মুখোশ।

এতটাই জোরে দৌড়াচ্ছিল সে আফ্রিতা নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই ওর সামনে পৌঁছে গেল লোকটা।

"ঢাঁই" করে একটা শব্দ হলো।

চোখ খুলে আফ্রিতা দেখতে পেলো রববি রিভলভারটা ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে পড়ে আছে লোকটা।

একটা চাপাতি এসে পড়েছে জুলিয়ার পায়ের কাছে।

মুখোশটা খসে পড়ল লোকটার মুখ থেকে।

"মি. জেনিংস!" আঁতকে উঠল রববি।

***

"অনেক ধন্যবাদ অফিসার, আপনি না থাকলে এতক্ষণে এই শয়তান আমার গলাটা নামিয়ে দিত, একদম সিনেমার মতো হচ্ছে সব কিছু," অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফোটাল আফ্রিতা।

"আপনার হাসি আসছে? মি. জেনিংস এইসবের পিছে?" গলাটা কাঁপছে রববি, "উনার রক্তক্ষরণ হচ্ছে!"

"ভয় পাবেন না, ওর এত সহজে কিছু হবে না। তাই না মি. জেনিংস, কতদিন ধরে এইসব হ্যাঁ? জ্যাকলিন স্ট্রিকারের আত্মাকে ডেকে আনা, তারপর নিজের ছেলের মৃত্যুর পর তার আত্মাকে দিয়ে দারিন্দাকে ডেকে আনা! কতটা নীচ আপনি। ছিহঃ! নিজের স্ত্রীকে বশে এনে আমাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা! আবার বলেন কী, উনার স্ত্রী মাটির পাত্রে খাচ্ছেন, কুক্কু সাধকেরা মাটির পাত্রে খায়। মানে এত খারাপ আপনি? কিন্তু একটা যে ভুল করে ফেলেছেন, সেদিন রাতে কী করছিলেন? রাতের বেলা তোলা ক্যাকটাসের কাটা, কুক্কুদের সামলে রাখতে লাগে, তাই না? বাড়ির বেসমেন্টে থেকে থেকে এইসব করতেন আর মানুষ জানত আপনি শহরে থাকেন না! ছিহঃ!"

কোনো উত্তর দিচ্ছেন না মি. জেনিংস, তিনি এক দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"আচ্ছা, সবাই প্রস্তুত হন, এইবার শেষ দৃশ্য, হ্যারির আত্মাকে ডাকা হবে, ওর সঙ্গে দারিন্দাটাও থাকবে কিন্তু, কেউ ভয় পাবেন না, ও কারো কিছু করতে পারবে না এখন," রববির দিকে তাকিয়ে বলল আফ্রিতা।

"ইতা কাল হাও, ইতা কাল হাও, হ্যারি, ইতা কাল হাও।" চোখ বন্ধ করে ক্রমাগত বলতে লাগল আফ্রিতা। ঘরের আলোগুলো জ্বলতে-নিভতে শুরু করল আবার, তাপমাত্রা আরোও কমে গেল।

জেফ যেন ঠান্ডায় কাঁপছে! এই প্রথম ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও ভয় পাচ্ছে।

কোনো এক অদ্ভুত কারণে জুলিয়া বেশ চুপচাপ।

রববি তো ঠিক করে ফেলেছে এই বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত রিভলভার আর ভেতরে ঢুকাবে না সে। কিন্তু মি. জেনিংসের যে ক্রমাগত রক্তপাত হয়েই যাচ্ছে।

ঠিক তখনই ঘরের একদম মাঝখানে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

যেন শূন্য থেকেই সেখানে উদয় সতেরো-আঠারো বছর বয়সের এক সুদর্শন তরুণ!

"হ্যারি!" বলে উঠল রববি। ছেলেটাকে চিনত সে।

কেন জানি হ্যারির মুখভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব কষ্টে আছে সে, কেমন যেন সামনের দিকে ঝুঁকে আছে ছেলেটা। কুঁজো মানুষেরা যেভাবে থাকে ঠিক তেমন।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেল রববি। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা লাগছে ওর। অত্যধিক মানসিক চাপ?

"আরেহ্, ওইতো ওটা।" জেফের কথাতে যেন বাস্তবে ফিরে এল সে। আর তখন হ্যারির দিকে নজরে শিউরে উঠল সে। হ্যারির কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণটা এইবার পরিষ্কার।

হ্যারির ঘাড় ধরে পিঠের ওপর বসে রয়েছে সেই প্রাণীটা, দারিন্দাটা।

“এ যে দেখি একদম বিক্রম-বেতালের মতো দৃশ্য,” বলে উঠল আফ্রিতা। ঘেমে গেছে সে, ভয়াবহ এই দারিন্দাসহ আত্মাকে ডেকে আনা খুবই কষ্টের কাজ, তারপর যে আহ্বান করেছিল সে সামনে রয়েছে, তাই কাজটা করতে পেরেছে আফ্রিতা।

“মি. জেনিংস বুঝলেন,” ব্যাগ থেকে কী যেন বের করতে করতে বলল আফ্রিতা, “আপনি না থাকলে ওটা ডেকে আনতেই পারতাম না! ধন্যবাদ।”

কোনো উত্তর দিচ্ছেন না মি. জেনিংস। এক দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

দারিন্দাটার দিকে তাকাল আফ্রিতা। এক সাধারণ কুকুরের মাথায় জায়গায় একটা মানুষের মাথা! আর এই ব্যাপারটাই কতটা ভয়াবহ করে তুলেছে অতিপ্রাকৃত প্রাণীটাকে! ওটার মুখটা অভিব্যক্তিহীন।

“ওটা আবার কাউকে আক্রমণ করবে না তো?” বলল রববি, রিভলভারটা এখনও তার হাতে।

“নাহ্, আজ আর ওর কিছুই করার ক্ষমতা নেই,” ব্যাগ থেকে কাপড় দিয়ে বানানো একটা ছোট্ট পুতুল বের করেছে আফ্রিতা। সেটা নিয়ে সে এগিয়ে গেল মি. জেনিংসের দিকে, তারপর সেই পুতুলটাকে স্পর্শ করল মাটিতে পড়ে থাকা মি. জেনিংসের রক্তের সঙ্গে। তারপর সে গেল জেফের সামনে।

“এটা ধরে থাকো,” জেফের হাতে পুতুলটা দিল আফ্রিতা।

হ্যারির প্রেতাত্মাটার দিকে ঘুরল সে।

“হ্যারি, তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে আমি জানি, তোমার বাবা যে এই শয়তানের হাতে তোমার আত্মাকে সমর্পণ করেছেন তাও আমি জানি,” একটু থামল আফ্রিতা, “কিন্তু তুমি যদি না চাও, তবে এর হাত থেকে তোমাকে আমি মুক্ত করতে পারব না! আমি প্রায় সব প্রস্তুতি শেষ করেছি। এবার শুধু একবার তোমাকে মুখ দিয়ে বলতে হবে। কষ্ট হলেও বলতে বলো। তুমি এই শয়তানের সঙ্গে থাকতে চাও না!”

“আ আ আমি... মু মুক্তি চাই। এই শয়তানের হাআআআ...ত থেকে,” অনেক কষ্টে বলল হ্যারি।

“দারিন্দা, ও তোমাকে চায় না! ওকে ছেড়ে দাও,” আদেশের সুরে বলল আফ্রিতা।

অদ্ভুত ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ঘাড় থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল দারিন্দাটা।

“এবার একে ওর জগতে ফিরত পাঠাব,” হাসল আফ্রিতা।

“একে শেষ করে দেওয়া যায় না?” পাশ থেকে বলল রববি।

“নাহ, দারিন্দারা অমর, এদের মারা সম্ভব না।”

“জেফ।” জেফের দিকে তাকাল সে, “তোমার স্বপ্নের মাধ্যমে এই শয়তান পৃথিবীতে এসেছে, অনেক মানুষকে মেরেছে, তুমি কি চাও যে এ এখান থেকে চলে যাক?”

“আমার ভয় করছে,” জেফের গলাটা কাঁপছে, “ভয় পেতে পেতে শুরু করেছে সে।”

ওর দোষ দেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেল না রববি। এতক্ষণ এখানে যা হয়েছে, তাতে ওর নিজেরই বুক কাঁপছে। সেখানে জেফ তো ছোটো একটা বাচ্চা।

"তুমি কি চাও এই শয়তান এখানে থাকুক?" আবার বলল আফ্রিতা।

"না... ও চলে যাক," আর্তনাদ করে উঠল জেফ।

ডানহাতটা দুইবার ওপর দিকে নাড়া দিল আফ্রিতা আর সঙ্গে সঙ্গে জেফের সামনে তৈরি হল একটা আগুনের কুণ্ড। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল জেফ।

"পুতুলটাকে ফেলে দাও আগুনে," বলে উঠল আফ্রিতা।

"আমার ভয় করছে।" কাঁপছে জেফ।

"ফেলো বলছি।"

আগুনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল জেফ আর ঠিক তখনই নিজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাপাতিটা তুলে নিল জুলিয়া।

একলাফে জেফের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। তারপর চাপাতিটা ধরল জেফের গলা বরাবর।

"জুলিয়া! এসব কী!" চেঁচিয়ে উঠল আফ্রিতা।

"হিহিহিহি," কুৎসিতভাবে হেসে উঠল জুলিয়া, "তোরা এখান থেকে চলে যা, না হলে এই ছেলের মাথাটা এখনই নামিয়ে দেব। এ মরে গেলে দারিন্দা তাড়াবি কী করে?" হেসেই চলল জুলিয়া। পাগলের মতো হাসি।

"জুলিয়া, এ কী করছ তুমি," কেঁদে ফেলল জেফ।

"চুপ শালা।" আবার হাসতে লাগল জুলিয়া।

আফ্রিতা খেয়াল করল হাসি ফুটে উঠেছে রক্তাক্ত মি. জেনিংসের মুখেও!

***

"এসব কী? জুলিয়া তুমি এমন করছ কেন?" চিৎকার করে উঠল রববি।

"আমাকে ছেড়ে দাও জুলিয়া, আমাকে মেরো না," কাঁদছে জেফ। ওর হাতের পুতুলটাকে স্পর্শ করছে না জুলিয়া। এক হাতে কাঁধের একটা পাশ স্পর্শ করে আর এক হাতে গলাতে চাপাতি ধরে আছে।

"আমি কিন্তু গুলি করব," বলে উঠল রববি।

"কর শালা, গুলি করবি আর আমিও এর গলাতে ছুরি চালাব, ভালো চাস তো এখান থেকে যা," আবার সেই উন্মাদের মতো হাসি দিল জুলিয়া।

"ওকে মি. জেনিংস সম্মোহিত করে নিয়েছেন," হতাশ গলায় বলল আফ্রিতা, "কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? ওকে তো সুরক্ষা বৃত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম! ওর ভেতরে কী করে সম্মোহন করল? আর তারপর আবার কী করে জেফের বৃত্তে ঢুকল!"

"আপনি এই জাদু কাটাতে পারবেন না?" আফ্রিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রববি।

"নাহ, সুরক্ষা বৃত্তের ভেতরে কোনো জাদু প্রবেশ করবে না, আমার জাদুও না!"

"তাহলে ওই বুড়ো কী করে করল?"

"সেটাই তো ভাবছি, যত বড়ো জাদুকরই হোক না কেন, সুরক্ষা বৃত্তের ভেতরে জাদু প্রবেশ করানো যেন তেন কথা নয়!"

"তো যাবি, নাকি একে জবাই দেব?" বলে উঠল জুলিয়া।

ওপাশ থেকে একদম জানোয়ারের মতো করে হেসে উঠলেন মি. জেনিংস। রক্তাক্ত লোকটাকে আস্ত পিশাচের মতো লাগছে।

ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হ্যারির প্রেত আর সেই দারিন্দাটা, যেন দুটো পুতুল।

"কিছুই কি করার নেই?" হতাশ হয়ে বলল রববি।

"নাহ, আমার মনে হয় না!" আফ্রিতার কণ্ঠেও হতাশা।

"তাহলে? আর উপায় নেই, তাই না?" এই বলে রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিল রববি।

কিন্তু এ কী! গুলি চলছে না!

"গুলি চলে না কেন?" বলে উঠল রববি।

"প্রথমবার যখন আপনি গুলি করেছিলেন তখন সম্ভবত বুড়ো প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু এতক্ষণে ব্যাটা জাদু করে ওটাকেও বিকল করে দিয়েছে!"

একসঙ্গে হেসে উঠল জুলিয়া আর মি. জেনিংস।

গোটা ঘরের তাপমাত্রা ক্রমাগত কমেই যাচ্ছে, রববির মনে হচ্ছে যেন বরফ পড়ছে।

"আমরা কি তবে পালাব?" বলল রববি, বেশ ভয় পেয়েছে সে।

"লাভ নেই, এরা আমাদের মেরেই ফেলবে, এখন দারিন্দা আছে, দারিন্দার সামনে অন্য কেউ খুন করতে পারে না। কিন্তু এই বাড়ি থেকে বের হলেই এই বুড়োটা কোনো না কোনো জাদু চালিয়ে আমাদের মেরে ফেলবে!"

"আপনার জাদু?"

"এই বুড়ো আমার সুরক্ষা বৃত্তের ভেতরে জাদু করেছে! এটা যে কত বড়ো ক্ষমতা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। অদ্ভুত লাগছে, পাঁচ-সাত মিনিট আগেও এর যে এত ক্ষমতা আমি বুঝিনি! হুট করেই এর শক্তি এত বেড়ে গেল!"

"কী করে বাড়ল?"

"জানি না, তবে আমাদের এরা ছাড়বে না, নিশ্চিত থাকেন।"

কেউ খেয়াল করল না যে মিসেস. জেনিংস উঠে দাঁড়িয়েছেন আর টেবিল থেকে তুলে নিয়েছেন একটা ফুলদানি। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

"চলুন তো," এই বলে আফ্রিতার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল রববি।

কিন্তু দরজার বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতো একটা অনুভূতি হল তার। কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে ফেলে দিল তাকে।

পড়ে গেল আফ্রিতাও।

আবারও হেসে উঠল মি. জেনিংস আর জুলিয়া।

"বলেছিলাম না, আমাদের এরা ছাড়বে না? চলে যেতে বলেছে নিছক মজা করে," কোনোমতে উঠে বসল আফ্রিতা।

"তাহলে এই ছিল কপালে লেখা?" তখনও মাটিতে পড়ে আছে রববি।

আফ্রিতার নজর গেল মি. জেনিংসের দিকে, চোখ দিয়ে অদ্ভুত একটা ইশারা করলেন তিনি জুলিয়াকে। পাক্কা শয়তানের মতো করে হেসে চাপাতিটা জেফের গলার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল জুলিয়া।

চোখ বন্ধ করে ফেলল আফ্রিতা।
তারপরেই একটা আর্তনাদ। অবাক হল আফ্রিতা। এত জুলিয়ার গলা!
চোখ খুলল সে! জুলিয়া মাটিতে পড়ে আছে, আর একটা ফুলদানি নিয়ে ওর জেফের পিছে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস. জেনিংস!
"জেফ! ফেলে দাও পুতুলটা!" চিৎকার করে উঠল আফ্রিতা।
কোনো উত্তর করল না জেফ, ভয়ে কুঁকরে আছে সে এখনও। ততক্ষণে মি. জেনিংস হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।
"জেফ, ফেলো।" আবার চিৎকার দিল আফ্রিতা।
হুট করেই যেন হুঁশ ফিরে পেল জেফ, পুতুলটাকে আগুনের দিকে ছুড়ে দিল সে!
বুম করে একটা শব্দ!
পুরো ঘরটার ওপর যেন বোমা মেরেছে। কান ফাটানো আর্তনাদের শব্দে কানে যেন তালা লেগে গেল আফ্রিতার।
তারপর সব শান্ত।
অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল আফ্রিতা। দারিন্দাটা আর নেই, ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে হ্যারির প্রেত, ওর মুখে প্রশান্তির হাসি।
কাঁপছে জেফ আর ওর পিছে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মিসেস. জেনিংস। জুলিয়া তখনও মাটিতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
ঘরের একদম মাঝখানে রক্তে থইথই অবস্থায় পড়ে আছেন মি. জেনিংস। গোরু জবাইয়ের মতো করে তার গলাটা কেটে দিয়েছে কেউ যেন।
কে কাটল?
"কী হলো?" আফ্রিতার কাঁধে হাত রাখল রববি, "আমরা বেঁচে আছি তো?"
"হ্যাঁ, মি. জেনিংস একসঙ্গে দুজনকে সম্মোহিত রাখতে পারতেন না, যে মুহূর্তে উনি জুলিয়াকে সম্মোহিত করেছিলেন তখনই মিসেস. জেনিংসের সম্মোহন কেটে গেছিল। আর তিনি।"
"দারিন্দা?"
"ও চলে গেছে, হ্যারির আত্মাও মুক্তি পেয়ে গেছে!"

।। ১০ ।।

সব কিছু সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে রববি। কেস্টভিল থানার সতেরোজন পুলিশকেই উপস্থিত হতে হয়েছে জেনিংসদের বাড়িতে।
ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে সে।
একটু দূরে ফ্রেজার ম্যানসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিতা আর মিসেস. জেনিংস।
জুলিয়ার মাথার আঘাতটা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না, একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল ওর। হালকা চিকিৎসা দিয়েই ওকে আর জেফকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে রববি।
যাওয়ার আগে জুলিয়াকে আফ্রিতা বলে দিয়েছে যে ওরা বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে

সঙ্গেই ওর মা আগের মতো হয়ে যাবেন।

"কবে থেকে মি. জেনিংস এইসব শুরু করেছিলেন?" প্রশ্ন করল আফ্রিতা।

"সাত-আট বছর ধরেই, বেসমেন্টে বসে এসব করত!" কাঁপছে মিসেস. জেনিংসের কণ্ঠ। একটু আগেই প্রচুর কেঁদেছেন উনি।

"হ্যারি জানত?"

"নাহ্, আমি ওকে জানতে দিইনি!"

"হুম, কিন্তু তারপরেও ওর আত্মাকে। যাই হোক ওর আত্মার মুক্তি হয়ে গেছে।"

"আমার হ্যারি ভালো আছে তো? ওর মৃত্যুর জন্যও কি ওর বাবা দায়ী?"

"না না, ওর মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনাই। হ্যাঁ ও এখন ভালো আছে!"

ওদের দিকে এগিয়ে এল রববি।

"শুনুন আফ্রিতা আর মিসেস. জেনিংস, মোটামুটি সব সামলে নিয়েছিল," বলল সে, "কালই ডেনভার থেকে পুলিশের বিশেষ দল আসছে। আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে মি. জেনিংসই ওই বিকৃত মস্তিষ্কের সিরিয়াল কিলার। উনি গ্লাভস পরে সব খুন করতেন। কালকে নিজের স্ত্রীকে খুন করতে গেছিলেন আর তারপরেই আমরা গিয়ে তাকে আটকাই, একটা পর্যায়ে নিজের গলাতেই ছুরি চালিয়ে দেয়। বুঝতেই তো পারছেন... জুলিয়া আর জেফকে এসবের বাইরেই রাখছি!"

"এসব ওরা বিশ্বাস করবে?" অবাক হল আফ্রিতা।

"উন্নত বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ পুলিশ সার্ভিস আমাদের দেশের, আর ডেনভারের পুলিশের যে 'সুনাম', সমস্যা নেই, আমি বিশ্বাস করানোর মতো করেই সবকিছু করছি। আপনাদের দুজনের চাক্ষুষ সাক্ষী আরও শক্ত করবে আমার কথাগুলোকে। কী বলতে হবে সব বলে দেব আমি, ঠিক আছে?"

মাথা নাড়ল ওরা দুজন।

***

সব কিছু বেশ ভালোভাবেই সামলে নিল রববি।

ডেনভার থেকে পুলিশের যে দল এসেছিল তাদের কাছে ঘটনার তদন্তের চাইতে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন আর রববির ওপর হম্বিতম্বি করার প্রবণতাই বেশি ছিল।

কিন্তু আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকার কারণে রববি তাদের সামনে প্রমাণ করে ফেলল যে বিকৃত মস্তিষ্কের খুনি মি. জেনিংসই বাকি খুনগুলো করেছেন এবং নিজের স্ত্রীকে খুন করতে যাওয়ার সময় ব্যাপারটা আফ্রিতার নজরে চলে আসে আর তখন তাকে ফোন দেয় আফ্রিতা।

জেনিংসদের বাড়িটাকে সে ঠিক ওইভাবেই সাজিয়েছিল যেন ওর কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। জেফ আর জুলিয়ার উপস্থিতির সকল প্রমাণ সে আগে থেকেই মুছে রেখেছিল।

আফ্রিতা আর মিসেস. জেনিংসের জবানবন্দি ওর কথার পক্ষে আরও শক্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে সন্ধ্যার আগেই মি. জেনিংসের লাশ নিয়ে ডেনভারে চলে গেল সেই

প্রতিনিধি দল।

মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রববি। মি. জেনিংসকে গুলি করার কথা সে প্রতিনিধি দলকে বলে দিয়েছে। তাই খুব একটা ঝামেলা হবে বলে মনেও হয় না।

তারপরেও ওর শেষ একটা ভয় থেকেই গেল, শেষ রিপোর্ট কী আসে। ইশশ! যদি ডা. এমিলি থাকতেন! কিন্তু স্টেফানির মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে পড়েছেন মহিলা, তাই উনি আর কোনো কাজেই আসছেন না। উনি এলে উনাকে দিয়ে একটা মোটামুটি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লেখিয়ে নেওয়া যেত!

কিন্তু তারপরেও আত্মবিশ্বাসী রববি। ওই দলের প্রায় প্রতিটি সদস্যই ওর কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয়েছে ওর কাছে।

***

দুদিন পর, কেনসোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিতা আর রববি। সন্ধ্যা প্রায় হতে চলেছে।

"তাহলে সব ঠিকঠাক?" বলল আফ্রিতা।

"একদম," কপালের ঘাম মুছল রববি, "পোস্টমর্টের রিপোর্টে এটাই এসেছে যে নিজের গলাতেই নিজে ছুরি চালিয়েছেন মি. জেনিংস। যাই হোক, পুরো তদন্ত রিপোর্টের ভার আমার হাতেই দিয়েছে ওরা। কিছুদিনের মধ্যেই দাখিল করে দেব।"

"বাপরে!"

"একদিক দিয়ে তো ওদের মান বাঁচিয়েছি। আপনার কী মনে হয়, ওরা কিছু বের করতে পারত? ডেনভারের খবরের কাগজেও সব কিছু এসে গেছিল। আর এই প্রতিনিধিদল যদি শূন্য হাতে ফিরে যেত তবে কেসটা এফবিআইয়ের হাতেই যেত। আর এই ব্যাপারটাকে আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যের পুলিশই খুবই অপমানজনক দৃষ্টিতে দেখে! আর দিনের শেষে খুনি তো ওই ব্যাটাই। ওই পিশাচটাকে তো সে-ই এনেছিল। মিসেস. জেনিংস ভালোই আছেন। ধীরে ধীরে সব কিছু গুছিয়ে নিতে শুরু করেছেন উনি।"

"হ্যাঁ, আজ সকালেই দেখা হল উনার সঙ্গে। এখানকার সব কিছু বিক্রি করে ক্যালিফোর্নিয়াতে ভাইয়ের কাছে চলে যাবেন উনি শীঘ্রই। তবে কিছু ব্যাপার নিশ্চিত নই জানেন!"

"মানে কী? পিশাচটা আবার ফিরবে নাকি?" আঁতকে উঠল রববি।

"না না, সেই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন, কিন্তু আমার বৃত্তের ভেতরে কী করে ওই লোক জাদু করল? কী করে সম্মোহিত করল জুলিয়াকে? এটা তো প্রায় অসম্ভব, তারপর ধরুন শেষে ও আত্মহত্যাই বা করল কেন?"

"আচ্ছা আপনি জুলিয়াদের বাড়িতে গেছিলেন কী করে?"

"সে আর এক রহস্য, যাই হোক," ওই অদ্ভুত লোকটার ব্যাপারে কেন যেন কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না আফ্রিতা, "জুলিয়া স্বপ্নে দেখত একটা মূর্তি আর ওই দারিন্দাটা আর জেফ স্বপ্নে দেখত একটা গাছ আর ওই দারিন্দাটা। দুজনের স্বপ্ন কিন্তু আলাদা। ও পৃথিবীতে নেমে আসছিল জেফের স্বপ্নের মাধ্যমে, তাহলে জুলিয়ার স্বপ্নে ও কেন আসত?"

"ভালো কথা বলেছেন, আজ সকালে জুলিয়া ফোন করেছিল, ও ভালো আছে।

তবে...”

“তবে কী?”

“বিশেষ কিছু না। জেফ আর স্বপ্নে ওইসব দেখছে না, কিন্তু...”

“কিন্তু কী?”

“জুলিয়া দেখছে, এইবার স্বপ্নটা একটু বদলে গেছে, ওই পিশাচটা তো আছে, কিন্তু ওই মূর্তিটা আর নেই!”

“কীহ!”

“এবার কি মূর্তিটা বেরিয়ে আসবে নাকি?” হাসল রববি।

“আমার শরীরটা একটু খারাপ লাগছে অফিসার, আমি বাড়ি যাচ্ছি!” পেছন ঘুরে হাঁটতে শুরু করল আফ্রিতা।

“আমি যাব? হুট করে কী হল?”

“না না দরকার নেই!”

চলে গেল আফ্রিতা। আর অবাক হয়ে চেয়ে রইল রববি।

***

ধড়ফড়িয়ে বিছানাতে উঠে বসল আফ্রিতা। খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছে সে, যদিও কী দেখেছে তা এখন আর মনে পড়ছে না।

বালিশের তলা থেকে মোবাইলটা বের করল সে। রাত সাড়ে বারোটা বাজে। রববির সঙ্গে দেখা করে এসেই শুয়ে পড়েছিল সে।

কিছু একটা ঠিক নেই! ওর কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও বড়ো একটা কিছু এড়িয়ে গেছে ও।

ওই ওভারকোট পরা লোকটা, নানান রূপক লাইন বলে কীসব বোঝাতে চেয়েছিল ওকে? 'কে ও?

ওর সুরক্ষা বৃত্তের ভেতরে কী করে জাদু করল মি. জেনিংস! জুলিয়ার স্বপ্ন দিয়ে তো দারিন্দাটা আসত না, তারপরেও ওকে কেন স্বপ্নে দেখত সে? এখন আবার ওতে মূর্তিটা নেই!

হুট করেই অদ্ভুত একটা চিন্তা মাথায় এল আফ্রিতার!

সম্ভবত মি. জেনিংস ওই দারিন্দাটাকে ব্যবহার করেননি! হয়তো দারিন্দাটাই উনাকে ব্যবহার করেছিল।

জুলিয়ার স্বপ্নের সেই মূর্তিটা যদি মূর্তি না হয়... যদি ওটা জীবন্ত কিছু হয়!

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল আফ্রিতা। কেস্টভিল হাইস্কুলের পেছনের মাঠে যেতে হবে ওকে। এখান থেকে হেঁটে যেতে বিশ মিনিটের মতো লাগবে।

।। ১১ ।।

মানসিক সুস্থতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আফ্রিতার জন্য। এ কী দেখছে সে?

কেস্টভিল হাইস্কুলের পেছনের মাঠটা ধরে সেই বিশাল মন্দিরটা! যেটার ছবি সে ডিপ ওয়েবে পেয়েছিল, সেই মন্দিরটা, যা নাকি এখানে পনেরো হাজার বছর আগে ছিল।

কতো উঁচু এই মন্দির? আকাশের দিকে তাকাল আফ্রিতা, যতদূর নজর যায় ততটাই উঁচু সেই কাঠামো। ইট-পাথরে যে ওটা বানানো নয় সেটা বোঝাই যায়। ওটা এমন সব পদার্থ দিয়ে বানানো যেগুলোর কথা সাধারণ মানুষ জানে না, হয়তো কোনোদিন জানতেও পারবে না।

ওটা জ্যামিতিক আকৃতি যেন ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। অদ্ভুত এক নীলাভ আলো বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে।

মন্দিরের একদম দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আফ্রিতা।

অদৃশ্য কেউ যেন ওকে আহবান করে চলেছে, "এসো, ভেতরে এসো!"

ধীরে ধীরে সেই প্রাচীন মন্দিরের সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল আফ্রিতা। সময়ের চাইতেও পুরোনো সেই মন্দির, যাকে হয়তো সময়ও ভুলে গেছে।

একটা খোলা প্রান্তর দিয়ে হেঁটে চলেছে আফ্রিতা। ঘোরের মধ্যে চলে গেছে ও।

ও দেখছে পাচ্ছে সেই মূর্তিটাকে। বেশ কিছুটা দূরে ওটা। সত্তর থেকে আশি ফিট উঁচু সেই মূর্তিটার শরীরটা মানুষের মতোই, কিন্তু মাথাটা কেমন যেন সূচোল হয়ে ওপরে উঠে পেছনের দিকে বেঁকে গেছে, অনেকটা বাঁকানো টুপির মতো। এত নীচ থেকে আফ্রিতা দেখতে পাচ্ছে যে ওই মুখে একটা ছোটো ছাড়া আর কিছুই নেই!

সেই চোখের মণিটা নড়ছে, তাকিয়ে আছে আফ্রিতার দিকে।

এই মন্দিরের দেবতা জীবন্ত!

আফ্রিতার মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর মাথার ওপর ক্রমাগত হাতুড়ি মেরে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিটকে বেরিয়ে আসবে ওর চোখের মণি, মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে মগজ।

"আর যেও না, তোমাকে দেখা দেওয়ার জন্যই উনি এসেছেন, তোমার মাধ্যমেই উনি আবার ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে, তুমি উনার দেখা পেয়েছ। এবার উনি চলে যাবেন," পেছন থেকে পরিষ্কার বাংলাতে বলে উঠল কেউ।

মাথা ঘুরে পড়ে গেল আফ্রিতা। কিন্তু জ্ঞান হারাল না।

সেই ওভারকোট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে! তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

"আমার হাতটা ধরো," বলল লোকটা।

ভয় পাচ্ছে আফ্রিতা।

"আরে ধরো, আমাকে তো তুমি অনেক আগে থেকেই চেনো," আর একটু এগিয়ে এল লোকটা। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে এবার!

কোথায় দেখেছে সে একে? চেনা চেনা লাগছে!

হুট করেই জ্বলে উঠল লোকটার চোখদুটো, একটা হলুদাভ আলো প্রবেশ করল আফ্রিতার চোখে। যেন ধাক্কা মারলো ওর স্মৃতিতে!

এই তো স্কুলের সেই বাদামওয়ালাটা!

ঘোরের মধ্যেই নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

***

কোথায় সেই বিরাট মন্দির? আর কোথায় সেই ভয়াবহ বিরাট দানবটা?

কেস্টভিল হাইস্কুলের পিছনের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিতা আর সেই লোকটা।

"ও ও ও... ওটা কী?" কোনোমতে বলল আফ্রিতা।

"উনি 'আকাশ-প্রতিম', একজন ঈশ্বর। হাজার বছর আগে এই ভূখণ্ডের লোকেরা উনার আরাধনা করত। উনি আবার ধরায় ফিরেছেন। তোমার জন্য!" হাসল লোকটা।

"মানে কী? আমার জন্য!"

"একদিন তুমি নিজেই বুঝে যাবে সব!"

"ঈশ্বর! ও তো দানব!" কাঁপছে আফ্রিতার গলা।

"উনি আকাশ আর মৃত্যুর ঈশ্বর! একমাত্র মৃত্যুর সামনেই আমরা সবাই সমান, তাই না?"

"আপনি কে? এখানে কী করে এলেন?"

"আমি কে? প্রশ্ন করো আমি কী! আমাকে হরেক জনে হরেক নামে ডাকে। সুমেরিয়ানরা আমাকে বলে মারদুক, আফ্রিকার গোয়াম্বিরা আমাকে বলে ডাকুস, আর হিন্দু মিথে আমাকে বলা হয় কালভৈরব। আমি এই প্রকৃতিতে শুভ শক্তির পালনকর্তা! তুমি মাঝে মাঝে আমাকে স্বপ্নে দেখো!"

"কোন স্বপ্ন?"

"একটা ছোট্ট ছেলে আর গুহা... ওই ছেলেটাই আমি!"

"ওহ গড! ওটাই আপনি! আর পিছে যে থাকে... ভয়াবহ কণ্ঠ... ওটাই কি এই দানবটা?"

"না, উনি ঈশ্বরদের ঈশ্বর! উনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন নিজের খল প্রভাব থেকে প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য। উনার সামনে পড়লে তুমি এতক্ষণে মাংসপিণ্ডে পরিণত হতে। উনি ঘুমিয়ে আছেন, একদিন জেগে উঠবেন, প্রবল প্রলয় নিয়ে আসবেন আমাদের জন্য।"

"তার মানে এর মতো দানব আরো আছে?"

"হ্যাঁ! অনেক ঈশ্বর আছে। তোমার সেই ছলাবার কথা মনে আছে? ওটা মারা গেছিল, কারণ সে তোমার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল আর মহান ঈশ্বরের কথা ভাবতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে!"

"এই কারণে মরেছিল ওটা!"

"হ্যাঁ!"

একটু থামল আফ্রিতা। অনেকটাই সামলে নিয়েছে সে নিজেকে।

"তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, ঈশ্বর একটা খল প্রকৃতির চরিত্র?" ব্যাগ থেকে চশমাটা বের করে পরল সে।

"আসলে এটা ব্যাখ্যা করা যায় না।"

"আপনি কেন আমার পিছে? সেই ছোটো থেকে? কেন আপনাকে স্বপ্নে দেখি আমি?"

"কারণ তুমি সবার চেয়ে আলাদা, তোমাকে রক্ষা করছি আমি!"

"কেন করছেন?"

"সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারব না, তোমারও আপাতত বোঝার ক্ষমতা নেই। তুমি আকাশ-প্রতীমের দেখা পেয়েছো, উনি তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন। একটা ক্ষমতাও দিয়েছেন," মুচকি হাসল লোকটা।

"কী ক্ষমতা?" অবাক হলো আফ্রিতা।

"সেটা সময় হলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে!"

"আপনি কি মানুষ নন?"

"নাহ্! আমি তেমন নই, যেমন মানুষেরা আমাকে ভাবে, এটা আমার আসল রূপ নয়!"

"এইখানে কী হয়েছিল? আকাশ-প্রতিম কেন আমাকে আশীর্বাদ করলেন?"

"একদিন তুমি নিজেই সব বুঝে নেবে! আমার যাওয়ার সময় হয়েছে... ভালো থেকো মেয়ে! খেয়াল রেখো নিজের।" এই বলে আফ্রিতার ডান হাতটা ধরল লোকটা, নিজের পকেট থেকে বের করে একটা মোটা লোহার বালা পরিয়ে দিল সে ওখানে, "আমার চিহ্ন! এটা সবসময় পরে থাকবে। মনে রেখো একদিন সেই মহান সত্তা নেমে আসবেন, আর সেদিন আমাকেও আসতে হবে নিজের আসল রূপে! তোমাকেও দরকার হবে আমার!" হাসল সে।

"কিন্তু।"

সব কিছু আবার হুট করেই বদলে গেল।

ফ্রেজার ম্যানসনের নিজের বিছানায় বসে আছে আফ্রিতা।

তবে কি সব কিছু স্বপ্ন ছিল?

মুচকি হেসে নিজের ডানহাতের বালাটার দিকে তাকাল আফ্রিতা। কিছুই স্বপ্ন ছিল না! বালাটার রং রুপালি, ওটার গায়ে বিচিত্র সব নকশা।

।। ১২ ।।

পরের দিন সকাল ছয়টা বিশ।

কেস্টভিল রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছে আফ্রিতা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে রববি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ অবাক সে।

"ট্রেন সাড়ে ছটায় তাই না?" মোবাইল টিপতে টিপতে বলল আফ্রিতা।

"হ্যাঁ, এক ঘণ্টার মধ্যে ডেনভারে পৌঁছে যাবেন।"

"বেশ বেশ।"

"আচ্ছা, আপনি কি সত্যিই চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ! কেন কোনো সমস্যা হবে?"

"না, ডেনভার পুলিশ কোনো সমস্যা করবে না। কিন্তু হুট করেই বাংলাদেশ চলে যাচ্ছেন! সেদিনই না বললেন যে আরো কয়েক সপ্তাহ থাকবেন?"

"ইচ্ছা হল চলে যাচ্ছি! সামনের বছর আবার আসব। তখন আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

"সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন?"

"নাহ, কাউকেই বলিনি! হুট করেই ঠিক করলাম আরকি।"

"আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই নিন।"

"কেন?"

"সামনের বছর আমাকে পাবেন না। চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি, নতুন শেরিফ

নিয়োগ হলেই তাঁর কাছে তদন্তের কাগজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার পদত্যাগপত্রও জমা দিয়ে দেব।"

"তারপর?"

"পেনসিলভেনিয়ার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা!"

"যাই হোক, জুলিয়া আর ওই স্বপ্ন কোনোদিন দেখবে না!"

"কেন?"

"সে বলা যাবে না," চোখ নাচাল আফ্রিতা।

ট্রেন এসে পড়ল। উঠে গেল সে।

কেস্টভিল স্টেশনে পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না ট্রেন। এখানে বেশি যাত্রী থাকে না। আজকেও আফ্রিতা ছাড়া আর কেউ নেই।

জানালার পাশের একটা সিটে বসল আফ্রিতা। রববি এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

হাত নাড়ল আফ্রিতা। রববি হাত নাড়ল না, শুধু এক ম্লান হাসি দিল।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আফ্রিতা দেখল রববি স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকল ওর অবয়বটা, ট্রেন ছুটে চলল।

পরিশিষ্ট

বেশ রাত হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টের বাইরে একটা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে আফ্রিতা।

একটু আগেই মাকে ফোন করে দেশে আসার কথা জানিয়েছে সে। মা যথারীতি অবাক হয়েছেন, কিন্তু মেয়ের এইসব হুটহাট কাজের সঙ্গে তিনি চিরকালই পরিচিত, তাই ওকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। গাড়ি নিয়ে উনি আসছেন।

পাশে একটা বেশ বয়স্ক লোক একটা বড়ো লাগেজ টানতে টানতে চলে গেল।

লাগেজটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আফ্রিতা। ওটার ভেতরে চলে গেল তার দৃষ্টি। জামা-কাপড়ের সঙ্গে কিছু সেক্স টয় আর অসংখ্য পর্ণ ম্যাগাজিন রয়েছে। গোবেচারা চেহারার লোকটার এই তাহলে আসল রূপ!

সেই অদ্ভুত লোকটা যেমন বলেছিল, "আকাশ-প্রতিম তোমাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন।"

মনে মনে হাসল আফ্রিতা। এই ক্ষমতা তার ভালোই কাজে লাগবে। বালাটা এখনও ওর হাতে শোভা পাচ্ছে, মা নিশ্চয়ই প্রথম দেখায় এটা পছন্দ করবেন না।

তো, আফ্রিতার গল্প কি শেষ? আঁধারের সন্ধান কি শেষ?

- না। আফ্রিতার আঁধারের সন্ধান চলবেই।

কেস্টভিলের সেই জ্যাকলিন স্ট্রিকারের পুরো কাহিনি কি জানা যা

- হয়তো যাবে।

কিন্তু আপাতত আফ্রিতার কিছুদিনের বিরতি দরকার, তাই আফ্রিতার কাহিনি আপাতত শেষ।

নিৎসে যেমনটা বলেছিলেন-

“The end of a melody is not its goal; but nonetheless, had the melody not reached its end it would not have reached its goal either. A parable.”



লুৎফুল কায়সারের জন্ম ১৯৯২ সালের ২৮ অক্টোবর রাজশাহিতে।

রাজশাহি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রকৌশলে স্নাতক পাশ করেছেন। ছোটোবেলা থেকেই বইপড়ার শখ। মূলত অতিপ্রাকৃত কাহিনি পড়তেই সবচেয়ে ভালোবাসেন তিনি।

প্রিয় লেখকের তালিকায় রয়েছেন, এডগার অ্যালান পো, আর্থার ম্যাকেন, এইচ. পি. লাভক্র্যাফট, জে সারিডন লে ফানু, গ্যাভিন রিচার্ডস, জেমস হারবার্ট, ব্রেট এস্টন এলিস, টিম কারেন ইত্যাদি। বেশ কিছু হরর বই অনুবাদ করেছেন তিনি। 'আফ্রিতা: আঁধারের সন্ধানে' তার প্রথম মৌলিক গ্রন্থ।

প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল


aranyamon.com
9 788195 095629
Rs: 300.00